বিচিত্র প্রসঙ্গ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

প্রচ্ছদপট :—

অঙ্কন :—ধ্রুবজ্যোতি সেন

মুদ্রণ :—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭ বি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়া জননী হিরণপ্রভা দেবীর
করকমলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত
অর্পিত হইল।

—মণি

নিবেদন

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি একত্রে এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইল। এই সমস্ত রচনা প্রধানত আনন্দবাজার, যুগান্তর, প্রবাসী, বসুমতী ও জ্ঞান-ও-বিজ্ঞানে মুদ্রিত হয়। কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একাধিক পাঠকের কৌতূহলপূর্ণ পত্র পাইয়া মনে হইয়াছে রচনার বিষয়বৈচিত্র্য যখন এতই পাঠকের চিত্তাকর্ষক তখন হয়ত গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ-যোগ্য। কিন্তু প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময় লিখিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে একই কথার পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। সুধী ব্যক্তি ইহার জন্য ক্ষমা করিবেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার সময় আমার পূজনীয় পিতৃদেব ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র দাস মহাশয় (১৮৮৯—১৯৫৭) যে অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ। এই সম্পর্কে আমার পত্নী শ্রীমতী কণিকা দাস ও ভগ্নী শ্রীমতী দীপালী দাস উভয়েই যে সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য দুজনকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সবশেষে প্রণতি জানাই সেই সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের যাঁহাদের পুস্তক পাঠের ফলে আমার সাহিত্য সাধনা সার্থক হইয়াছে। ইতি—

'সাধনালয'
রাঁচি
১৯৫৯

বিনীত
মণীন্দ্রনাথ দাস

সূচী

সূর্য্য

আমাদের সূর্য্য অতি সাধারণ এক তারা, অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় এত বড় দেখায়; আকাশের অন্যান্য অনেক তারকাই এক-একটি মহাসূর্য্য, বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া এত ছোট মনে হয়। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই নবগ্রহ নিরন্তর মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণ-শক্তি গ্রহগণকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের জন্ম। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, কোন-ক্রমে সূর্য্যেরই একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নবগ্রহের সৃষ্টি হয়। সকল গ্রহই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত। চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত সূর্য্যালোক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করিত—পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ও গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পোলাণ্ডের অমর জ্যোতির্ব্বিদ্ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) সর্ব্বপ্রথম এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন, সূর্য্য মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য সব গ্রহ ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে বোধ হয়, কোপারনিকাসের পূর্ব্বে প্রাচীন কালের কোন কোন জ্যোতিষীর মনে সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সচল—এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টারকাস বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবী প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয় এবং বৎসরান্তে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পাইথাগোরাসের অনুরূপ ধারণা ছিল। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনীষী আর্য্যভট্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হন, পৃথিবীর নিজের চতুর্দ্দিকে একটি দৈনিক গতি আছে এবং সূর্য্যের চারিদিকে ইহার আর এক প্রকার বাৎসরিক গতিও বিদ্যমান। পণ্ডিত পৃথুদক দশম শতাব্দীতে আর্য্যভট্টের এই ভূভ্রমণবাদ পুনরায় সমর্থন করেন।

সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ আসে এবং তাহার ফলেই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। সেইজন্য স্বভাবতঃই প্রাচীন কালের লোকেরা প্রথম হইতেই নীল আকাশের এই মহা জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা দেবতা-জ্ঞানে সূর্য্যের পূজা করিত। সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করিয়া কৃষিজীবী লোকেরা সূর্য্যপূজা করিত। মিশরে রা নামে, পারস্যে মিত্রাস নামে, গ্রীসে এপোলোরূপে এবং ভারতে বিভিন্ন নামে সূর্য্যদেবের পূজা হইত। জাপান ও মধ্য আমেরিকায় যে এককালে সূর্য্যপূজার প্রচলন ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে সূর্য্যের স্তবস্তুতি ও বন্দনাসূচক বহু শ্লোক দেখা যায়। কোনার্কের সূর্য্যমন্দির পূর্ব্ব যুগের সৌরভক্তির নিদর্শন। ভারতীয় ঋষিগণ উচ্ছ্বসিত হইয়া সূর্য্যের অনেকগুলি নামকরণ করিয়া গিয়াছেন, যথা—রবি, ভানু, দিবাকর, প্রভাকর, অহস্কর, ভাস্কর, সবিতা, দিনমণি, অংশুমালী, মার্ত্তণ্ড, মিহির, আদিত্য, অর্ক, বিভাবসু, তপন, অরুণ, মহাদ্যুতি, বিকর্ত্তন, বিবস্বান, তমোহর, মরীচিমালী, গ্রহপতি, কিরণমালী ইত্যাদি।

উপনিষদে সূর্য্যের প্রশস্তিব্যঞ্জক এইরূপ শ্লোক আছে—

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানমুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিল প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে (জ্ঞানীরা জানেন)। অনন্ত কিরণশালী

(প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদয় হইতেছেন (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ)। অন্য স্থলে আবার বলা হইয়াছে—আদিত্যোহবৈ প্রাণো—সূর্য্যই প্রাণ (প্রশ্নোপনিষৎ)।*

সুদূর অতীতের মানুষের স্বাভাবিক সূর্য্যভক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার বলা চলে না, ইহার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়; আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সূর্য্য আমাদের সমস্ত শক্তির মূল:

"Almost every kind of activity here on the earth can be traced back to the energy that comes to us in the sun's radiation. Power derived from the waterfall, from the wind, and from fuel and food has its origin in the great power plant of the sun."—'Astronomy' by Prof. Robert Baker, Ph.D.

বায়ুপ্রবাহের কারণ সূর্য্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য্যকিরণে ভূমিসংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং অন্যদিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। এইরূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। মেঘ-বৃষ্টিরও হেতু সূর্য্যরশ্মি। সূর্য্যতাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উপরে গিয়া মেঘে পরিণত হয়, তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরিয়া আসে।

গাছ সূর্য্যকিরণের সাহায্যেই দেহ গঠন (photo synthesis) করে। গাছের পাতার সবুজ কণা বা chlorophyll সূর্য্যালোকের সহায়তায় বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই কাজ অন্ধকারে সম্ভব নয়, ইহা

* মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে—পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, সূর্য্যই সর্ব্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত অন্নস্বরূপ।

কেবল দিবালোকে সাধিত হয়। এইরূপে সংগৃহীত অঙ্গার এবং শিকড়ের দ্বারা আনীত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে গাছ দিনের আলোতে দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ খাদ্যরূপে সঞ্চয় করিয়া রাখে। মানুষ ও জীবজন্তু গাছের সযত্নে সঞ্চিত এই খাদ্যবস্তু আহার করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে। পৃথিবীর সমস্ত জীবের প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য্য-কিরণের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের জীবনীশক্তিকে রূপান্তরিত সূর্য্যশক্তি বলা যাইতে পারে:

"The whole of life upon earth depends entirely upon solar energy. The sun's energy is the physical source of all life."—'Science of Life' by Wells & Huxley.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সূর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি। উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর শরীর কতিপয় পার্থিব পদার্থেরই রাসায়নিক সংযোগে গঠিত; সেই হিসাবে জীবদেহ সূর্য্যেরই এক ক্ষুদ্র অংশ মনে করা যাইতে পারে।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায়, পার্থিব মৌলিক পদার্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সূর্য্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে। সৌর বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া সিলিকন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, এলুমিনিয়াম, লৌহ, অঙ্গার প্রভৃতি প্রায় চৌষট্টি রকম মৌলিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কয়লা পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া কলকারখানা চালায়। তেল বা কয়লা জ্বালিলে যে উত্তাপ হয় উহাও প্রকারান্তরে সূর্য্যশক্তি। যে সব গাছ বহু যুগ পূর্ব্বে সূর্য্যালোকের সাহায্যে কাষ্ঠময় দেহ গঠন করিয়াছিল তাহাই বহু বৎসরকাল মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত

হইয়াছে। খনিজ তৈলসৃষ্টির আদি কারণও পরোক্ষ ভাবে সূর্য্য। সুতরাং কলকারখানা যে সূর্য্যের বলেই চালিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সূর্য্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসের গোলক। অত্যুষ্ণ বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব কম—মাত্র ১·৪। সূর্য্যের যে উজ্জ্বল ভাগ সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে আলোকমণ্ডল (photo sphere) বলে। এই আলোকমণ্ডলেই কৃষ্ণবর্ণের সূর্য্য-কলঙ্ক এবং প্রদীপ্ত ক্যালসিয়ামের অত্যুজ্জ্বল দাগ (flocculi) দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকমণ্ডলকে ঘিরিয়া লাল রঙের এক আবরণ আছে, ইহার নাম বর্ণ-মণ্ডল (chromosphere)। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই বর্ণমণ্ডল পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় ঐ স্থান হইতে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণের অগ্নিশিখা বহু উচ্চে উঠিতে দেখা যায়। বর্ণমণ্ডলের চারিদিকে মকুটমণ্ডলের (corona) আর এক বেষ্টনী আছে। মকুটমণ্ডলের রজতশুভ্র ছটা পূর্ণ-গ্রাসের সময়ই সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়।

বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক ও উত্তাপ উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। এখন জানা গিয়াছে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে রেডিয়ামের মত পদার্থের পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়।

চাঁদের কলঙ্কের মত সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীণের দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সৌর-কলঙ্ক দেখিতে পান। সূর্য্য-কলঙ্ক-তপ্ত বাষ্পের ঘূর্ণি সূর্য্যাভ্যন্তরের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি আলোকমণ্ডলের স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া আসে এবং উপরকার উষ্ণ বাষ্প এই আবর্ত্তে নীচে নামিয়া যায়। উপরে আসিয়া হঠাৎ স্ফীত হওয়ার ফলে এই তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে,

পারিপার্শ্বিক উজ্জ্বল স্থানের তুলনায় তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকাব ও কৃষ্ণবর্ণেব দেখায়। দূরবীণ দিয়া দেখিলে কলঙ্কগুলি সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে এরূপ দৃষ্ট হয়। কলঙ্কের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও স্বীয় অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তিত হয়। তবে বায়বায় বস্তুতে গঠিত বলিয়া সূর্য্যেব আবর্ত্তনকাল সকল স্থানে সমান নয়। উহাব মধ্যবর্ত্তী স্থান ২৫ দিনে একবার ঘুবপাক খায়, কিন্তু উহার মেরুপ্রদেশ আবর্ত্তিত হইতে প্রায় ৩৪ দিন সময় লাগে। এই সকল কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যগাত্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। সূর্য্যকলঙ্ক সকল সময় সমান থাকে না। এগার বৎসর অন্তব ইহারা আকাবে ও সংখ্যায় খুব বাড়িয়া যায়, তাহার পব ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ কবে। জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ শোয়াব ২০ বছর সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ কবিয়া ১৮৪৩ সনে এই ব্যাপার আবিষ্কার করেন।

যখন কলঙ্কের সংখ্যাধিক্য ঘটে, সেই সময় পৃথিবীর উত্তব মেরু ও দক্ষিণ মেরুর রঙীন আলোকদীপ্তি (aurora lights) বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-যন্ত্রেও চাঞ্চল্য দেখা যায়। আসল কথা, সূর্য্যকলঙ্ক অসংখ্য বিদ্যুৎকণার উৎস। কলঙ্কবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা আসিয়া পৃথিবীতে ধাক্কা মারে। ইহার ফলে রেডিও, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কম্পাস-কাঁটাও বিশেষ বিচলিত হয়। এই সকল বিদ্যুৎকণাই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে জড় হইয়া সেখানকার হালকা বায়ুরাশিতে রঙীন আলোক সৃষ্টি কবে। এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডগলাস দেখাইয়াছেন, সৌরকলঙ্কের এগার বৎসরকালীন হ্রাসবৃদ্ধির সহিত গাছের গুঁড়ির বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। গাছের বার্ষিক চক্রও এগার বৎসর বিশেষরূপে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে অনেকে মনে করেন সৌরকলঙ্কের সহিত পৃথিবীর আবহাওয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে।

সূর্য্য সম্পর্কে এখন কতকগুলি বিরাট বিরাট সংখ্যা পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০০০০ গুণ বড়। সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে গড়ে ৯৩০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থান করে। যদি একখানি মেল ট্রেন পৃথিবী হইতে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে গন্তব্যস্থলে পৌছিতে উহার ১৭৫ বৎসর সময় লাগিবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলো পৌছিতেই আট মিনিট সময় লাগিয়া যায়, যদিও আলোকের গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের ওজন কত তাহাও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ২-এর পিছনে ২৭টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের ওজন তত টন। এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান। সূর্য্যের বাহ্য উত্তাপ ১২০০০° ডিগ্রী ফারেন-হাইট। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা ২৮ গুণ বেশী, অর্থাৎ এখানকার পৌনে দু' মণ ভারী মানুষকে সূর্য্যে লইয়া গেলে তখন উহার ওজন দাঁড়াইবে ৫৪ মণের কাছাকাছি। সূর্য্যমেরু সোজা হইয়া নাই। সামান্য হেলিয়া আছে। সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্ত (equator) ক্রান্তিবৃত্ততলের (ecliptic plane) উপর প্রায় সাত ডিগ্রী নত হইয়া আছে।

আকাশের সমুদয় নক্ষত্রকে আপাতদৃষ্টিতে চিরস্থির মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন তারকাই নিশ্চল নয়, প্রত্যেকের পৃথক গতি আছে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে উহাদের স্থানচ্যুতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এডমণ্ড হ্যালী ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি যে নক্ষত্র-মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন—লুব্ধক, আর্দ্রা, রোহিণী ও স্বাতী, এই কয়টি তারকা সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে পূর্ণচন্দ্রের

ব্যাস পরিমিত স্থান সরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে আমাদের সূর্য্যও অন্যান্য নক্ষত্রের মত গতিশীল। বৈজ্ঞানিকেরা সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সূর্য্য তাহার গ্রহ পরিবারবর্গসহ মহাবেগে আকাশের হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ১২ মাইল গতিতে ধাবিত হইতেছে।

চাঁদ চলিতে চলিতে কখনও কখনও সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে; চাঁদ যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি। সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায় পড়ে। প্রথমে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একটু খাঁজ দেখা দেয়, তাহার পর চাঁদ ক্রমশঃ সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই সময় চতুর্দ্দিক অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। পূর্ণগ্রাসের সময় আকাশ এ রকম অন্ধকার হইয়া আসে যে, সময় সময় কোন কোন উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। তাপরশ্মি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, এমন কি কখনও কখনও শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়। দুর্য্যোগের আশঙ্কায় প্রাণিবর্গ বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, পাখীরা নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তনে আগ্রহান্বিত হয়। কোন কোন ফুলের পাপড়ি আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই সময় সূর্য্যের রক্তাভ বর্ণমণ্ডল ও শুভ্র মকুটমণ্ডল সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ সচরাচর আট মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। ইহার পর চাঁদ ধীরে ধীরে সূর্য্যের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় এবং তৎকালীন গ্রহণেরও সেই সঙ্গে অপসারিত হয়।

খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বেই বেবিলনবাসী ক্যালডিয়ান জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর তাঁহারা দেখেন চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ আঠার বৎসর এগার দিন অন্তর ঠিক পর পর ফিরিয়া আসে। তাঁহারা

এই পুনরাবির্ভাব-কালকে saros বলিতেন।

সূর্য্যালোক যে অবিমিশ্র নয়, উহা যে সপ্তবর্ণের সমষ্টি মাত্র তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানবীর নিউটন প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখান সূর্য্যের আলো কোন তিন কোণা কাচের ভিতর দিয়া আসিলে উহা সাত রঙে ভাগ হইয়া যায়। এই সাতটি রঙ যথাক্রমে—বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। পরে জানা গিয়াছে, এই বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) বেগুনী বর্ণের পরেও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি (ultra-violet rays) বর্ত্তমান। ইহার অস্তিত্ব কেবল ফোটোগ্রাফির কাচে ধরা পড়ে। অতি-বেগুনী রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া খুব প্রখর। রক্তবর্ণের অগ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া সেইরূপ আমাদের চক্ষুর অগোচর তাপোৎপাদক লোহিতপূর্ব্ব রশ্মি (infra-red rays) বিদ্যমান।

একখানি উন্নতোদর পরকলার (convex lens) দ্বারা সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সঙ্গে আলোকমধ্যস্থ লোহিত-পূর্ব্ব তাপরশ্মিও কেন্দ্রীভূত হয় এবং তখন এই কেন্দ্রে কাগজ প্রভৃতি দাহ্যবস্তু ধরিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। এই ব্যাপার অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক কারণেও সূর্য্যের আলোককে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। সূর্য্যের আলোকধারা জলবিন্দুর ভিতর দিয়া যাইবার কালে সপ্তবর্ণে বিভক্ত হইয়া আকাশে বিচিত্র রামধনু বা ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে। কখনও কখনও পার্ব্বত্য নির্ঝরের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ঐরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তেলের পাতলা স্তরে আলোকরশ্মি পড়িলে উহা কিরূপ রঙীন পর্দ্দার সৃষ্টি করে তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

সূর্য্য হইতে যে কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্যালোকের তরঙ্গ সাধারণতঃ ·০০০০২ সেন্টিমিটার হইতে প্রায় ·০০১২৮ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই

বিপুলাংশের যে ক্ষুদ্র ভাগ দৃশ্যমান আলোক, তাহার তরঙ্গ মাত্র ·০০০০৪ সেন্টিমিটার হইতে ·০০০০৮ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত দীর্ঘ। সূর্য্যালোকের প্রখর দীপ্তি দীপশক্তির (candle power) হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। সার জেম্‌স জিন্‌সের মতে ৩২৩-এর পাশে ২৫টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, সূর্য্যের আলো প্রায় তত দীপশক্তিবিশিষ্ট। শুনিতে অদ্ভুত ঠেকিলেও জিন্‌স ইহারও এক হিসাব দিয়াছেন—প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল পরিমাণ স্থানে যে সূর্য্যালোক পতিত হয়, তাহার ওজন এক আউন্সের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এজন্য ধূমকেতুর ধূম্রময় পুচ্ছ সূর্য্যালোকের চাপে পড়িয়া সর্ব্বদা বিপরীত দিকে অবস্থান করে।

সূর্য্যকিরণের জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে, প্রখর রৌদ্রে অধিকাংশ রোগের জীবাণু কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সূর্য্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি প্রধানতঃ ব্যাধিবীজাণুর ধ্বংসসাধন করে। এজন্য বাসগৃহে যাহাতে অবাধে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সূর্য্যের আলো অনাবৃত গাত্রে পতিত হইলে উহা চর্ম্মমধ্যস্থ ergosterol নামক পদার্থকে ভিটামিন 'D'তে পরিণত করে। ইহাও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মির ক্রিয়া। 'ডি' ভিটামিনের সাহায্যেই শরীরে ক্যালসিয়ম ফসফেট গৃহীত হয়। ভিটামিন 'ডি'র অভাব ঘটিলে রিকেট্‌স নামক অস্থিরোগ দেখা দেয়। এই রোগে হাড় বাঁকিয়া যায়। এইজন্য রিকেট্‌স রোগীর পক্ষে সূর্য্যালোকে অবস্থান বিশেষ উপকারী। ইহা ছাড়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি নিরাময় হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ডাক্তার রোলিয়ার গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল বহু কঠিন রোগের চিকিৎসায় স্বাভাবিক সূর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য সুফল পাইয়াছেন। তাঁহার মতে অস্থি ও গ্রন্থির ক্ষয়রোগ, বাত, বেদনা, ঘা, চর্ম্মক্ষত, প্রভৃতি কতিপয় দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু নিয়মিত ভাবে পরিমাণমত রৌদ্রসেবনে নিরাময় হইতে পারে।

তবে সূর্য্যস্নানের সময় ও পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মস্তকে রৌদ্র লাগান নিষিদ্ধ। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় আধ ঘণ্টা সূর্য্যস্নান করিলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা রীতিমত বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যালোকের বিলক্ষণ উত্তেজক (tonic) ক্রিয়া আছে। এজন্য অন্ধকার মেঘলা দিনে শরীর অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও গ্লানিযুক্ত মনে হয়। সূর্য্যকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিনে সকলেরই দেহমন উৎফুল্ল বোধ হয়।

সূর্য্য অশেষ গুণসম্পন্ন হইলে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড রৌদ্র অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে অধিকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে সর্দ্দিগরমি হইতে পারে। অন্য সময় বেশীক্ষণ প্রখর রৌদ্রে থাকিলে কখনও কখনও এক রকম তাপজ্বর হয়। বলা বাহুল্য, এই উভয় রোগের প্রতিকার ছায়াশীতল স্থানে অবস্থান, শীতল জল পান এবং শীতল বায়ু সেবন। সূর্য্যের দিকে কখনও খালি চোখে বেশীক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা উচিত নয়, কারণ ঐরূপ করিলে অনেক সময় স্থায়ীভাবে অক্ষিপর্দ্দা অনুভূতিশূন্য এবং নেত্রমণি অস্বচ্ছ হইয়া যায়; ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও অন্ধত্ব। তীব্র সূর্য্যালোক হইতে চক্ষুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলাই বিধেয়, গ্রহণের সময়েও সূর্য্যকে ধূম্রকাচের ভিতর দিয়া দেখা উচিত।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা সকলকেই মুগ্ধ করে। প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণশোভার কারণও সূর্য্যালোকের স্বাভাবিক বিভাগ। সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যকিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহার ফলে ক্ষীণ নীল আলোকরশ্মি অসংখ্য ধূলিকণা ও জলবাষ্পপূর্ণ বিপুল বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আর পৃথিবীতে পৌছিতে পারে না—তৎপূর্ব্বেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কেবল গাঢ় কমলা ও লাল আলো অক্লেশে বায়ুস্তর বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসে, সেইজন্য আমরা এ সময় আকাশকে কমলাভ বা রক্তাভ দেখি।

পৃথিবী প্রসঙ্গ

আমাদের পৃথিবী সৌরপরিবার-ভুক্ত নবগ্রহের মধ্যে গণনীয়। এই মেদিনী মহাশূন্যে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তিই পৃথিবীকে দীর্ঘবৃত্তাকার কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী গড়ে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছিতে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য্যই মধ্যস্থলে স্থির রহিয়াছে আর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ উহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে—এই সত্য পাশ্চাত্ত্যে সর্ব্বপ্রথম পোলাণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন।

এই পৃথিবী যে বিরাট বলের মত গোল তাহা প্রাচীন কালেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি গোল এবং গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় তাহাও বৃত্তাকার—সুতরাং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী গোলাকার। ভারতবর্ষেও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যান যে, ভূমণ্ডলের গঠন গোলকাকার। ইহা ছাড়া, পৃথিবীর আকার সম্পর্কে অন্যান্য অনেক আধুনিক প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ইজিপ্টে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বিখ্যাত ভৌগোলিক ও গ্রন্থাগারিক ইরাটস্থিনিস (খ্রীঃ পূঃ ২৭৫-১৯৪) মাপিয়া দেখেন—পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঈষৎ চাপা ও মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ স্ফীত। প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান (১৪৭০-১৫২১)

১৫১৯ সনে প্রথম জাহাজে করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ আরম্ভ করেন।

বৈজ্ঞানিকদের হিসাবে বসুন্ধরার ওজন ছেষট্টির পরে কুড়িটি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, তত টন—এক টন ২৭ মণের সমান। এই ধরণী সর্ব্বদা সমস্ত বস্তু নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ বলে। সর আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর গতি প্রধানতঃ দুই প্রকার—দৈনিক ও বাৎসরিক। ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে বা এক দিনে পৃথিবী নিজের চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে অবনীর অর্দ্ধেক ভাগ একবার করিয়া সূর্য্যের আলো পায় এবং অপর অর্দ্ধেক ভাগ অন্ধকারে পড়িয়া যায়। যে অংশ যখন সূর্য্যের আলো পায় সে সময় সেখানে দিন এবং অন্য অংশ অন্ধকারে থাকার জন্য সেখানে তখন রাত্রি। দৈনিক গতি ছাড়া পৃথিবীর বাৎসরিক বেগও রহিয়াছে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এই পরিভ্রমণকাল আমাদের এক বৎসর। এই সময় পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল। সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। চার বৎসর অন্তর অতিরিক্ত পৌনে ছয় ঘণ্টা যখন জড়ো হইয়া এক দিনে পরিণত হয়, তখন উহা ২৮ দিনের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ দিয়া ২৯ দিন করা হয়। এই সব বৎসরকে লীপ ইয়ার' বলে।

পৃথিবী সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে সূর্য্যকিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়। সেজন্য ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হিমশীতল ও চিরতুষারের রাজ্য। তথাপি অনেক বাধাবিপত্তি ও তীব্র শীত উপেক্ষা করিয়াও ১৯০৯ সনে কমাণ্ডার পিয়ারী উত্তর মেরুতে গিয়া পৌছিয়াছিলেন আর ১৯১১ সনে এমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু অভিযান করিয়া-

ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা বিষুবমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি অধিকাংশ সময় সোজাভাবে পড়ে, এজন্য এই প্রদেশ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। হিমমণ্ডল ও তাপ মণ্ডলের অন্তবর্ত্তী স্থানকে সমমণ্ডল বলা হয়।

পৃথিবীর অক্ষ সোজা না থাকিয়া সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলিয়া আছে, ইহার জন্য সূর্য্য-পরিক্রমণকালে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। বৎসরের যে সময় উত্তর গোলার্দ্ধ সূর্য্যের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া গিয়া অতিরিক্ত আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করে তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সেই সময় শীতকাল। আবার অন্য সময় পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ সূর্য্যের দিকে বেশী হেলিয়া গেলে সেই অঞ্চলে গ্রীষ্মঋতু হয়, আর উত্তর অংশে সেই সময়ে খুব অল্প সৌরতাপালোক পড়ার জন্য শীতঋতু থাকে। আমাদের দেশে এই দুই ব্যাপারকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলা হয়। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয় আর গরমকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। শরৎ ও বসন্তকালে পৃথিবীর অবস্থান এ রকম থাকে যে, তখন উভয় গোলার্দ্ধে প্রায় সমভাবে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। এই সময় দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হয়।

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র সাড়ে সাতাশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে এক বার ঘুরিয়া আসে। গগনপর্য্যটনকালে কখনও কখনও চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য্য এক পংক্তিতে আসিয়া যায়, ইহার ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্র চলিতে চলিতে কোন সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যে আসিয়া পড়ে, চন্দ্র যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি।

পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ সম-আয়তন একটি জলের গোলক অপেক্ষা পৃথিবী সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী। অথচ পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত শিলারাশি পাওয়া যায় তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব

গড়ে মাত্র ২°৭। সেজন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত পৃথিবীর অভ্যন্তরে লৌহের মত কোন গুরুভার পদার্থ সঞ্চিত আছে, কারণ লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭°৫। পৃথিবীর ব্যবহার বিরাট চুম্বকের মত, সেজন্য চৌম্বক-শলাকা বা কম্পাস-শলাকা বা কম্পাস-কাঁটা সদাই উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে।

পৃথিবীর উপরে উচ্চ পর্ব্বত ও সমতল ভূমি রহিয়াছে আর নিম্নভাগে জল জমিয়া বিশাল সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীই বায়ুমণ্ডল দিয়া ঘেরা। পৃথিবীর উপরটা তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। স্থলের পরিমাণ ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল আর জলের ব্যাপ্তি ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গমাইল। সাগর-জল হইতে স্থলভাগের উচ্চতা সাধারণতঃ তিন হাজার ফুট। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতচূড়া মাউণ্ট এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। প্রশান্ত মহাসাগরে এক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট নির্ণীত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন স্থানের ব্যবধান ১২ মাইল।

এখন পাতালের বিষয় আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে উপরিভাগ ৪,০০০ মাইল হইবে। উপরকার ভূপৃষ্ঠ মাত্র ৪০ মাইল পুরু, এই স্তরে আবহাওয়া আক্রান্ত আগ্নেয় প্রস্তর, বাসাল্ট ও গ্রানাইট আছে। ধরাপৃষ্ঠের শিলাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে সাধারণতঃ এই সকল মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়—অক্সিজেন শতকরা ৪৭ ভাগ, সিলিকন শতকরা ২৮ ভাগ, এলুমিনিয়াম শতকরা ৮ ভাগ, লৌহ শতকরা ৫ ভাগ, ক্যালসিয়াম শতকরা ৩°৫ ভাগ, ম্যাগ্নেসিয়াম শতকরা ২ ভাগ, সোডিয়াম শতকরা ২°৫ ভাগ, পোটাসিয়াম শতকরা ২°৫ ভাগ, অঙ্গার, ক্লোরিণ ইত্যাদি শতকরা ১°৫ ভাগ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল খুব সম্ভব লৌহ ও নিকেলে গঠিত তরল এক গোলক, উহার উপর লৌহ ও শিলাসংযুক্ত নমনীয় ও নিরেট এক আবরণ, তাহার উপর কঠিন প্রস্তরের খোলা। মানুষ এ পর্য্যন্ত মাত্র পৌনে দুই মাইল গভীর খনি খুঁড়িতে সক্ষম হইয়াছে।

পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হইলেও ভিতরটা এখনও খুব গরম। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত উত্তপ্ত ও গলিত শিলাস্রোত এবং ভূগর্ভনির্গত উষ্ণ প্রস্রবণ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের পরিচয় দেয়। বীরভূম ও রাজগীর অঞ্চলে গরম জলের ঝরণা অনেকেই দেখিয়াছেন। আসলে এই সব জায়গায়—উপরকার জল এক দিক দিয়া মাটির খুব নীচে প্রবেশ করে আর সেখান হইতে গরম হইয়া অন্য পথ দিয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে। মাটি খুঁড়িয়া নীচে নামিলে কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রতি ৬০ ফুট অন্তর এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্য্যের একাংশ কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী এক জ্বলন্ত গ্যাসের ঘূর্ণ্যমান পিণ্ড ছিল, ইহা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল পরে কঠিন অবস্থা লাভ করিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবী ঘিরিয়া বায়ুর যে আবরণ রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই সব গ্যাসের অস্তিত্ব জানা যায়—অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ, নাইট্রোজেন শতকরা ৭৮ ভাগ, আরগন, কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড, জলবাষ্প প্রভৃতি শতকরা ১ ভাগ। এই বায়ুরাশি সম্ভবতঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক দুই শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। তাহার পর মহাশূন্য। দক্ষিণ আমেরিকার কণ্ডর নামক শকুনপক্ষী আকাশে চার মাইল উচ্চে উড়িতে পারে, আর কোন জীবই এত উর্দ্ধে যাইতে পারে না। এরোপ্লেনে করিয়া আকাশে উঠিলে কিংবা কোন পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলে বেশ শীত বোধ হয়। প্রতি হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলে তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা কমিয়া যায়। এই নিয়ম কিন্তু দশ মাইল অবধি খাটে, তাহার পর কিছু দূর পর্য্যন্ত তাপমান স্থির থাকিয়া আবার কোন অজ্ঞাত কারণে বাড়িতে আরম্ভ করে।

সূর্য্যতাপে ভূমিসংলগ্ন বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে আর অন্য

স্থান হইতে শীতল বাতাস আসিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, এইরূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের গতি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, ঝড়ের সময় বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। দুই শত মাইল উচ্চ বায়ুব স্তূপ সমতল স্থানের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের ওজনের চাপ দিতেছে। ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর চাপ মাপা যায়। সাগরতলে ব্যারোমিটারে পারদের দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি থাকে। যত উপরে উঠা যায়, বায়ুব চাপ তত কমিয়া যায়। উর্দ্ধে প্রতি হাজার ফুট অন্তর ব্যারোমিটারের পারা এক ইঞ্চি করিয়া নামিয়া আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুস্রোত সর্ব্বদা উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়, এজন্য প্রবল ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়।

মেঘ-বৃষ্টির কারণও সূর্য্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্য্যতাপে সমুদ্রের জলরাশি বাষ্প হইয়া আকাশে গিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া নদ-নদী দিয়া পুনরায় সাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বৃষ্টিজলের কিয়দংশ ছিদ্রময় মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও নীচেকার নিশ্ছিদ্র শিলাশ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে, সেজন্য মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। আকাশে যে স্তর-মেঘ দেখা যায় তাহার উচ্চতা আধ মাইল কিন্তু স্তূপ-মেঘ এক মাইল উপরে অবস্থান করে, আর অলক-মেঘের অবস্থিতি প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে। ইহার উপরে যে বায়ুস্তর আছে তাহা ঝড়বৃষ্টিশূন্য ও প্রশান্ত।

প্রায় কুড়ি মাইল উচ্চে উষ্ণ ওজন (ozone) গ্যাসের যে স্তর আছে তাহা শব্দতরঙ্গ প্রতিহত করে। আবার ৬০ মাইল উচ্চে হেভি-সাইড-কেনেলী স্তর নামক এক বিদ্যুৎকণাপূর্ণ স্থান আছে। উহার পরে ১৭০ মাইল উর্দ্ধে দ্বিতীয় আর এক বৈদ্যুতিক স্তর রহিয়াছে, ইহাকে এপল্টন স্তর বলা হয়। উভয় বৈদ্যুতিক স্তরই অল্পাধিক রেডিওতরঙ্গ প্রতিহত করে। খুব

উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলে কিংবা উর্দ্ধাকাশে উঠিলে প্রথমে তীব্র শীত বোধ হয় আর বাতাসের চাপ হ্রাস হওয়ায় ও অক্সিজেনের অংশ কমিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাসের বড় কষ্ট হইতে থাকে। তথাপি ১৯৩৫ সনে ক্যাপ্টেন ষ্টিভেন্স ও এণ্ডার্সন নামক দুই জন অসমসাহসী আমেরিকান বৈমানিক বেলুনে করিয়া প্রায় চৌদ্দ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন।

সমুদ্রে যে বিশাল জলভাণ্ডার আছে তাহার মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। সাগরজলে শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ বিভিন্ন লবণজাতীয় পদার্থ দ্রব অবস্থায় আছে। বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রের জলে অনবরত ঢেউ হয়। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উচ্চ এবং প্রায় পাঁচ শত ফুট দীর্ঘ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাগর-তরঙ্গ বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া পড়ে আর শিথিল শিলাসমূহ অপসারিত করে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে বার হাজার ফুট। ১৯৫৪ সনে দুই জন ফরাসী নৌ-বিভাগীয় অফিসার—জর্জ্জ ও পিয়ারী উইলিয়াম, ইস্পাত-নির্ম্মিত গোলকে বসিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে আড়াই মাইল নীচে নামিয়াছিলেন। সমুদ্রের যত নীচে নামা যায়, জলের চাপ তত বাড়িতে থাকে। দড়ি, কাঠ কিংবা কর্ক গভীর সাগরে নিমজ্জিত করিলে প্রবল চাপের ফলে পিষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ উপর হইতে নীচে দশ গজ অন্তর জলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের করিয়া বাড়িতে থাকে। এক মাইল নিম্নে প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাতাশ মণ ওজনের জলের চাপ পড়ে। জলমধ্যস্থ মৎস্যাদি প্রাণী এই বিপুল চাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না, কারণ ইহাদের শরীরের ভিতরকার চাপ বাহিরের জলচাপকে সমানভাবে প্রতিরোধ করে। সমুদ্রের তলায়ও বহুরকম জীব বাস করে।

ঠাণ্ডা জল ঘন হইয়া নীচে নামিয়া যায় আর গরম জল স্ফীত হইয়া উপরে উঠিয়া আসে, তাপের তারতম্যের জন্যই সাগর-স্রোতের সৃষ্টি হয়।

সমুদ্রের তলার জল প্রায় তুষার-শীতল, উপরকার জলের তাপমাত্রা ৪০°—৮০° ফারেনহাইট থাকে। সূর্য্যের আলোক সাগরের নীচে বেশী দূর যাইতে পারে না। জলের ভিতর সাদা অলোকের গতি সচরাচর এক শত গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহার পর অত্যন্ত অন্ধকার আরম্ভ হয়। এইজন্য অনেক সামুদ্রিক জীবের শরীরে জোনাকির মত স্বাভাবিক আলো জ্বলিবার ব্যবস্থা আছে।

চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য সাগরজল দিনে দুই বার স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাকেই জোয়ায় আসা বলে। এক জায়গায় যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন অন্য স্থানের জল কমিয়া ভাটার সৃষ্টি হয়। এইরূপে জোয়ার ও ভাটা প্রায় ছয় ঘণ্টা অন্তর হইতে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় চন্দ্র-সূর্য্য ও পৃথিবী অনেকটা এক পংক্তিতে থাকে সেই জন্য তখন উভয়ের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে জোয়ারের জোর বেশী হয়। অপর সময় সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমকোণে থাকিয়া পৃথিবীর জলরাশিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে, সেজন্য সে সময় জলস্ফীতি কম হয়।

পৃথিবীর উপরকার আদিম আগ্নেয়শিলা ঝড়-বৃষ্টি এবং শীত ও সূর্য্য-তাপের প্রভাবে ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া শেষে মাটিতে পরিণত হয়। মাটির প্রধান উপাদান জলযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট। জল, বায়ু ও শীতোত্তাপের প্রভাবে পৃথিবীর উপবিভাগ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চূর্ণীকৃত শিলারাশি হয় সেখানেই থাকিয়া যায়, নয়ত জলস্রোতের সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। ইহা ছাড়া ধূলি ও বালুকণা বায়ু-বাহিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করে। এক জায়গার ক্ষয়িত শিলা—জল বা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া অন্যস্থানে অনবরত সঞ্চিত হইতেছে। পর্ব্বতাগত নদীর জল ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া গিয়া সাগর-সমীপবর্ত্তী মোহনায় অবিরাম প্রস্তরচূর্ণ ও মৃত্তিকাকণা নিক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও গঠনের কার্য্য

যুগপৎ চলিতেছে। হিমালয়ের শিলা ক্ষয় হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমি ও বঙ্গদেশ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সব স্তরে স্তরে সঞ্চিত শিলাচূর্ণকে পাললিক প্রস্তর বলে। আর উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে যে শিলা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহার নাম আগ্নেয় অশ্ম। চাপ ও তাপের প্রভাবে পাললিক শিলা কখনও কখনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন শেল নামক কাদা পাথর পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্লেটে পরিণত হয়। মর্ম্মর-প্রস্তর রূপান্তরিত চূণাপাথর ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসরে পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ এক ফুট আন্দাজ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। যেমন সমগ্র ভূমিভাগ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, তেমনই সমুদ্রের উপকূলে উহার অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া নদ-নদী হইতে অনবরত পলি পড়িয়া সাড়ে সাত শত বৎসর অন্তর এক ফুট করিয়া নূতন ভূভাগ গঠিত হইতেছে। জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, শীত, সূর্য্যতাপ, ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমি সঙ্কোচের ফলে সারা পৃথিবীময় বিরাট পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোথাও কোন ভূভাগ পার্শ্বচাপের ফলে উপরে উঠিয়া যায়, যেমন হিমালয় পর্ব্বত পাঁচ কোটি বৎসর পূর্ব্বে টেথিস নামক সাগরতল হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ হিমালয়-শীর্ষে অনেক রকম সামুদ্রিক জীবের ছাপ, কঙ্কাল ও প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন সময় হয়ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ বেশ খানিকটা নীচে বসিয়া গেল। সুইডেনের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী সাগরজলে প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট নিমজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। ১৮১৯ সনে ভূমিকম্পের পর কচ্ছ উপসাগরের বেলাভূমি সমুদ্রজলে অনেকখানি নামিয়া যায়।

ভূকম্পন বিভিন্ন কারণে সঙ্ঘটিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর তাপ বিকিরণের ফলে শীতল ও সঙ্কুচিত হইলে সেই সঙ্গে উপরকার শিলাস্তরও

বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যায়, ইহার জন্য ভূতল কম্পিত হইতে থাকে। আগ্নেয়-গিরি সক্রিয় হইবার সময় আভ্যন্তরিক উষ্ণ বাষ্পচাপের জন্য বসুন্ধরার উপরিভাগ কাঁপিয়া উঠে। ইহা ছাড়া ভূমিপাত ও স্তরচ্যুতির জন্যও ভূমি আন্দোলিত হইতে পারে। ভূকম্পনের সময় মাটি ফাটিয়া গরম জল বাহির হয় এবং জলপূর্ণ কূপ অকস্মাৎ শুষ্ক ও বালুকাপূর্ণ হইয়া যায়। রাস্তা ও নদীর গতি বাঁকিয়া যায়। কোন স্থান উত্তোলিত ও অন্য স্থান অবনমিত হয়। এক কথায় ব্যাপক বিপর্য্যয় ঘটে।

বসুমতীর বয়স আনুমানিক দুই শত কোটি বৎসর হইবে। প্রায় এক শত কোটি বৎসর আগে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, সর্ব্বপ্রথম সাগরজলে বীজাণু, এক-কোষ প্রাণী ও শৈবালের উৎপত্তি হয়। ইহার পঞ্চাশ কোটি বৎসর পরে বিবিধ খোলসধারী জীব, চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, শামুক এবং জলজ কীট ও উদ্ভিদের জন্ম হয়। প্রায় চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে মেরুদণ্ডযুক্ত জলচর মৎস্য ও স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ত্রিশ কোটি বৎসর আগে কীটপতঙ্গ ও উভচর ভেক আবির্ভূত হয়, এবং ফার্ন, শৈবাল প্রভৃতি সমস্ত অপুষ্পক গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ঘটনাক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়িয়া তাপের প্রভাবে এখনকার কয়লায় পরিণত হয়। পনর কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীময় এক শ' ফুট দীর্ঘ টিকটিকি গিরগিটিজাতীয় বিরাটকায় সব সরীসৃপ বিচরণ করিত। মাত্র দশ কোটি বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তু ও বিবিধ প্রকার বায়ু-বিহারী পক্ষী এবং সপুষ্পক বৃক্ষসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। গত দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে ধরা-ধামে মানুষ আসিয়াছে এবং মাত্র দশ হাজার বৎসরের ভিতর আশ্চর্য্যরকম সভ্যতার বিকাশ এবং শেষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আদিম জলচর এককোষ জীবের ক্রমবিকাশের ফলেই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রাথমিক হইতে আধুনিক, সকলপ্রকার জীবের

স্বাভাবিক বা শিলীভূত দেহাবশেষ ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। এই স্তরবিন্যাসের বিষয় উইলিয়াম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩৯) আবিষ্কার করেন আর প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশের কথা ১৮৫৯ সনে ডারুইন (১৮০৯-১৮৮২) প্রকাশ করেন।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ প্রকার প্রাণী এবং তিন লক্ষ রকম গাছপালার বিষয় ভালভাবে জানা গিয়াছে। জগতে পাঁচ লক্ষ প্রকার পতঙ্গ, কুড়ি হাজার রকম মাছ, তিন হাজার বেঙজাতীয় উভচর, পাঁচ হাজার সরীসৃপ, তের হাজার চতুষ্পদ জন্তু এবং আটাশ হাজার রকম পাখী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সংখ্যাও অগণিত। মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই শত পঞ্চাশ কোটি হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বেকার হিসাবমতে প্রতি মিনিটে এক শ' কুড়ি জন লোক জন্মগ্রহণ করে আর এক শ' জন ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায়। সুতরাং মিনিটে কুড়ি জন করিয়া লোক বাড়ে। সাধারণতঃ জনসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা এক ভাগ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় স্থির ছিল এবং জন্ম-মৃত্যুর হার প্রায় সমান ছিল। আর জীবজগতেও শত্রু এবং সংক্রামক ব্যাধি ও খাদ্যের সীমা সর্ব্বদা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সেই জন্য ইতরপ্রাণীর কখনও অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, জন্ম ও মৃত্যু সাধারণতঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষুদ্র প্রাণী সংখ্যায় বেশী থাকে আর বৃহৎ জীব সংখ্যায় কম।

সাধারণ সবরকম গাছ মাটি, জল ও বাতাস হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দেহ গঠন করে। গাছের সবুজ পাতা দিনের বেলায় সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া বাকি অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং মাটি হইতে শিকড়ের দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে শরীর গঠন করে। নিরামিষাশী

জীবজন্তু উদ্ভিজ্জপদার্থ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে আর আমিষভোজী প্রাণী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করে। মানুষ ও আর সব জীবজন্তু নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন লইয়া উহার সাহায্যে দেহমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু দগ্ধ করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, আর প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলবাষ্প বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে কার্ব্বন বা অঙ্গার অণু উদ্ভিদ হইতে প্রাণিদেহে এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদ-শরীরে পুনঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে। জীবিত জীবজন্তুর নাইট্রোজেনবহুল মূত্র ও পুরীষ মাটিতে পড়িলে সার হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে আর কোন জীব মরিয়া গেলে তাহার শরীর বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্ব্বার বায়ু এবং মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদজাতি পুনরায় শরীরগঠনের সকল উপাদান মাটি ও বাতাস হইতে সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কোন বস্তু কণামাত্র বিনষ্ট হয় না, রাসায়নিক চক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

সবশেষে ভৌগোলিক তথ্যের সমাবেশ করা যাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,০০০ মাইল। বৃহত্তম হ্রদ ক্যাস্পিয়ান সাগরের বিস্তার ১,৬৫,৫২০ বর্গমাইল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড ৮,৪৬,৭৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা ৩৫,০০,০০০ বর্গমাইল। এখানে বৎসরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। সাহারার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত লিবিয়াতে আজিজিয়া বলিয়া এক জায়গায় এত গরম যে, সেখানে তাপমাত্রা ১৩৬° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার অন্য দিকে ভারকোয়ান্সক নামক সাইবিরিয়ার এক গ্রামে শীতকালে এত দারুণ ঠাণ্ডা হয় যে, তাপমাত্রা শূন্য হইতে আরও ৯০° ফারেনহাইট নীচে নামিয়া যায়। আসামের চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় পাঁচ শত ইঞ্চি বারিপাত

হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি মৌনালোয়া হাউই দ্বীপে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ১৩,৭৬০ ফুট, গহ্বরের ব্যাস ১২,৪০০ ফুট। তিব্বতের অন্তর্গত ফারি সহর ১৪, ৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ভেনিজুয়েলার অন্তর্বর্ত্তী এঞ্জেল জলপ্রপাত ৩,২১২ ফুট উচ্চ। পৃথিবীর বৃহত্তম জীব আমেরিকার সিকুইয়া গাছ ৩০০ ফুট উচ্চ, ৩০ ফুট প্রস্থ, ২,০০০ টন ভারী। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দৃশ্যমান আণুবীক্ষণিক জীবাণুর বিস্তার এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ আর ওজন এক গ্রেণের সাত লক্ষ কোটি ভাগ মাত্র।

আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারা যায়।

সাধারণতঃ ভাবী আবহাওয়ার অবস্থা ব্যারোমিটারের সাহায্যে স্থির করা হয়। এই যন্ত্র গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলি ইটালীতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ইহার গঠন মোটেই জটিল নয়। এক মুখ বন্ধ এক গজ লম্বা একটি কাচের নল পারদপূর্ণ করিয়া উহার খোলা মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া জোরে চাপিয়া অপর একটি পারদভরা পাত্রের মধ্যে সাবধানে উপুড় করিয়া সোজাভাবে ধরিতে হয়, তাহার পর আঙ্গুল সরাইয়া লইলে নলমধ্যস্থ পারদ খানিকটা নামিয়া আসে। নলের ভিতরকার পারদের উচ্চতাই বাতাসের চাপ নির্দ্দেশ করে। পারদস্তম্ভের ঊর্দ্ধগতি বা নিম্নগতি হইতে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন জানা হয়।

অ্যাডমিরাল ফিজরয়ের মতে, বৃষ্টির দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদ-স্তম্ভ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে দুই-এক দিনের মধ্যেই

বৃষ্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়; কিন্তু পারদস্তম্ভ যদি হঠাৎ খুব উপরে উঠিয়া যায় তাহা হইলে এই পরিষ্কার আবহাওয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না। পারদস্তম্ভকে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, খুব পরিষ্কার দিন আগতপ্রায়। খুব গরম দিনে যদি যন্ত্রের ভিতরের পারদ হঠাৎ নামিতে আরম্ভ কবে তাহা হইলে ঝড় ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টির দিনে পারদ নামিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে, আরও বৃষ্টিপাত হইবে। মেঘশূন্য পরিষ্কার দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদ নীচে নামিয়া সেখানেই থাকে তবে দুই-তিন দিনের মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যারোমিটারের পারদ-স্তম্ভের দ্রুত পতনের দ্বারা বৃষ্টি বা বাত্যার সম্ভাবনা জানাইয়া দেয়। সমভূমিতে পারদের উচ্চতা অনুসারে আবহাওয়ার কিরূপ পার্থক্য হইবে তাহাব একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা		আবহাওয়ার অবস্থা
৩১	ইঞ্চি	অত্যন্ত শুষ্ক
৩০ ১/৩	"	স্থির পরিষ্কার
৩০ ১/২	"	পরিষ্কার
৩০	"	পরিবর্ত্তন
২৯ ২/৩	"	বৃষ্টি
২৯ ১/৩	"	অতিবৃষ্টি
২৯	"	ঝড়

বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে সময় সময় আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়। যদি দেখা যায়—বাতাস সমুদ্রের দিক হইতে আসিতেছে, তাহা হইলে আর্দ্র আবহাওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে বৃষ্টির পূর্ব্বে বাতাসকে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে আসিতে দেখা যায়। কোন শুষ্ক প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকিলে বৃষ্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়। শীতকালে, ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব্ব অথবা উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে।

মেঘ হইতেই বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। সুতরাং মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে ঝড়-জলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারা যায়। মেঘের আকার ও গঠন বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হাওয়ার্ড নামে এক বৈজ্ঞানিক মেঘকে চার ভাগে বিভক্ত করেন; যথা—স্তর-মেঘ, স্তূপ-মেঘ, অলক-মেঘ ও অম্বুদ-মেঘ।

স্তর-মেঘকে চক্রবাল রেখার সমান্তরালে লম্বা লম্বা স্তরে গঠিত হইতে দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই সূর্য্যাস্তের সময় গঠিত হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে এবং সূর্য্যোদয়ের পর আকাশে মিলাইয়া যায়। এই মেঘ সাধারণতঃ পরিষ্কার আবহাওয়ার লক্ষণ। স্তর-মেঘ আধ মাইল উচ্চে থাকে।

অলক-মেঘ দেখিতে অনেকটা চামরের শুভ্র কেশগুচ্ছের মত। ইহা বহু উচ্চে অবস্থান করে। এই মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিলে বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। ইহার উচ্চতা সাত মাইল।

স্তূপ-মেঘ দেখিলে মনে হয় যেন রাশি রাশি ধোনা তূলা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। সাধারণতঃ শরৎকালে স্তূপ-মেঘ পালকের মত আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। এ রকম পাতলা সাদা স্তূপ-মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়ার চিহ্ন। কিন্তু বৈশাখ মাসে এবং শরৎকালে কোন কোন দিন এক প্রকার ঘন কালো স্তূপ-মেঘ আকাশে দেখা যায়। আকাশে এইরূপ কালো মেঘ দেখিতে পাইলে মাঝি-মাল্লারা দুর্য্যোগের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাবধান হয়। বৈশাখ মাসে ঘন কালো স্তূপ-মেঘ দেখা গেলে প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হয়; তাই

লোকে ইহাকে কালবৈশাখীর মেঘ বলে। স্তূপ-মেঘ প্রায় এক মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থান করে।

যে মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় তাহাকে অম্বুদ-মেঘ বলা হয়। সেই মেঘের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। দেখিলে মনে হয় যেন একটি ধূসর বর্ণের যবনিকা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সাধারণতঃ মেঘের আকার ও সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা স্বাভাবিক ; কিন্তু বড় বড় মেঘের গঠন ও পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পরিষ্কার আবহাওয়া আশা করা অসঙ্গত নয়।

অনেক সময় দুই-তিন রকমের মেঘ মিশিয়া নূতন মেঘের সৃষ্টি হয়। অলক-মেঘ ও স্তূপ-মেঘ মিলিয়া একপ্রকার ধূসর রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘকে চলতি কথায় কোদালে-কুড়ুলে মেঘ বলে। আকাশে কোদালে-কুড়ুলে মেঘ দেখা গেলে দুই-এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাংলাদেশে প্রচলিত খনার বচনে আছে :—

কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলগে চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় জল হবে কাল॥

অস্তগামী সূর্য্যের রং লক্ষ্য করিলে আবহাওয়ার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশে যে রক্তাভ বা কমলাভ বর্ণচ্ছটা দেখা যায়, তাহা পরিষ্কার আবহাওয়ার লক্ষণ ; কিন্তু এই সময় আকাশের রং ম্লান, পীতাভ বা হরিতাভ বোধ হইলে প্রবল বায়ু কিম্বা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সূর্য্যের রং অস্বাভাবিক আরক্তিম মনে হইলে প্রায়ই আঁধি হইতে দেখা যায়।

রজতশুভ্র চন্দ্র পরিষ্কার আকাশের চিহ্ন। কিন্তু রাত্রিকালে এই উপ-

গ্রহকে ম্লান বা রক্তাভ বোধ হইলে বৃষ্টি বা বাত্যার আশঙ্কা করা অন্যায় নয়। চন্দ্র বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে রামধনু রঙের গোলাকার বৃত্ত বা সভা দেখা দিলে বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক লক্ষণ হইতে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ঝড়-বৃষ্টির ঠিক পূর্ব্বে সমস্ত প্রকৃতি কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুমণ্ডল অস্বাভাবিক স্থির ও শুদ্ধ বোধ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই জল-ঝড় হইবে। দূরের পাহাড়ে মেঘ নামিতে দেখিলে বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়।

রাত্রিতে প্রচুর শিশির পড়িলে পরের দিন সাধারণতঃ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

পশু-পক্ষীর আচবণ মন দিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক সময় আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যার। জীবজন্তুরা সহজাত সংস্কারের বশে ঝড়-জলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে বিড়াল অস্থিবভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে এবং সুবিধা পাইলে গৃহের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়া নিদ্রা যায়। ঝড়-বৃষ্টিব সম্ভাবনা হইলে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা চঞ্চল হইয়া সভয়ে ডাকিতে থাকে এবং নিবাপদ স্থানে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে।

বৃষ্টি বা বাত্যার সম্ভাবনা থাকিলে সমুদ্রের পাখীরা আহার্য্য অন্বেষণে বহুদূরে না গিয়া সাগব-তীরের খুব নিকটে উড়িতে থাকে। পরিষ্কার দিনে ইহারা সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূরে উড়িয়া যায়।

পরিষ্কার আবহাওয়ায় চাতক খুব উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি আসন্ন হইলে ইহারা অনেকটা নীচে নামিয়া আসে। কাক ও সারসপাখী খাদ্যান্বেষণে দূরে না গিয়া কোন বৃক্ষে বসিয়া কলরব করিতে থাকিলে

বুঝিতে হইবে যে, ঝড়-জলের সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে পায়রা নিজের বাসায় ফিরিয়া আসে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও খুব উঁচুতে চিল উড়িতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নাই। বৃষ্টির পূর্ব্বে ইহারা নীচে নামিয়া আসে।

অকারণে ঘন ঘন ব্যাং ডাকিলে বুঝিতে হইবে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। বৃষ্টি আসন্ন হইলে মাছেরা জলের উপরে ভাসিয়া আনন্দে লাফালাফি করিতে থাকে।

মৌমাছিরা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সহজেই বুঝিতে পারে। ঝড়-বৃষ্টির সূচনা হইলে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে চাকে ফিরিয়া আসে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে পিপীলিকারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে যত শীঘ্র সম্ভব তাহারা সারবন্দিভাবে ডিম ও বাচ্চা মুখে লইয়া কোন শুষ্ক নিরাপদ স্থানে গমন করে।

উল্লিখিত প্রাণীবর্গ ব্যতীত স্কার্লেট পিম্পার্নেল, ক্যামোমাইল, ড্যাণ্ডে-লিয়ন, ডেজি প্রভৃতি বিলাতী পুষ্প আবহাওয়ার পবিবর্ত্তন সম্বন্ধে এরূপ অনুভূতি সম্পন্ন যে, ঝড়-বৃষ্টি কিম্বা শিলাবৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাদের কোমল পাপড়িগুলি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

প্রস্তরের বৈচিত্র্য

জীব জগতে যেমন অনেক অদ্ভুত উদ্ভিদ ও বিচিত্র প্রাণীর অস্তিত্ব রহিয়াছে, জড়জগতেও সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক বহুবিধ আকরিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইসব খনিজ বস্তুর বিচিত্র গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই প্রবন্ধে এইরূপ কতিপয় প্রস্তরের বিষয়

সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমে ক্যালসাইট নামক পাথরের বিষয় লইয়া আরম্ভ করা যাক। এই প্রস্তর এক জাতীয় দানাদার খড়ি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা স্বচ্ছ বর্ণ-হীন, হলদে, লাল, নীল, বাদামী বহু প্রকার হয়। ইহার রাসায়নিক উপাদান ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট। প্রাপ্তিস্থান—আইসল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ইটালী ও আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে রাজস্থান অঞ্চল। ১৬৬৯ সালে বার্থোলিন নামক এক বৈজ্ঞানিক প্রথম লক্ষ্য করিয়া দেখেন, এই পাথরের আলোকবক্রণ ক্ষমতা বিবিধ। কোন রেখাকে এই প্রস্তরেব মধ্য দিয়া দেখিলে দুইটি বলিয়া মনে হয়। কিম্বা কোন বিন্দুর উপর এই পাথর বসাইয়া দেখিলে দুইটি বিন্দু বোধ হয়। এই সময় পাথরখানি ধীরে ঘুরাইলে এক বিন্দুর চারিপার্শ্বে অন্য বিন্দুকে আবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ আমেরিকান খনিজতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড ডানা লিখিয়াছেন, কোন কোন ক্যালসাইট প্রস্তর উত্তপ্ত করিলে কিম্বা সূর্য্যালোকে রাখিয়া অন্ধকারে আনিলে অথবা রেডিয়াম রশ্মির সম্মুখে স্থাপন করিলে ক্ষীণ জ্যোতি বিকিরণ করিতে থাকে। আলোক-রশ্মি একমুখী (polarise) করিবার যন্ত্রে এই প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়। দুই আঙ্গুল দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিলে ক্যালসাইটে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।......

রবীন্দ্রনাথের কথায়—'এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা' আশ্চর্য্য মনে হইলেও অসম্ভব নয়। সত্যই এ রকম পাথর আছে। এই সব প্রস্তর খুব ছিদ্রবহুল ও বায়ুপূর্ণ হয়, সেজন্য জলে পড়িলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ভাসিতে থাকে। পিউমিস নামক আগ্নেয়শীলা এই জাতীয়। ইহার প্রধান উপাদান কাঁচ। এই পাথর ঘর্ষণ ও পালিশ করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইটালীর নিকটবর্ত্তী লিপারী দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। আর জলে ভাসে এক রকম ওপাল পাথর, যাহার নাম ভাসমান প্রস্তর

(floatstone)। পিউমিস ও ফ্লোটষ্টোন উভয় প্রস্তরে যথেষ্ট সিলিকা থাকে। ইটাকলুমাইট বলিয়া এক প্রকার বেলে পাথর আছে। এই পাথর প্লেটের মত পাতলা অবস্থায় বেশী নমনীয় হয়, সেজন্য ইহার অপর নাম flexible sand-stone বা ভঙ্গুর বেলে পাথর। অভ্র ও বালি ইহার প্রধান উপাদান। ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশে এই পাথর পাওয়া যায়।

ফ্লুওরস্পার বলিয়া যে পাথর আছে, তাহার গুণ অনেক। প্রতিফলিত আলোক রশ্মিতে দেখিলে ফ্লুওরস্পার নীলাভ মনে হয়। অধ্যাপক ষ্টোক্‌স্ এই ব্যাপার প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফ্লুওরিসেন্স (fluorescence) আখ্যা দিয়াছিলেন। অন্ধকারে ফ্লুওরস্পার উত্তপ্ত করিলে সবুজাভ দীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকে। এই পাথরের আলোক শোষণের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে। কিছুক্ষণ সূর্য্যালোকে রাখিয়া অন্ধকারে আনিলে ফ্লুওরস্পার মৃদু জ্যোতি বিকিরণ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া, ফ্লুওরস্পার গরম করিলে কিম্বা উজ্জ্বল আলোকিত স্থানে রাখিলে উহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। এই পাথর তাপ-রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ, অর্থাৎ ইহার ভিতর দিয়া তাপ-প্রবাহ অবাধে গমন করিতে পারে। ফ্লুওরস্পারের রাসায়নিক উপাদান ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড। এই প্রস্তর সাদা, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, নীল, সবুজ, লাল, হলদে নানা রকম হয়। প্রাপ্তিস্থান—ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ও আমেরিকা। কাঁচ ও ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্যে ও এনামেল করিতে এই প্রস্তর লাগে।

এবার একটি বিস্ময়কর খনিজবস্তুর বিষয় বলিব। ইহার নাম পিচব্লেণ্ড, দেখিতে কালো কিম্বা গাঢ় বাদামী। এই পদার্থ বিলক্ষণ তেজস্ক্রিয় (radio-active)। অন্ধকারে ফোটোগ্রাফির কাঁচ বা ফিল্মের উপর পিচব্লেণ্ড কয়েক দিন রাখিয়া দিলে, ঐ কাঁচ বা ফিল্মে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া পিচব্লেণ্ড হইতে তেজো-রশ্মি

বিকিরণের ফলে সঙ্ঘটিত হয়। পিচব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, সীসা প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পিচব্লেণ্ড হইতে তিন রকম বিকিরণ হয়—প্রথম, আলফা-রশ্মি বা হিলিয়াম অণু, দ্বিতীয়, বিটা-রশ্মি বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা আর তৃতীয়, তেজস্কর গামা-রশ্মি যাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রঞ্জন-রশ্মি অপেক্ষাও কম। ১৮৯৮ সালে ম্যাডাম কুরী বিশুদ্ধ পিচব্লেণ্ড হইতে যৎসামান্য রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন। এক টন পিচব্লেণ্ড হইতে প্রায় পঞ্চাশ মিলিগ্রাম রেডিয়াম পাওয়া যায়। রেডিয়াম তেজস্ক্রিয়তায় পিচব্লেণ্ড অপেক্ষাও অনেকগুণ শক্তিশালী। তেজস্ক্রিয়তার ফলে ইউরেনিয়াম হইতে রেডিয়াম এবং রেডিয়াম হইতে সীসা উৎপন্ন হয়। ১৬০০ বৎসর পরে রেডিয়ামের অর্দ্ধেক সীসায় পরিণত হয়। সকলেরই জানা আছে, আজকাল ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম-রশ্মি কত ফলপ্রদ। রেডিয়াম অন্ধকারে জ্যোতি বিকিরণ করে। ইহা পারিপার্শ্বিক সকল পদার্থ অপেক্ষা সামান্য গরম থাকে। চামড়ার উপর বেশীক্ষণ রেডিয়াম রাখিলে চামড়া ভীষণভাবে পুড়িয়া যায়। ঘড়ির উপর গন্ধকঘটিত দস্তার সহিত অতি অল্প রেডিয়াম লবণ মিশ্রিত করিয়া অঙ্কন করিলে ঐ লেখা অন্ধকারে বেশ পড়া যায়। পিচব্লেণ্ড ইংলণ্ড, নরওয়ে, জার্ম্মাণী, রাশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে গয়া, রাজস্থান ও মাদ্রাজ অঞ্চলে পাওয়া যায়। আণবিক বোমা তৈয়ারীর জন্য পিচব্লেণ্ড জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বাল্যকালে বটতলার ছাপা যাদুবিদ্যার বই-এ অনেকেই অদহনীয় বস্ত্রের কথা পড়িয়া থাকিবেন। আজকাল এই প্রকার অদাহ্য বস্ত্র সহজেই প্রস্তুত করা হয়। এসবেস্টস নামক এক রকম খনিজবস্তু আছে। এই পদার্থ সূত্রবৎ অংশুবহুল। এই প্রস্তর পাটের মত বহু তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই জন্য ইহাকে স্থানবিশেষে পাহাড়ী পশম বা পাথুরে কাঠ বলা হয়। ইহার

তন্তুগুলি অগ্নিতে অদহনীয়, এসবেস্টস কথার মানেই হইল অদাহ্য। এসবেস্টসের আঁশ দিয়া কাপড় বোনা ও দড়ি তৈয়ারী করা যায়। অগ্নি-রোধক কার্য্যে এসবেস্টস অংশু দিয়া তৈয়ারী বস্ত্র ও রজ্জু ব্যবহৃত হয়। এসবেস্টস তন্তু জমাইয়া অগ্নি ও এসিড নিরোধক বোর্ড প্রস্তুত হয়। সিমেণ্টের সহিত এসবেস্টস মিশ্রিত করিয়া ঘর ছাইবার চাদর হয়। এসবেস্টসের প্রধান উপাদান ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। বর্ণ—সাদা, সবুজ বা বাদামী। প্রাপ্তিস্থান—ক্যানাডা, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ।

ইস্পাত নির্ম্মিত কৃত্রিম চুম্বক লৌহখণ্ড আকর্ষণ করে, সে কথা সকলেই জানেন। এক প্রকার স্বাভাবিক প্রস্তরের এই রকম চৌম্বক গুণ আছে। ইহাকে অয়স্কান্ত শিলা বলে, ইংরাজী নাম magnetite বা lode stone। এসিয়া মাইনরে অবস্থিত ম্যাগনেসিয়া হইতে প্রথম পাওয়া যায় বলিয়া ম্যাগ্নেটাইট নামের উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। অপরদিকে পণ্ডিতপ্রবর প্লিনির মতে ইহার আবিষ্কার ম্যাগ্নেস নামক একজন পশুপালক, সে যখন তাহার পাল লইয়া চারণভূমিতে গমন করে, তখন তাহার জুতার পেরেক ও পাচনবাড়ি সংলগ্ন লৌহ বলয় কোন অজ্ঞাত কারণে ভূমিতে আটকাইয়া যায়, পরে অনুসন্ধানের ফলে এই পাথরের অস্তিত্ব বাহির হয়। যাহা হউক, ম্যাগ্নেটাইট স্বাভাবিক চুম্বক, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণা আকর্ষণ করিতে পারে, এই ক্ষমতা পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তি হইতে লব্ধ। সুতা জড়াইয়া ঝুলাইয়া দিলে ইহার একদিক উত্তরমুখে ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণদিকে অবস্থান করে। সেই জন্য এই খনিজের অপর নাম lodestone বা leading stone। চুম্বক প্রস্তরের প্রধান উপাদান ৭২ ভাগ লৌহ ও ২৮ ভাগ অক্সিজেন। ইহার বর্ণ কালো। সাধারণ অবস্থায় সুস্পষ্ট অষ্টপার্শ্ববিশিষ্ট দানাদার অয়স্কান্ত শিলা পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন ও সাইবেরিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রাকৃতিক চুম্বকের

আকর আছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্স-ল্যাণ্ডে চুম্বক প্রস্তরের খনি রহিয়াছে।

কোন কোন খনিজবস্তু আলোক শোষণ করিয়া পুনর্বিকিরণ করিতে পারে। ইহাকে অনুপ্রভা, phosphorescence বলে। ক্যালসাইট ও ফ্লুওরস্পারের এই ক্ষমতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জিঙ্কব্লেণ্ড, কুঞ্জাইট, উইলেমাইট এবং অধিকাংশ হীরকের এই গুণ আছে। এই সব পাথর প্রথমে খানিকক্ষণ তীব্র সৌর আলোক বা বৈদ্যুতিক আলোকে রাখিয়া অন্ধকারে আনিলে কিছুক্ষণ জ্যোতি বিকিরণ করিতে থাকে। জিঙ্কব্লেণ্ড দস্তা ও গন্ধকঘটিত পাথর, রঙ সাধারণতঃ বাদামী বা কালো। প্রাপ্তিস্থান ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ। জিঙ্কব্লেণ্ডে আঁচড় কাটিলেও দীপ্তি দেখা যায়। কুঞ্জাইট নামক যে বেগুনী রঙের পাথর আছে, উহা ম্যাডাগাস্কার ও ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহার রাসায়নিক উপাদান লিথিয়াম-এলুমিনিয়াম-সিলিকেট। রঞ্জন-রশ্মি, অতি বেগুনী-রশ্মি কিম্বা বৈদ্যুতিক আলো কিছুক্ষণ কুঞ্জাইট প্রস্তরের উপর প্রয়োগ করিয়া অন্ধকারে আনিলে কমলা রঙের অনুপ্রভা প্রকাশ পায়। এই পাথর রত্নরূপে ব্যবহৃত হয়। উইলেমাইট প্রস্তরের রাসায়নিক উপাদান দস্তা ও সিলিকা। ইহার বর্ণ সবুজাভ হলদে। প্রাপ্তিস্থান মধ্য-ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য। উইলেমাইটের উপর রঞ্জন-রশ্মি পড়িলে অন্ধকারে অনুপ্রভা দেখা যায়।

এখন কয়েক রকম রত্ন-প্রস্তরের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মণি হীরকের বিষয় লইয়া আরম্ভ হউক। কমল-হীরার উজ্জ্বলতা ও বর্ণচ্ছটা যুগে যুগে মানুষকে আকৃষ্ট ও মোহমুগ্ধ করিয়াছে। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর পদার্থ। অর্থাৎ ইহা সকল বস্তুর উপর আঁচড় কাটিতে পারে, কিন্তু উহার উপর কোন পদার্থের দাগ পড়ে না। স্বচ্ছ

বর্ণহীন, নীল, লাল, হলদে, বাদামী নানা রঙের হীরা দেখিতে পাওয়া যায়। হীরকের রাসায়নিক উপাদান বিশুদ্ধ দানাদার অঙ্গার, ইহার আলোকবক্রণ ক্ষমতা ২'৪২। প্রাপ্তিস্থান—প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা (৯৫%), তৎপরে ব্রেজিল, বোর্ণিও, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া। এখানে স্বর্ণের কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ সোনা স্ফটিক পাথরের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই প্রকার স্বর্ণময় স্ফটিক হইতেই সুবর্ণকণা পৃথক করা হয়। স্বর্ণ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল ও পীতাভ এবং সাধারণ সকল অবস্থায় অমলিন ও অবিনশ্বর। সেই জন্য এই ধাতুর এত মূল্য ও চাহিদা। সম আয়তন জল অপেক্ষা সোনা ১৯ গুণ ভারী। স্বর্ণ বিলক্ষণ ঘাতসহ। এক খণ্ড সুবর্ণ পিটাইয়া এক ইঞ্চির তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র পাতলা পাত প্রস্তুত করা যায়। খুব সম্ভবতঃ আদিম মানব ধাতুর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। মহেঞ্জোদড়ো হইতে পাঁচ হাজার বছর আগেকার স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ভারতে সুবর্ণের আকর আছে।

বৈদূর্য্য বলিয়া এক রকম পাথর আছে, গোল করিয়া কাটিলে উহাতে বিড়ালাক্ষির মত শ্বেত রেখা দেখা যায়। এই পাথর সচরাচর হলদে, সবুজ ও বাদামী রঙের হয়। ইহার রাসায়নিক উপাদান বেরিলিয়াম-এলুমিনিয়াম অক্সাইড; প্রাপ্তিস্থান—সিংহল, চীন, ব্রেজিল ও ইউরাল পর্ব্বত। আর এক জাতীয় বৈদূর্য্য আছে, উহার নাম আলেকজাণ্ড্রাইট। ইহার রঙ আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তনশীল, দিনের আলোতে দেখিলে সবুজ মনে হয়, কিন্তু কৃত্রিম আলোতে রক্তাভ বোধ হয়। চুনী ও নীলা কুরুবিন্দ জাতীয় প্রস্তর, উভয়ের রাসায়নিক উপাদান প্রধানতঃ এলুমিনিয়াম অক্সাইড। কোন কোন চুনী ও নীলা গোলপৃষ্ঠ করিয়া কাটিলে ছয়-রশ্মিযুক্ত এক তারকা দৃষ্ট হয়। এইরূপ রত্নকে তারা মানিক বা তারা নীলা বলে।

প্রাপ্তিস্থান—সিংহল, বর্ম্মা ও শ্যামদেশ।

টুরমালিন পাথর সিংহল, আফ্রিকা ও ব্রেজিলে পাওয়া যায়, স্বচ্ছ সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বিড়ালাক্ষ নানা রকম হয়। ইহার রাসায়নিক উপাদান যৌগিক বোবোসিলিকেট। ঘর্ষণ করিলে কিম্বা উত্তপ্ত করিলে টুরমালিন পাথরে বিলক্ষণ বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। ইহাব আলোক একমুখী করিবার ক্ষমতা অদ্ভুত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছেন, দুইখানি টুরমালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়; কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

ওপাল নামটি সংস্কৃত উপাল হইতে আসিয়াছে। ইহার উপাদান জল ও সিলিকা। সুদৃশ্য ওপালের বর্ণবৈচিত্র্য সত্যই সুন্দর। অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো ও জেকোশ্লোভেকিয়াতে ওপালের আকর আছে। আর এক রকম রঙীন পাথর আছে যাহার নাম ল্যাব্রাডোরাইট। প্রধানতঃ ল্যাব্রাডরে পাওয়া যায় বলিয়া এই নামের উৎপত্তি। ইহাব রাসায়নিক উপাদান সোডাযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট। দেখিতে ধূসর অথচ রামধনু রঙের। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করিলে এই পৃথিবীতে আরও অনেক আশ্চর্য্য বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা এই বিচিত্র ধরণীর কতটুকুই বা জানি।

উদ্ভিদের বৈচিত্র্য

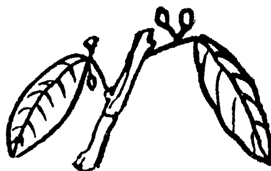
সাধারণ সকল উদ্ভিদ অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল, তাহারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। সব গাছই সবুজ পাতার সাহায্যে দিনের বেলায় সূর্য্যালোকের সহায়তায় বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কেবল কার্ব্বন বা কয়লা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং মাটি হইতে মূলের দ্বারা আনীত জল ও খনিজ-লবণ সহযোগে দেহ গঠন করে।

জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও বিস্তার ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে গাছপালার নিঃশব্দ জীবনক্রিয়া বড়ই বৈচিত্র্যহীন মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করিলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় এমন অদ্ভুত উদ্ভিদের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহাদের জীবন-ইতিহাস সত্যই খুব কৌতূহলোদ্দীপক।

উত্তর আমেরিকার তৃণক্ষেত্রে একপ্রকার আশ্চর্য্য গাছ জন্মায়। এই গাছের নীচের খাড়া পাতাগুলির ধার ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দিকে থাকে। পাতার উভয় পার্শ্ব পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী হওয়ায় সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যরশ্মি পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এই গাছের নাম দিগ্‌দর্শন বৃক্ষ compass plant। জনশূন্য প্রান্তরে পথহারা পথিক এই গাছের সাহায্যে অনেক সময় দিক নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

এদেশের বনচাঁড়াল গাছের, telegraph plantএর পাতার স্বতঃ-সঞ্চলন অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই গাছ ছায়াচ্ছন্ন পতিত জমিতে জন্মায়। ইহার প্রত্যেক পাতার গোড়ায় দুইটি ছোট ছোট পত্রক থাকে। গাছটির যখন বেশ সতেজ অবস্থা, তখন ঐ ক্ষুদ্র পত্রক দুইটি নিজে নিজেই উঠা-নামা করিতে থাকে। বনচাঁড়াল গাছের পাতার স্বয়ং-সঞ্চলন আর

প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্পন্দন, উভয়ের কতকটা সাদৃশ্য আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছেন—আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন স্বতঃস্পন্দনেরই একটি



স্বতঃস্পন্দনশীল বনচাড়াল

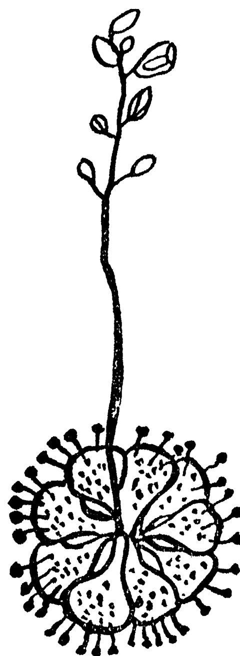
উদাহরণ। উদ্ভিদ জগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। বনচাঁড়ালের ছোট দুইটি পাতা আপনা-আপনি নড়িতে থাকে। আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে, যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই-ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়।

জোনাকীর আলো সকলেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা, ছত্রাক, কন্দ ও ঘাসকে বনে জঙ্গলে অন্ধকারে স্নিগ্ধ-শীতল আলোক বিকিরণ করিতে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে পচা গাছপালার উপর এক জাতীয় দীপ্তিমান ছত্রাক, agaricus উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছত্রাক কোন কোন সময় এত অধিক পরিমাণে আলোক প্রদান করে যে, তাহা কাগজের উপর ধরিলে ঐ আলোকে কাগজের লেখাও পড়িতে পারা যায়। এই জাতীয় ছত্রাক কয়েক রাত্রি এইরূপ উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়া যখন শুকাইতে আরম্ভ করে, তখন ইহার দীপ্তিও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত

হয়। জার্ম্মাণীতে কয়লার খনির অন্ধকার গহ্বরে এক প্রকার কন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কন্দ খনির অন্ধকারময় গর্ত্তে উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে। মাদ্রাজ প্রদেশের জঙ্গলে এক প্রকার গাছ হয়, ইহা cardiospermum গোষ্ঠীর অন্তর্গত। শুনা যায়, এই গাছ অন্ধকার রাত্রে নিকটবর্ত্তী স্থান আলোকিত করিয়া রাখে। শুষ্ক হইলে এই গাছ নিষ্প্রভ হইয়া যায়; কিন্তু ভিজা কাপড় ইহার উপব অল্পকাল চাপাইয়া রাখিলেই ইহার দীপ্তি পুনর্ব্বার সুস্পষ্ট হয়। কখনও কখনও গাছের রস হইতেও আলোক বিকিরণ হইতে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় গাছ আছে, উহাব নাম cipo de cunanam. অন্ধকারে এই গাছেব গুঁড়িতে আঘাত কবিলে আহত স্থান হইতে উজ্জ্বল আলোক নিঃসারিত হইতে থাকে। পাঞ্জাব অঞ্চলে পাহাড় প্রদেশে বর্ষাকালে এক জাতীয় ঘাস জন্মে; তাহারও দীপ্তিবিকিবণের শক্তি আছে। সিংভূমের জঙ্গলে এক রকম লতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারও জ্যোতি বিকিরণের ক্ষমতা আছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—এই সকল আলোকবিকিরণকারী উদ্ভিদকে অক্সিজেন বাষ্পের মধ্যে রাখিলে ইহাদের আলোকের ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এজন্য অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে কোন রকম সহজদাহ্য উদ্ভিদ রসের বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগের সময়, মৃদু আলোক উৎপন্ন হয়।

কোন কোন গাছের পতঙ্গ শিকার প্রকৃতই আশ্চর্য্যজনক। এখন উহাদের কথা বিবৃত হইতেছে। রাঁচিতে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে, গিরিডি হইতে পরেশনাথ যাইবার রাস্তার পাশে এবং বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার আর্দ্র অঞ্চলে এক রকম তারার মত লাল রঙের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চলতি ভাষায় ইহাকে পানের পিক বলে, ইংরাজী নাম drosera। এই গাছের ঈষৎ সবুজ পাতার উপর বহুসংখ্যক রক্ত বর্ণের শুঁয়া সংযুক্ত থাকে।

প্রত্যেক শুঁয়ার আগায় রসের মত এক প্রকার চটচটে বস্তু হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ ঐ রসবিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যেমন উহার উপর অবতরণ করে অমনি আটকাইয়া যায়। মুক্তি পাইবার আশায় তাহারা যত



পোকাখেগো পানের-পিক

ছটফট করে গাছের পাতা ও শুঁয়াগুলি তাহাতে তত উত্তেজিত হইয়া আরও বাঁকিয়া ধরে। কিছুক্ষণ পরে পতঙ্গটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে গাছের পাচক রস উহার সারাংশ জীর্ণ করিয়া ফেলে। পরীক্ষার জন্য এই উদ্ভিদের পাতার উপর মাংসের টুকরা, ডিমের শ্বেতাংশ স্থাপন করিলে তাহাও জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কাগজ, কয়লা বা কাঁচ রাখিলে কোন প্রতিক্রিয়া

দেখা যায় না। আমাদের দেশে খাল, বিল ও পুকুরের জলে একরকম পোকাখেকো ঝাঁজি, bladderwort পাওয়া যায়। ইহাদের পাতায় ছোট ছোট থলি লাগান থাকে। থলির মুখে দরজা থাকে, উহা ঠেলিলে কেবল ভিতর দিকেই খোলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীটাণু অসতর্ক হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না, অবিলম্বে উদ্ভিদ গাত্র হইতে প্রচুর জারক-রস নির্গত হইয়া হতভাগ্য কীটকে হজম করিয়া ফেলে। কলসী গাছ, pitcher plant বলিয়া আর এক



পতঙ্গভুক কলসী গাছ

প্রকার কীটভুক উদ্ভিদ আছে। ইহাদের কতক পাতা কলসীর মত আকৃতিবিশিষ্ট, উপরে ঢাকনার মত আবরণও আছে। কলসীর মুখে সুমিষ্ট রস থাকে, অভ্যন্তরও তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। পতঙ্গাদি মধুর লোভে পড়িয়া ক্রমশঃ ভিতরে গিয়া নিমজ্জিত হয়। তখন উহাদের শরীর পরিপাক

করিয়া গাছটি নিজের পুষ্টিসাধন করে। উত্তর আমেরিকায় মক্ষিকা-পাশ, Venus's fly-trap নামে এক শ্রেণীর জীবভক্ষক গাছ জন্মায়। ইহাদের প্রত্যেকটি পাতা মুখের মত দুই ভাগে বিভক্ত, উভয় পার্শ্বেই দাঁতের মত শুঁয়া থাকে। কোন মক্ষিকা আসিয়া মাঝখানে বসিলেই সঙ্গে সঙ্গে পাতাটি দুই দিক হইতে বন্ধ হইয়া পতঙ্গটিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ডারউইনের মতে ইহারাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর গাছ।



স্পর্শকাতর লজ্জাবতী

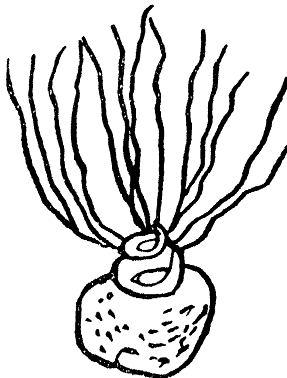
লজ্জাবতী লতা, sensitive plant সকলেই দেখিয়াছেন। এই

গাছের আগমন আমেরিকা হইতে হইয়াছে। ইহাকে স্পর্শ করিলে বা নাড়া দিলে ক্ষুদ্র পত্রকগুলি মুদ্রিত হইয়া যায়। রাত্রিকালে লজ্জাবতীর পাতাগুলি বুজিয়া থাকে, যেন গাছটি ঘুমাইতেছে। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন —মানুষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে— যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহা ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। প্রতি পত্রমূলের নীচের দিকে উদ্ভিদপেশী অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের মাংসপেশী আহত হইলে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকের উদ্ভিদপেশীও আঘাতে সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটি পড়িয়া যায়। আঘাত-জনিত আকস্মিক সঙ্কোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটি আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। সকল গাছেরই অনুভবশক্তি আছে। যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে। অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র অসাড় হইয়া যায়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়।

শেষে সচল গাছের বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক প্রকার সূত্রসংযুক্ত সবুজ অতি ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ আছে, উহার নাম euglena। শরীর সংলগ্ন ঐ সূত্র নাড়িয়া ইহারা জলে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের আহার প্রণালী দুই প্রকার। প্রথমতঃ ইহারা মুখ দিয়া খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া দেহস্থ সবুজ কণার, chlorophyll-এর সাহায্যে অন্যান্য উদ্ভিদের মতই ইহারা সূর্য্যকিরণে জলমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে শরীর গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করে। আর এক জাতীয় হরিৎবর্ণ জলজ শৈবালের, filamentous algæ-র বিষয় জানা যায়। ইহারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে জলমধ্যে

ঘুরিয়া বেড়ায়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ফার্ণের বীজকোষকে প্রাণীর মতই চঞ্চল দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর বৃহত্তম জীব কালিফোর্ণিয়ার এক রকম বড় গাছ। এই বিশাল বৃক্ষ তিনশত ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং প্রায়



ফার্ণের সচল বীজকোষ—বর্দ্ধিতাকার

ত্রিশ ফুট অবধি চওড়া হয়। বৃহত্তম জলজন্তু তিমির আয়তন ইহার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস কালিফোর্ণিয়াস্থ বিশাল বৃক্ষের আয়ু চার হাজার বৎসরের কম নয়। সাধারণ গাছের বীজ সুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন পর্য্যন্ত সজীব থাকিতে পারে। অধিকাংশ বৃক্ষবীজের প্রাণশক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। গমের বীজ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পঁচিশ বছরের বেশী জীবন্ত থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার একশত কুড়ি হইতে চারশত বছরের পুরান পীট নামক অর্দ্ধ-কয়লা স্তরে পদ্ম জাতীয় যে গাছের বীজ পাওয়া যায়, সেই বীজ কমপক্ষে শত বৎসর পরে ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে অঙ্কুরিত হয়।

রত্নতত্ত্ব

যে বস্তু উজ্জ্বল, সুন্দর ও কঠিন অথচ দুষ্প্রাপ্য, তাহাই রত্ন বলিয়া পবিগণিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যে রত্নধারণেব প্রথা চলিয়া আসিতেছে। রত্নধারণের প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি-প্রকাশ; ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে—বহু লোকের বিশ্বাস, নির্দ্দিষ্ট রত্ন ধারণ করিলে ভাগ্য পরিবর্ত্তন ও রোগ নিরাময় হয়, কিন্তু এইরূপ সংস্কাবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। বোধ হয়, রত্নধারকের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ও বিশ্বাসই তাহার শুভাশুভ ফললাভের সম্ভাবনা ঘটায়। রত্নেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ হীরক, চুনী, নীলা, পান্না ও ওপাল, আর সবই উপবত্ন। অধিকাংশ রত্ন আগ্নেয় শিলায়, igneous rock-এ দানাদার, crystalline অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহার পর হয় সেই স্থানেই থাকে, কিংবা কালক্রমে ঝড়-বৃষ্টি, শীত ও সূর্য্যতাপের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। কোন মণিরত্ন পরীক্ষা করিতে হইলে উহার কাঠিন্য, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আলোকবক্রণ ক্ষমতা জানা বিশেষ আবশ্যক।

কাঠিন্য

পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিলে যে বস্তুর উপর আগে আঁচড় পড়ে, তাহার কাঠিন্য কম এবং অন্যটির বেশী বলা হয়। যেমন হীরক কঠিনতম রত্ন, উহা সকল বস্তুর উপর দাগ কাটিতে পারে, কিন্তু উহার উপর কোন পদার্থের দাগ পড়ে না। অন্য দিকে ট্যাল্ক বা খটী এত নরম যে, সমস্ত খনিজ দ্রব্য উহাকে চিহ্নিত করে। পদার্থের কঠোরতার এই প্রকার এক মান আছে:—ট্যাল্ক ১, জিপসাম ২, আঙ্গুলের নখ ২·৫, তামার পয়সা ৩,

ফ্লুওরস্পার ৪, লোহার পেরেক ৪'৫, অ্যাপেটাইট ৫, ছুরির ফলা ও জানালার কাঁচ ৫'৫, ফেলস্পার ও ইস্পাতের উকো ৬, স্ফটিক ৭, পোখরাজ ৮, কুরুবিন্দ ৯, হীরা ১০। কোন রত্নের কঠিনতা জানিতে হইলে প্রথমে একখণ্ড স্ফটিকের উপর উহার কোন ধার চাপিয়া টানিতে হয়, যদি ঐ স্ফটিকের উপর আঁচড় পড়ে, তাহা হইলে রত্নের কাঠিন্য ৭-এর উপরে। অতঃপর ঐ রত্নটি একটি পোখরাজের উপর ঐরূপে ঘর্ষণ করিতে হয়, যদি পোখরাজে কোন দাগ না পড়ে, তাহা হইলে রত্নের কঠিনতা ৭ ও ৮-এর মধ্যে, কিন্তু পোখরাজ চিহ্নিত হইলে উহার কাঠিন্য হইবে ৮-এর উপর।

আপেক্ষিক গুরুত্ব

আপেক্ষিক গুরুত্ব পরীক্ষা রত্ন নির্ণয়ের আর এক উপায়। কোন বস্তু সমান আয়তন জল অপেক্ষা যতগুণ ভারি, তাহার অপেক্ষিক গুরুত্ব তত সংখ্যা। এক ঘন ইঞ্চি স্বর্ণ এক ঘন ইঞ্চি জল অপেক্ষা ১৯ গুণ ভারি, সুতরাং স্বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব, specific gravity ১৯। নির্দিষ্ট ঘন তরল দ্রবণের মধ্যে স্থাপন করিয়া মূল্যবান মণিরত্নের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। কোন স্বচ্ছ হলদে পাথর পোখরাজ না সোনালী স্ফটিক, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইলে ঐ বস্তুটি এমন এক তরল দ্রবণের মধ্যে নিক্ষেপ করা উচিত, যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্ব হইতেই ৩ করা আছে। যদি এই দ্রবণের মধ্যে ঐ প্রস্তর নিমজ্জিত হয়, তবে উহা আসল পোখরাজ, কারণ আমাদের জানা আছে, পোখরাজ অপেক্ষাকৃত ভারী এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫, কিন্তু সোনালী স্ফটিক হইলে ঐ দ্রবণে ভাসিতে থাকিবে, কারণ উহা ২'৬৫ আপেক্ষিক গুরুত্বসম্পন্ন হাল্কা পাথর। রত্ন ও তরল বস্তু উভয়ের ঘনত্ব সমান হইলে ঐ রত্ন মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করে। মূল্যবান প্রস্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য থ্যালিয়াম-

সিলভার-নাইট্রেট নামক ঘন বস্তু ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অবস্থায় ইহা নিরেট কিন্তু ঈষদুষ্ণ করিলে তরল হইয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫। ইহা জলে দ্রবণীয়।

আলোকবক্রণ

আলোক-রশ্মি তির্য্যকভাবে এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে যাইবার সময় ঈষৎ বক্রীভূত, refracted হয়। কাঁচ, মণিরত্ন প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্তুর আলোকবক্রণক্ষমতা, refractive index হইতে উহার স্বরূপ বেশ বোঝা যায়। আলোকবক্রণ ক্ষমতা Refractometer নামক যন্ত্রের সাহায্যে স্থির করা হয়। যে বস্তুর আলোকবক্রণশক্তি যত অধিক, তাহার উজ্জ্বলতাও তত বেশী। অধিকাংশ মণিরত্নের অলোকবক্রণ দ্বিবিধ, কেবল হীরা, সৌগন্ধিক, তামড়ি, ওপাল ও কাঁচের আলোকবক্রণ একবিধ। প্রস্তর পরীক্ষার সময় এই কথা স্মরণ রাখা উচিত। গোমেদ ও রুটাইলের দ্বৈত আলোকবক্রণ এত বেশী যে, আলোর সামনে ধরিয়া সাধারণ × ১০ শক্তিবিশিষ্ট বিবর্দ্ধক কাচের, magnifying glass-এর সাহায্যে দেখিলে পিছনের পলের প্রত্যেকটি সীমারেখা দুইটি বলিয়া মনে হয়।

ওজন

সমস্ত মণিরত্নের ওজন ক্যারাটে প্রকাশ করা হয়, এক ক্যারাট = ৩·১৭ গ্রেণ। এদেশে রতি হিসাবে রত্নের ওজন বলা হয়। এক রতি এক কুঁচফলের সমান।

হীরক

(Diamond)

হীরক সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মূল্যবান মণি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট ইহা বিশুদ্ধ দানাদার অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ণহীন সাদা, হলদে,

নীলাভ, রক্তাভ, সবুজ নানা রঙের হীরক পাওয়া যায়। হীরক কঠিনতম রত্ন—কঠোরতা ১০। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫ এবং আলোকবক্রণ ক্ষমতা ২.৪। মসৃণ কর্ত্তিত হীরার উপর আলো পড়িলে রামধনুর মত বিভিন্ন বর্ণ বিকীর্ণ হয়। হীরক ঘর্ষণ করিলে উহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সূর্য্যালোকে কিম্বা বৈদ্যুতিক আলোকে কিছুক্ষণ হীরক রাখিয়া অন্ধকারে লইয়া গেলে উহা হইতে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়। হীরক তাপের উত্তম পরিচালক, সেজন্য স্পর্শ করিলে কাঁচ ও নকল মণি অপেক্ষা শীতল বোধ হয়। অগ্নিসংযোগে হীরক কয়লার মত পুড়িয়া যায়, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোন তীব্র অম্ল বা ক্ষারের সংস্পর্শে ইহাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না, ইহা সম্পূর্ণরূপে অদ্রবণীয়। রঞ্জনরশ্মি অবাধে হীরকের ভিতব দিয়া গমন করে, সেজন্য কোন ছায়া পড়ে না, কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে নকল হীরার ছায়া দেখা যায়। সুতরাং এক্স-রে দ্বাবা হীরক পবীক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, ব্রেজিল এবং অষ্ট্রেলিয়াতে হীরকের আকর আছে।

কোহিনুব (ওজন ১০৬ ক্যারাট), গ্রেট মোগল (২৪০ ক্যারাট), নীল হোপ (৪৪ ক্যারাট) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হীরক দক্ষিণ ভারত হইতেই হস্তান্তরিত হইয়া ইউরোপে পৌঁছিয়াছে। ১৯০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক কুলিনান পাওয়া যায়। অকর্ত্তিত অবস্থায় ইহার ওজন ছিল প্রায় আধ সের।

১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের রাসায়নিক ময়সান প্রচণ্ড উত্তাপে লৌহের সহিত অঙ্গার গলাইয়া কৃত্রিম হীরক উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক কণিকা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য বড় হীরা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই।

হীরার দ্বারাই হীরা কাটা এবং মসৃণ করা সম্ভব। বেলজিয়ামের অধিবাসী লুই বারগুয়েন পঞ্চদশ শতাব্দীতে হীরক কর্ত্তন ও মসৃণ করিবার

প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন ভারতে দশম শতাব্দী হইতেই হীরা কাটার প্রণালী জানা ছিল। বর্ত্তমান কালে Amsterdam ও Antwerp হীরা কাটার জন্য বিখ্যাত। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হীরা প্রধানতঃ অঙ্গুরীয় অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। দাগী হীরা এবং কাল হীরা পাথর এবং কাঁচ কাটিবার যন্ত্রে লাগান হয়।

চুনী ও নীলা

(Ruby & Sapphire)

চুনী ও নীলা উভয়েই কুরুবিন্দ জাতীয় প্রস্তর, এই দুই মণিরই রাসায়নিক উপাদান অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড। চুনীতে সামান্য ক্রোমিয়াম থাকে বলিয়া লাল, নীলাতে ঈষৎ লৌহ ও টাইটেনিয়াম থাকায় উহা নীল। স্বচ্ছ, সবুজ ও হলদে রঙের কুরুবিন্দ কখনও কখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ বিরল। মূল্যবান প্রস্তরের মধ্যে হীরার পরেই চুনীর স্থান। চুনীর কাঠিন্য ৯, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪ এবং আলোকবক্রণ ক্ষমতা ১·৭৬। গোল করিয়া কাটিলে কোন কোন চুনী ও নীলায় ছয় রশ্মিযুক্ত তারা দেখা যায়। নীলা চুনী অপেক্ষা কঠিন, কিন্তু আর সব গুণে উহার সমান। চুনী ও নীলা সিংহল, বর্ম্মা ও শ্যাম দেশে পাওয়া যায়, কাশ্মীরে নীলার খনি আছে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভার্নিউইল ১৯০৪ সালে উচ্চ তাপে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গলাইয়া কৃত্রিম চুনী নীলা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। এই সকল কৃত্রিম কুরুবিন্দ মণির বর্ণ, উজ্জ্বলতা, কাঠিন্য ও গুরুত্ব সবই স্বাভাবিক রত্নের সমান, কেবল প্রভেদ এই—মাইক্রসকোপের নীচে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ ও বক্র রেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দর্শশক্তির বিবর্দ্ধক কাচ দিয়া দেখিলেও এই সব সূক্ষ্ম রেখা দেখা যায় আজকাল বিভিন্ন বর্ণের কৃত্রিম কুরুবিন্দ মণির যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে।

পান্না

(Emerald)

পান্নার রাসায়নিক উপাদান বেরিলিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, উহার সহিত ক্রোমিয়াম থাকায় রঙ স্নিগ্ধ সবুজ। পান্নার কাঠিন্য ৭'৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৭ এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৫৭। দক্ষিণ আমেরিকার পান্নাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এদেশে রাজপুতানা ও মান্দ্রাজে পান্নার খনি আছে।

ওপাল

(Opal)

সুদৃশ্য ওপাল নীলাভ সাদা কিম্বা রামধনু রঙের হয়, ইহার উপাদান জলযুক্ত সিলিকা। ওপাল খুব নরম ও হাল্কা পাথর, ইহার কাঠিন্য ৫'৫ হইতে ৬'৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ২'২, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৪৫। অষ্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোতেই ভাল ওপাল পাওয়া যায়। কালো ও কমলা রঙের ওপালই বেশী দামী।

পোখরাজ

(Topaz)

পোখরাজ স্বাচ্ছ সাদা, হলদে ও সবুজ রঙের হয়। উপাদান অ্যালুমিনিয়াম-ফ্লুওসিলিকেট। কাঠিন্য ৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৬২। হলদে পোখরাজ উত্তপ্ত করিলে স্থায়িভাবে গোলাপী হইয়া যায়। সিংহল, বর্মা, রাশিয়া ও ব্রেজিলে পোখরাজ পাওয়া যায়।

গোমেদ

(Zircon)

উজ্জ্বলতায় হীরার পরেই ইহার স্থান। স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সবুজ, হলদে, কমলা নানা বর্ণের গোমেদ হয়। উপাদান জারকোনিয়াম সিলিকেট।

এই মণির আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাধিক, প্রায় ৪'৭, কাঠিন্য ৭'৫ এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৯৫। প্রাপ্তিস্থান—সিংহল, বর্মা, ইন্দোচীন, ব্রেজিল ও ফ্রান্স।

বৈদূর্য

(Cat's Eye)

পীতাভ, সবুজ বা ধূসের বর্ণের প্রস্তর, মসৃণ গোলপৃষ্ঠ করিয়া কাটিলে উহাতে বিড়াল অক্ষির মত উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। উপাদান বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। কাঠিন্য ৮'৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৭ এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৭৫। সিংহলে, ম্যাডাগাস্কার ও ইউরাল পর্ব্বতে বৈদূর্য পাওয়া যায়। এসবেস্টেসযুক্ত এক প্রকার স্ফটিক কখনও কখনও বিড়ালাক্ষ নামে চলে, কিন্তু উহা প্রকৃত বৈদূর্য অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। আর এক রকম বৈদূর্য্য আছে, উহার নাম আলেকজাণ্ড্রাইট, alex-andrite। ইহা দিবালোকে সবুজ আর কৃত্রিম আলোকে রক্তাভ বোধ হয়। এই পাথর ইউরাল পর্ব্বত ও তাসমানিয়ায় পাওয়া যায়। ইহার রাসায়নিক উপাদান বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ক্রোমিয়াম অক্সাইড। কঠোরতা ৮'৫ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৬৫ আর আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৭৫।

সৌগন্ধিক

(Spinel)

লাল, নীল, সবুজ, বাদামী, নানা রঙের সৌগন্ধিক হয়। উপাদান ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, কাঠিন্য ৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৬, এবং আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১'৭। এই প্রস্তর সিংহল, বর্মা ও শ্যাম দেশে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণের সৌগন্ধিক অনেক সময় চুনী বলিয়া মনে হয়।

তামড়ি

(Garnet)

উজ্জ্বল লাল, সবুজ, হলদে নানা প্রকার তামড়ি হয়, উপাদান চুণ-লৌহ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, কাঠিন্য ৬.৫ হইতে ৭.৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৪ হইতে ৪.৩, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১.৭৪ হইতে ১.৯৪। প্রাপ্তিস্থান—রাজপুতানা, সিংহল ও বোহেমিয়া। এদেশে অনেকে তামড়িকে গোমেদ বলিয়া ভুল করেন, গোমেদ অধিকতর উজ্জ্বল।

স্ফটিক

(Quartz)

বিশুদ্ধ স্ফটিক স্বচ্ছ দানাদার সিলিকা। উহার সহিত লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, টাইটেনিয়াম থাকিলে যথাক্রমে হলদে রঙের সোনেলা, বেগুনী রঙের জামীরা বা রাজাবর্ত্ত, amethyst ও লাল রঙের rose quartz হয়। স্ফটিকের কাঠিন্য ৭, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১.৫৫। আকর—পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, বর্মা, ব্রেজিল। ইহার মধ্য দিয়া অবাধে অতি-বেগুনী রশ্মি যাতায়াত করে, সেজন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ব্যবহার আছে। চশমার পরকলা কাঁচের হইলে সহজেই দাগ পড়ে, কিন্তু স্ফটিক নির্ম্মিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত মসৃণ থাকে। স্ফটিক কম-দামী পাথর, সুন্দর হইলে সস্তা রত্নরূপে চলে।

অকীক

(Agate)

উপাদান অস্পষ্ট দানাদার সিলিকা। এই জাতীয় প্রস্তর লাল, নীল, বাদামী, কাল, সাদা, রেখাময়, স্তরযুক্ত নানা রকমের হয়। রঙীন রেখার স্তর অনুযায়ী agate, onyx, sardonyx প্রভৃতি নাম হয়। প্রায় স্বচ্ছ

রক্তাভ হইলে রুধিরাখ্য, cornelian নামে চলে। গুজরাট, আরব, জার্মাণী ও স্কটল্যাণ্ডে প্রচুর অকীক পাওয়া যায়।

পুস্তিকা

(Peridot)

স্বচ্ছ সবুজ রঙের পাথর। উপাদান লৌহ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। কাঠিন্য ৬·৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫, আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ১·৬৮। প্রাপ্তিস্থান—ভারত, বর্মা, ব্রেজিল ও ইজিপ্ট।

চন্দ্রকান্ত মণি ও সূর্য্যকান্ত মণি

(Moon Stone & Sun Stone)

চন্দ্রকান্ত মণি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর। উপাদান পোটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, কাঠিন্য ৬, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৫৭। সূর্য্যকান্ত মণি লাল আভাযুক্ত উজ্জ্বল পাথর, উপাদান চূণ-সোডা-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, উহার সহিত লৌহ অক্সাইডের কণা মিশ্রিত থাকায় সোনার মত চক্ চক্ করে। অন্যান্য গুণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার। উভয়ের প্রাপ্তিস্থান—বর্মা, সিংহল, নরওয়ে, সুইজারলাণ্ড ও সাইবিরিয়া।

যশম

(Jade)

ধূসর সবুজ রঙের অর্দ্ধস্বচ্ছ পাথর, উপাদান সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। কাঠিন্য ৬·৫ হইতে ৭ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৩। আকর—বর্মা, চীন, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো।

টুর্মালিন

(Tourmaline)

বর্ণহীন, লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বিড়ালাক্ষ নানারকম হয়। উপাদান বিবিধ বোরোসিলিকেট। কঠোরতা ৭, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩ এবং আলোক-

বক্রণ ক্ষমতা ১'৬৩। প্রাপ্তিস্থান সিংহল, আফ্রিকা ও ব্রেজিল। এই প্রস্তরের আলোক একমুখী, polarise করিবার শক্তি অদ্ভুত।

রুটাইল

(Rutile)

আকরিক অবস্থায় গাঢ় লাল বা বাদামী। প্রাপ্তিস্থান ইউরাল পর্ব্বত, ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনেভিয়া, আমেরিকা। কৃত্রিম রুটাইল উজ্জ্বল স্বচ্ছ যে কোন রঙের হইতে পারে। ইহার আলোক-বক্রণ ক্ষমতা ২'৬ হইতে ২'৯, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪'২৫ কিন্তু কঠোরতা কম, প্রায় ৬। কৃত্রিম রুটাইল খুব উজ্জ্বল অথচ সস্তা বলিয়া হীরকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

ফিরোজা

(Turquoise)

সাধারণতঃ অস্বচ্ছ, বর্ণ নীলাভ সবুজ, উপাদান জল ও তামাসংযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট। কাঠিন্য ৬, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৭। ঈজিপ্ট, পারস্য, রাশিয়া ও আমেরিকাতে পাওয়া যায়। কিছুদিন ব্যবহারের পর কোন কোন ফিরোজার বর্ণ বিকৃত হয়। সোডাযুক্ত জলে নিমজ্জিত রাখিলে উহার পূর্ব্ববর্ণ ফিরিয়া আসে।

নীলোপল

(Lapis Lazuli)

ইহা গাঢ় নীল রঙের অস্বচ্ছ প্রস্তর। উপাদান গন্ধকযুক্ত সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। কাঠিন্য ৫'৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৮। পূর্ব্বে শিল্পিগণ এই পাথর চূর্ণ করিয়া ultra-marine নামক নীল রঙ প্রস্তুত করিতেন। প্রাপ্তিস্থান—পারস্য, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়া।

মুক্তা ও প্রবাল

(Pearl & Coral)

মুক্তা ও প্রবাল রত্ন হইলেও জৈব পদার্থ, খনিজ নয়। উভয় বস্তুই সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাংশ এবং উভয়েরই উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা খড়ী। একজাতীয় সামুদ্রিক ঝিনুকের অভ্যন্তরে উহার দেহ নিঃসৃত রস কোন পদার্থকণার চতুঃপার্শ্বে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া গোলাকার মুক্তায় পরিণত হয়। মুক্তা সচরাচর সাদা, কাল ও লাল রঙের হয়। মুক্তার বিভিন্ন স্তরে আলোকের অসম বাধাপ্রাপ্তির, interference-এর ফলে সুন্দর বর্ণবিন্যাস পরিদৃষ্ট হয়। সিংহল, পারস্য মেক্সিকো ও অষ্ট্রেলিয়াব নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মুক্তাবাহী ঝিনুক পাওয়া যায়। প্রবাল একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের পঞ্জর। নীল, সবুজ, হলদে কমলা, লাল, সাদা নানা বর্ণেব প্রবাল দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর প্রবালের জন্মভূমি। উভয়ের কঠোবতা ৩·৫, আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৬।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Encyclopaedia Britannica : Gems.
2. Rutley's Mineralogy.
3. Indian Precious Stones by L. N. Iyer, Ph. D.
4. ভারতের খনিজ—রাজশেখর বসু
5. Gems & Gem Materials by Kraus & Slawson
6. Gem Testing by Anderson

নর ও নারী

পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার অর্দ্ধেক পুরুষ এবং প্রায় অর্দ্ধেক নারী। সেজন্য নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক বৈষম্যের তুলনামূলক নিরপেক্ষ আলোচনার কতকটা প্রয়োজন আছে। এই বিষয় সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর সমাজ-সংস্থাপন ও গার্হস্থ্য-গঠন বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। এই প্রবন্ধে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে। দেখা যাক, নরনারীর পার্থক্য কত দূর বংশানুক্রমিক ও জন্মগত এবং কতখানি স্বোপার্জ্জিত ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাবসঞ্জাত।

দৈহিক গঠন

একখানি অট্টালিকা যেমন বহুসংখ্যক ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ মানুষের শরীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বা cell লইয়া গঠিত। মাইক্রস-কোপের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রাত দেহকোষে বিভাজনের সময় ৪৮টি সূত্রাকার পদার্থ পাওয়া যায়, উহারাই বংশবাহক ক্রোমোসোম্, chromosome। মানব-মানবীর প্রতি শরীর-কোষে পুরুষত্ব বা নারীত্বের ছাপ আছে। পুরুষের প্রত্যেক দেহকোষে বিশষত্ব-নির্দ্দেশক x ও y ক্রোমোসোম থাকে আর স্ত্রীলোকের শরীর-কোষে বিশিষ্টতাব্যঞ্জক দুইটি x ক্রোমোসোম থাকে। অবশিষ্ট ৪৬টি ক্রোমোসোম উভয়ের সমান। পিতার নিকট হইতে y ক্রোমোসোম এবং মাতার নিকট হইতে x ক্রোমোসোম প্রাপ্ত হইলে পুত্রসন্তান জন্মায় আর পিতার নিকট হইতেও x ক্রোমোসোম এবং মাতার নিকট হইতে x ক্রোমোসোম পাইলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শিশুর বংশানুক্রমিক যৌন-পার্থক্য গর্ভস্থ অবস্থায় তৃতীয় মাসেই

পরিস্ফুট হয়, কিন্তু এই প্রভেদ জন্মের পরেই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সদ্যজাত ছেলে-শিশুর ওজন ও উচ্চতা মেয়ে-শিশু অপেক্ষা সামান্য বেশী হইয়া থাকে —নবজাত ছেলের দৈর্ঘ্য প্রায় এক-দশমাংশ ইঞ্চি আর ওজন প্রায় আধ পাউণ্ড অধিক হয়। মেয়েরা কেবল বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ ঐ বয়সের ছেলেদের চেয়ে লম্বা ও ভারী হয়। পনর বৎসর হইতে ছেলেরা আবার ওজন-উচ্চতায় অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। সাধারণতঃ মেয়েদের যৌবনারম্ভ হয় তের-চৌদ্দ বৎসরে আর ছেলেদের যৌবনাগমন হয় চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে। এই সময় উভয়ের দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে বিশেষ প্রকার রাসায়নিক রস বা হর্মোন নির্গত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া নারীত্ব-নির্ণায়ক বা পুরুষত্ব-প্রকাশক যৌবনশ্রী আনয়ন করে। এই কালে বংশ-বিস্তারের জন্য পুরুষের শরীরে বীজকোষ এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয়। এই বয়সে মেয়েদের 'মাসিক ধর্ম্ম' আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী হয়।

স্ত্রীলোকের শরীর ২৫ বৎসরে পূর্ণগঠিত হয়, পুরুষের দেহ ২৭ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ২০ বৎসরের পর মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি আর ঘটে না, কারণ ইহার পূর্ব্বে বা অল্পকাল পরে তাহাদের জায়া ও জননী হইতে হয়। পূর্ণবয়স্ক যুবকের শরীর পূর্ণবয়স্কা যুবতীর দেহ অপেক্ষা আকারে বড়, ওজনে ভারী। পুরুষের দেহ কঠিন পেশীবহুল, নারীর শরীর কোমল ও মেদবহুল। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ ইঞ্চি ছোট হয়। নারীর ওজন পুরুষের ওজন অপেক্ষা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কম। নারীর বস্তিপ্রদেশ, pelvis পুরুষের তুলনায় চওড়া। স্ত্রীলোকের উরুর পরিধি পুরুষের উরুর বেষ্টনী অপেক্ষা গড়ে প্রায় এক ইঞ্চি বেশী। নারীর পঞ্জরাস্থি অধিকতর বক্র।

মেয়েদের মাথায় চুলের গোড়া শক্ত, সেজন্য সচরাচর টাক পড়ে না।

মস্তকে কেশহীনতা ব্যাধিটি পুরুষমানুষের একচেটিয়া। তবে গণ্ড ও ওষ্ঠের উপরে কেশোদ্গম পুরুষেরই হইয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চলন

যে জীব যত বড় ও ভারী তাহার হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া তত ধীরে। যেমন, বৃহত্তম স্থলজন্তু হস্তীর হৃদ্‌যন্ত্র মিনিটে মাত্র ২৮ বার স্পন্দিত হয়, কিন্তু অশ্বের হৃৎপিণ্ড ৪২ বার স্পন্দিত হয়। সেইরূপ অপেক্ষাকৃত গুরুভার পুরুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার কম্পিত হয় আর ক্ষুদ্রকায়া স্ত্রীলোকের নাড়ীর গতি মিনিটে প্রায় ৮০ বার। নরশোণিতে শতকরা ১০ ভাগ অধিক রক্তকণিকা থাকায় উহা অধিকতর গাঢ় এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫৮। নারী-রক্তে জলীয় ভাগ বেশী বলিয়া উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম—প্রায় ১০৫৫। নারীর রক্তচাপ গড়ে পুরুষের রক্তচাপ অপেক্ষা ৫ হইতে ১০ মিলিমিটার কম থাকে। পুরুষ মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ বেশী পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের ভিতরে সেইরূপ নিম্ন রক্তচাপের আধিক্য দেখা যায়।

শ্বাসক্রিয়া ও স্বরযন্ত্র

পুরুষমানুষ মিনিটে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে, স্ত্রীলোকের শ্বাসের গতি ইহা অপেক্ষা সামান্য বেশী। সাধারণতঃ নাড়ীর বেগ নিঃশ্বাসের তুলনায় চার গুণ দ্রুত। নারীর ফুস্‌ফুসের বায়ুধারণ ক্ষমতা অনেক কম। একজন স্ত্রীলোক যেখানে মাত্র ১৩২ ঘন ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ করিতে সক্ষম, সেখানে পুরুষ মানুষ ২১৭ ঘন ইঞ্চি বায়ু ধারণ করিতে পারে। মানুষ ও জীবজন্তু প্রশ্বাসের সহিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহাভ্যন্তর্গত খাদ্যবস্তু দগ্ধ করে এবং নিঃশ্বাসের সহিত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। ইহাই জীবনক্রিয়া। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কম খাদ্য গ্রহণ করে। মেয়েদের ও ছেলেদের কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিষ্কাশনের হার

যথাক্রমে ১০০ : ১৪০। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়—মেয়েদের সাধারণ দেহক্রিয়া, general metabolism মন্থর। শরীরক্রিয়া ধীরে ধীরে হইলে দেহতাপ কম হইবার কথা, সেজন্য অনেকের সিদ্ধান্ত—নারীর শারীরিক উত্তাপ সামান্য কম। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট মতভেদ আছে।

রমণীর কণ্ঠস্বর সরু ও মৃদু, পুরুষের গলার শব্দ মোটা ও ভারী। পুরুষ-কণ্ঠে সেকেণ্ডে ১৯০ বার হইতে ৬৭৮ পর্য্যন্ত কম্পন উৎপন্ন হয়। নারী-স্বরযন্ত্রে সেকেণ্ডে ৫৭২ হইতে ১৬০০ বার পর্য্যন্ত কম্পন উত্থিত হয়। মেয়েদের মধ্যে তোতলামি খুব কম, তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত। শৈশবে মেয়েরা ছেলেদের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কথা বলিতে আরম্ভ করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়

সাধারণ দৃষ্টিশক্তি নারী পুরুষ উভয়ের প্রায় সমান, কিন্তু নারীর বর্ণবোধ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, বর্ণান্ধতা-ব্যাধি পুরুষ মানুষের মধ্যে দশ গুণ বেশী। পুরুষের ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ। নারীর স্পর্শেন্দ্রিয় ও আস্বাদজ্ঞান বেশী অনুভূতিসম্পন্ন। অধ্যাপক রাইনের মতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উভয়ের সমান।

জীবনীশক্তি

'ডায়নামোমিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে —নরের দৈহিক বল নারী অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক। ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী ওজন বহন করিতে পারে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে মেয়েরা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু বহুক্ষণব্যাপী অল্পশ্রমসাধ্য কার্য্যে তাহারা অধিকতর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।

মেয়েমানুষের শরীরে অসুখ অসুস্থতা বেশী, কারণ সাধারণ রোগব্যাধি

ছাড়াও স্ত্রীদেহ-সংক্রান্ত নানা রকম অসুখে তাহাদের কষ্টভোগ করিতে হয়। তবে নারীর জীবনীশক্তি অধিক হওয়ায় সহজেই রোগ নিরাময় হয়। ইউরোপে স্ত্রীলোকের আয়ু গড়ে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় তিন বৎসর বেশী। জন্মের পূর্ব্বে ও পরে প্রাণশক্তির এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে জন্মের পূর্ব্বে মৃত্যুর হার এই রূপ—মৃত অবস্থায় মেয়ে-শিশু-সন্তান যদি ১০০ জন জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ছেলে-শিশু প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় প্রায় ‍.৫০ জন। আশী বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার সংখ্যা ঐ বয়সের বৃদ্ধের সংখ্যার দ্বিগুণ। তবে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে পুংশিশু অধিক সংখ্যায় আগমন করে। জীবিত অবস্থায় শিশুজন্মের অনুপাত এইরূপ—১০০ মেয়ে ও ১০৬ ছেলে। বিলাতে এক বৎসর বয়সে শিশু-মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১০০ মেয়ে ও ১২০ ছেলে। পুরুষ মানুষের জন্মের অনুপাত অধিক, কিন্তু মৃত্যুর হার ততোধিক। মনে হয় পুরুষের জবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

ভারতবর্ষে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যথোচিত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া মেয়েদের মধ্যে ঐ সময় মৃত্যুর হার বেশী। সেজন্য এদেশে যুবতীর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল যুবকদের অপেক্ষা অধিক ত নয়ই, বরং কিছু কম। ভারতে ছেলে ও মেয়ের সম্ভাব্য আয়ুর অনুপাত যথাক্রমে ২৬·৯১ ও ২৬·৫৬ বৎসর।

পুরুষের সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত (এমন কি ৯০ বছরেও) অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ৪৫।৫০ বৎসরে ঋতু-সমাপ্তির সঙ্গে উৎপাদিকাশক্তি বিলুপ্ত হয়।

অসুখ-অসুস্থতা

নিম্ননির্দ্দিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষরোগী অধিক সংখ্যায় দেখা যায়, যেমন—শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, মূত্রপাথুরি, গাঁটের বাত (৯০%), হার্ণিয়া, মস্তিষ্কের

সিফিলিস (৮০%), বহুমূত্র, অপস্মার (৭০%), নিউরাসথিনিয়া নামক স্নায়ুরোগ এবং schizophrenia আখ্যাত মনোরোগ—যাহাতে রোগীর স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্বাস হ্রাস পায় এবং বাস্তবের সহিত সম্পর্ক লোপ হয়। হেমোফিলিয়া নামক অতিরিক্ত রক্তপাত রোগটি কেবল পুরুষমানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যদিও মেয়েরাই ব্যাধি বহন করে, তথাপি তাহারা কখনও এই অসুখে আক্রান্ত হয় না। হৃৎপিণ্ডের পীড়া কিংবা উচ্চ রক্তচাপ জনিত অসুস্থতা কোন পুরুষের হইলে তাহার জীবনকালের পরিমাণ ঐরূপ রোগাক্রান্তা কোন স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছু কম আশা করা যায়।

পরবর্ত্তী রোগগুলি নারীদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয় যথা—স্থূলতা, থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ (৮৮%), পিত্তপাথুরি (৭৫%.), কর্কট-ব্যাধি, সন্ধিবাত (৮০%.), বিসর্পব্যাধি, বিবিধ স্ত্রীরোগ, উত্তেজনা—অবসন্নতা, মানসিক ব্যাধি (৭০%), হিষ্টিরিয়া এবং গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত মনের রোগ।

জনসংখ্যা

সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে নারীর সংখ্যা বেশী, আর প্রাচ্য দেশগুলিতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। কঠোর জীবন-সংগ্রাম, যুদ্ধবিগ্রহ এবং যান্ত্রিক দুর্ঘটনা পুরুষের আয়ু হরণ করে। অপর দিকে অন্তঃসত্বা অবস্থায় অযত্ন ও অবহেলা নারীর আয়ুষ্কাল হ্রাস করে। প্রকৃতি তাই নারীর রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা অধিক দিয়াছেন আর পুরুষের জন্মের হার অধিক করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকিবার সম্ভাবনা।

নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯২০ সনে নরনারীর অনুপাত ও জন্মের হার যেরূপ ছিল তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :

দেশ	প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার মেয়ের জন্মের অনুপাতে ছেলের জন্মের হার
জার্ম্মানী	১০৯১	১০৭২
ফ্রান্স	১১০৩	১০৫৯
ইংলণ্ড	১০৯১	১০৫২
ইটালী	১০২৮	১০৬০
গ্রীস	১০১০	১০৬৩
রাশিয়া	১২২৪	—
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৯৬০	১০৫৭
কানাডা	৯৪০	১০৬৫
জাপান	৯৭৯	১০৪৫
ভারতবর্ষ	৯৪০	১০৮০
মিশর	৯৯৭	১০৯৩
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৯৪৩	১০৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	৯৬৮	১০৬২

বর্ত্তমান সময় আমেরিকায় স্ত্রীলোকের অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মানসিক প্রভেদ

নর-নারী উভয়ের সাধারণ বুদ্ধি সমান। স্মৃতিশক্তি ও ভাষাবোধ মেয়েদের বেশী, ছেলেরা যুক্তিতর্কে ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে অধিক পারদর্শী। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে ছেলেদের স্বাভাবিক যোগ্যতা বেশী। বচনকুশলতা ও বাক্‌চাতুর্য্যে মেয়েরা শ্রেষ্ঠ। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নদর্শন মেয়েদের মধ্যে বেশী। পুরুষ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাধান্য-লাভের অভিলাষ অতীব প্রবল, নারীর মাতৃস্নেহ সুগভীর। নারীর মন

নমনীয়, পুরুষের মন দুর্দ্দমনীয়। পুরুষের চিত্ত স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, মেয়েমানুষের মন স্বাভাবিক কারণে গৃহমুখী। নারীর মন রক্ষণশীল, প্রাচীন প্রথা ও রীতি স্ত্রীলোকেরা সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া চলে। লজ্জা, ভয়, দুঃখ প্রভৃতি ভাবাবেগে মেয়েরা শীঘ্রই উচ্ছ্বসিত হয়, কিন্তু যৌন ব্যাপারে পুরুষ অধিক সক্রিয়, নারী অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়।

অস্বাভাবিক যৌনবিকার পুরুষের মধ্যেই সর্ব্বাধিক। ইউরোপ, আমেরিকায় আত্মহত্যার অনুপাত পুরুষ মানুষের ভিতর অধিক, কিন্তু এদেশে সামাজিক অবিচারের জন্য মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী। মিথ্যাভাষণ স্ত্রীলোকের ভিতর বেশী দেখা যায়, ইহার কারণ লজ্জা ও দুর্ব্বলতার জন্য তাহাদের অনেক সত্য গোপন করিয়া চলিতে হয়। অন্যান্য অপরাধপ্রবণতা পুরুষের মধ্যে আট গুণ বেশী। মদ্যপান ও মাদকজনিত মত্ততা পুরুষমানুষের ভিতর সাত গুণ সাধারণ।

তথাপি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত সুরস্রষ্টা এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রায় সকলেই পুরুষ। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না নারীর সংখ্যা নগণ্য। ইহার কারণ কি? অনেকে বলেন—পুরুষজাতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, সেজন্য তাহাদের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভা ও অস্বাভাবিক নির্ব্বুদ্ধিতা, অসামান্য পুণ্য ও উৎকট পাপ সমধিক পরিদৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন, মেয়েদের মাতৃত্বের জন্য অতিরিক্ত প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয়, সেজন্য তাহাদের অন্য দিকে প্রতিভাস্ফুরণের আর অবকাশ থাকে না। এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, মানবশিশু জননীর গর্ভে বর্দ্ধিত হয় দশ কোটি গুণ, আর জন্মের পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র কুড়ি গুণ—সুতরাং সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব কতখানি তাহা ইহাতেই প্রমাণিত হয়। আবার অনেকের মতে—সুযোগ-সুবিধার অভাবই নারীদের প্রতিভা

বিকাশের অন্তরায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে তাহারা পুরুষের সমকক্ষ উন্নতিলাভ করিতে পারে।

অতএব নর-নারীকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যলাভে সমান সুযোগ প্রদান করা বিধেয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৎসত্ত্বেও মনে রাখা উচিত, নারী-জীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে—সন্তান-ধারণ ও পালনে, গৃহকর্ম্ম-সম্পাদনে, সেবা-শুশ্রূষায়, দয়ায় ও ভালবাসায়। পুরুষ-প্রাণের পূর্ণতা বহির্জগতে, দুঃসাহসিক অভিযানে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, শক্তিচর্চ্চায় এবং শিল্প-সাধনায়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Man and Woman, by Havelock Ellis.
2. Descent of Man, by Darwin.
3. Psychology, by Woodworth.
4. Mind and Its Disordere, by Stoddart.
5. Psychiatry, by Henderson and Gillespie.
6. Science of Life, by Wells and Huxley.
7. Lyon's Medical Jurisprudence for India, by Waddell.
8. Practice of Medicine, by Price (1950).
9. Encyclopaedia Britannica (1946) : Population.

জীবন ও মৃত্যু

এ জগতে জড় ও জীব উভয়ের অস্তিত্ব আছে। মাটি বাতাস ও জল জড়বস্তুর অন্তর্গত আর গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মাছ, ব্যাঙ, সাপ ও পশু-পক্ষী জীবন্তের মধ্যে গণনীয়। প্রথমে জীবের বিশেষত্ব কি জানা দরকার। প্রায় প্রত্যেক জীব শিশু অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, যৌবনে বংশ বিস্তার করে এবং বার্দ্ধক্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবমাত্রেই খাদ্যগ্রহণ করিয়া শরীরেব পুষ্টিসাধন করে এবং স্বকীয় আবর্জ্জনা নিষ্কাশন করিয়া দেয়। দুই-এক রকম বীজাণু ব্যতীত সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রশ্বাসের সহিত অক্সিজেন লইয়া উহার সাহায্যে দেহমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু দহন করিয়া বাঁচিবার বল সংগ্রহ করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলবাষ্প বাহির করিয়া ফেলে। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাভয়সিয়ার (১৭৪৩—১৭৯৪) সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন যে জলন্ত প্রদীপ ও জীবন্ত মূষিক উভয়েই অক্সিজেন ঘটিত দহন ক্রিয়ার নিদর্শন। ইহা ছাড়া কোন কোন উদ্ভিদ এবং প্রায় সকল প্রাণী গতিশক্তিসম্পন্ন। প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ মাধ্যাকর্ষণ, শব্দ, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, রাসায়নিক পদার্থ, আলো, আঘাত প্রভৃতি বিভিন্ন উত্তেজনায় বিবিধরূপে সাড়া দিয়া থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় জীবের জীবনকালের পরিমাণ বিবিধ প্রকারের হয়। বৃহৎ প্রাণীর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ, আর ক্ষুদ্র জীবের আয়ু হ্রস্ব। সাধারণ কর্ম্মী-মৌমাছির আয়ু প্রায় ৮ সপ্তাহ। প্রজাপতি এক বৎসরকাল জীবিত থাকে। অন্যান্য প্রাণীর সর্ব্বাধিক পরমায়ুর পরিমাণ বছরের হিসাবে এইরূপ—বাইন মাছ ৬০, সামন মাছ ১০০, ব্যাঙ ১২, কুমীর ৪০, কচ্ছপ ১০০ হইতে ২০০, হাঁস ৫০, টিয়াপাখি ৮০ পর্য্যন্ত, ঈগল ১০০, অস্ট্রিচ পক্ষী ৫০,

ইঁদুর ৫, বেরাল ১২—২৩, কুকুর ১৬—১৮, ছাগল ও ভেড়া ১২—১৪, গরু ও ঘোড়া ১৫—৩০, বাঘ ও সিংহ ২৫—৪০, শিম্পাঞ্জী ১২—৩০, হাতি ৩০—৯০, তিমি কয়েক শতাব্দী। কালিফোর্ণিয়ার বিশাল বৃক্ষ ৪০০০ বৎসর অবধি বাঁচে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী আফ্রিকার বাওবাব গাছ। ইহার আয়ু ৫০০০ বৎসর। দীর্ঘজীবী মানুষের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত স্রপশায়ারের কৃষক টমাস পার (১৪৮৩-১৬৩৫), ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক শেভ্রল (১৭৮৬—১৮৮৯), ইটালীর শতায়ু লুইস কর্নারো, বাংলার জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৫-১৮০৬) এবং রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের (১৮৩৮-১৯৪৭) নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

একখানি অট্টালিকা যেমন বহু সংখ্যক ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ মানুষের শরীর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের দ্বারা গঠিত। সাধারণ লোকের শরীরে প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০০ কোষ আছে। প্রত্যেক কোষের পৃথক প্রাণ। সর্ব্বকোষের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ফলে সমগ্র দেহ জীবন্ত ও চলন্ত। দেহকোষের প্রাণধারণের জন্য অন্ন ও অক্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য দেহ হইতে কোন অঙ্গ কর্ত্তিত হইলে এই দুই বস্তুর অভাবে অল্পক্ষণের ভিতর উহার মৃত্যু ঘটে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কোষকে উপযুক্ত আধারে জীবিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। ইহাকে কোষের চাষ, tissue culture বলা হয়। বিশ্লিষ্ট দেহকোষকে পুষ্টিকর রক্তরসের serum মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বায়ুপূর্ণ পাত্রে কয়েকদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়। এমন কি অল্পকাল পরে ইহারা তথায় বংশবিস্তার আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু কিছুদিন পরে বর্দ্ধিত কোষরাশির নিঃসৃত দূষিত পদার্থ মাধ্যমকে এ রকম বিষাইয়া দেয়, যাহার ফলে সমস্ত কোষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি পুনঃ পুনঃ নূতন রক্তরসে কোষ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে উহারা অনির্দ্দিষ্টকাল

পর্য্যন্ত সজীব থাকে। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত ডাক্তার আলেকসিস ক্যারেল (১৮৭৩-১৯৪৪) লিখিয়াছেন, ১৯১২ সালে যে মুরগীশিশুর হৃৎপিণ্ডের কোষ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল উহা ১৯৩৫ সালেও প্রাণবন্ত ছিল।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন জলের সহিত রক্তের অনুরূপ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া উহাতে যদি কোন খরগোসের হৃৎপিণ্ড রক্ষা করা যায়, তবে উহা অনেক ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে একজন শরীরতত্ত্ববিদ্ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক আসামীর হৃৎপিণ্ড লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা সম্পাদন করেন। লোকটির প্রাণত্যাগের প্রায় এগার ঘণ্টা পরে তিনি হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার মধ্যে রুধিরের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত জলীয় পদার্থ সঞ্চালন করেন; ইহার পর হৃদয়যন্ত্র আবার স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল এবং পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল চলিতে থাকিল। অনুরূপ ক্ষেত্রে কচ্ছপের মত কোন শীতলরক্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ড বহু সপ্তাহ অবধি জীবন্ত থাকে।

জীবদেহে শোণিত সঞ্চলন বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ রক্তই সমস্ত শরীর শোধন করে এবং বায়ু ও খাদ্য সরবরাহ করে। এজন্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইলে সাধারণত সকল জন্তু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। তথাপি কখনও কখনও কতিপয় আশ্চর্য্যজনক ব্যতিক্রম দেখা যায়। টাইডি একজন লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহার আট মিনিট অবধি কোন রকম হৃৎকম্পনের শব্দ শুনা যায় নাই, তবুও সে পরিশেষে সঞ্জীবিত হয়। ১৯১৬ সালে লণ্ডনের গাইস হাসপাতালে ডেভিস নামক একটি ছয় বৎসরের বালকের যখন অজ্ঞান অবস্থায় টনসিল অস্ত্রোপচার করা হইতেছিল তখন অকস্মাৎ তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থামিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ বক্ষের পার্শ্ব ছেদন করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড মৃদুভাবে মর্দ্দন করা হইতে থাকে। ইহার ফলে ঐ অঙ্গ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে। বালকটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ

করে এবং স্বাভাবিকভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তের মিনিট কাল স্থগিত ছিল।

আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস গ্রহণ করি তাহা সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়। শ্বাস বন্ধ থাকিলে বায়ুর অভাবে পাঁচ মিনিট পরেই মানুষের প্রাণবিনাশ হয়। সচরাচর ডুবুরীরা দুই মিনিট সময় জলের নীচে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে। আলহামবা সঙ্গীতাগারের সংলগ্ন জলাশয়ে মিস ওয়ালেণ্ডা নামক একজন মহিলা সাঁতারু কিন্তু ৪ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত জলের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। জলমগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে সহসা হতাশ হওয়া সমীচীন নয়, কারণ পাঁচ মিনিটেরও বেশী নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও এবং সাড়ে আট ঘণ্টা কাল জীবনের কোন লক্ষণ না থাকিলেও অবিরাম কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এমন লোকের ঘটনাও জানা যায়। তিন-চার ঘণ্টা মৃত বলিয়া পরিগণিত একটি তিন বছরের শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রয়োগের ফলে পুনর্জ্জীবিত হওয়ার কথা অধ্যাপক ফোর্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক অবস্থায় দেখা যায় কোন কোন জীব জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী দশায় রুদ্ধপ্রাণ, suspended animationএর অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকিতে পারে। বৃক্ষবীজের সুপ্তজীবন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধারণ গাছের বীজ সুষুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন থাকিতে পারে। অধিকাংশ গাছের বীজের প্রাণশক্তি সাত বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। গমের বীজ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পঁচিশ বছর অবধি জীবন্ত থাকিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ১২০ হইতে ৪০০ বছরের পুরান পীট নামক অর্দ্ধ কয়লা-স্তরে পদ্ম জাতীয় যে গাছের বীজ পাওয়া যায় সেই বীজ ১৯৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের কিউ উদ্যানে অঙ্কুরিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে বহুবিধ প্রাণী খাদ্যের অল্পতা হেতু এবং শৈত্যজনিত

জড়তার জন্য সমস্ত শীত ঋতু ঘুমাইয়া অতিবাহিত করে। এই ব্যাপারকে হিমশয়ন বা hibernation বলা হয়। হিমশয়নের সময় এই সব প্রাণীর দেহতাপ কমিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রায় সমান হইয়া যায়, তখন শরীরে শোণিতপ্রবাহ বিদ্যমান থাকিলেও উহার গতি অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্থর হইয়া পড়ে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতি ধীরে চলে কিংবা একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। নানারকম পতঙ্গ, শামুক, ব্যাঙ, কচ্ছপ, টিকটিকি, সাপ, বাদুড়, কাঁটাচুয়া, গন্ধগোকুল, ডরমাউস, ব্যাজার, রেকুন ভালুকাদি প্রাণী হিম অঞ্চলে শীতকালে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়া নিদ্রিত থাকে। শরীরে শরৎকালের সঞ্চিত যে চর্বি থাকে, উহাই খাদ্যের কাজ করে। শীতশয়ন-কালে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্তব্ধ হইয়া যায় তাহা বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হইয়াছে। যে কাঁটাচুয়া জাগ্রত ও কর্মঠ অবস্থায় জলমগ্ন হইলে তিন মিনিটের ভিতর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উহাই আবার হিমনিদ্রার সময় বাইশ মিনিট পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে। একটি শীতনিদ্রিত বাদুড় এগার মিনিট অবধি জলমগ্ন থাকিয়াও জীবিত ছিল। কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে একটি শীতশায়িত বাদুড় চারঘণ্টা কাল স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও মরে নাই। অন্যান্য সকল প্রাণী স্বাভাবিক অবস্থায় এই অঙ্গারক বাষ্পে নিমজ্জিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন বাদুড় বায়ুমাপক আধারে রক্ষিত হইলে এক ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয়। সেই বাদুড় হিমশয়নের সময় দশ ঘণ্টার মধ্যেও উক্ত আধার হইতে উল্লেখযোগ্য কিছুমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করে নাই। শীতকালীন নিদ্রা ব্যতীত কোন কোনরকম শামুক, কাদা মাছ, সিংহল দ্বীপের গেছো মাছ, ব্যাঙ, ভল্লুক সদৃশ এক প্রকার জীবাণু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রপ্রাণী, rotifer গোল কীট এবং কয়েক শ্রেণীর খোলসধারী জীব crus-

tacean দারুণ গ্রীষ্ম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় সুপ্ত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় জীবনপ্রদীপ ক্ষীণভাবে জ্বালিয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু বর্ষা ঋতু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পূর্ব্বের স্বাভাবিকভাব প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও এই সব শুষ্ক সঙ্কুচিত প্রাণী প্রায় নিরুদ্ধপ্রাণ অবস্থায় কয়েক মাস হইতে কয়েক বছর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে, যতক্ষণ না উপযুক্ত আর্দ্রতা তাহাদের পুনরায় সরস ও সজীব করিয়া তোলে। ক্যাটালেপ্‌সি নামক হিষ্টিরিয়া সংশ্লিষ্ট একপ্রকার স্নায়বিক ব্যাধি আছে। এই অসুখে সমস্ত শরীর কঠিন হইয়া যায়, আর জৈবনিক ক্রিয়া এত ধীর গতিতে হইতে থাকে যে অনেক সময় রোগীকে মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থা কয়েক মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা কিংবা কিছুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। সাধারণতঃ দীর্ঘকালস্থায়ী কোন ভয়, অবসাদ অথবা ভাবাবেগ catalepsyর কারণস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়।

প্রাচীন যুগে ভারতীয় যোগীরা জীবন ও মরণের অন্তবর্ত্তী দশা এবং সমাধি অবস্থা সম্পর্কে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন। এদেশে কোন কোন যোগী আয়াস ও অভ্যাসের ফলে শ্বাসক্রিয়া ও শোণিত সঞ্চলন আশ্চর্য্য রকম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। ১৮৩৭ সালে লাহোরে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সম্মুখে হরিদাস নামক জনৈক হঠযোগী তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করেন। এই যোগীকে রণজিৎ সিংহ, সার ক্লড ওএড ও ডাক্তার হনিগ বার্জার এবং অন্য সকলের সম্মুখে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়। একদল শিখ সৈন্য দিবারাত্রি ঐ সমাধিস্থান পাহারা দিতে থাকে যাহাতে প্রতারণার লেশমাত্র অবকাশ না থাকে। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে চল্লিশ দিন পরে জীবন্ত অবস্থায় উত্তোলন করা হয়। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। দিল্লীতে ১৮৮৯ সালে ডাক্তার সেন ও তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী চন্দ্র সেন উভয় ভ্রাতা পদ্মাসনে

উপবিষ্ট ও সমাধিস্থ এক যোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন। তাঁহারা দেখিলেন যোগীর করস্থ ধমনীর স্পন্দন সম্পূর্ণ স্থির, এমন কি স্টেথস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যেও হৃদয়ের স্পন্দন কিছুমাত্র অনুভূত হইল না। অনন্তর ঐ যোগীকে মৃত্তিকানিম্নে প্রস্তরনির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়া উহার রুদ্ধ দ্বারে তালাচাবি লাগান হইল। সিটি ম্যাজিস্টেট আবার উহাতে শীল-মোহর করিয়া দিলেন। তেত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিবার পর দেখা গেল যোগীরাজ ঠিক পূর্ব্বানরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর মৃত্যুকঠিন। যাহা হউক বাহিরে আনিয়া তাঁহার মুখ মধু ও দুধ দিয়া মর্দ্দন করা হইল আর সর্ব্বশরীর তেল দিয়া মালিশ করা হইতে লাগিল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় জীবনের সমস্ত লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল। চামচের সাহায্যে কেবল তাঁহার মুখে সামান্য দুগ্ধ প্রদান করা হইতেছিল। তিনদিন পরেই যোগীরাজ স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন এবং ইহার সাত বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

এতক্ষণ দেখা গেল কখনও কখনও জীবনক্রিয়া ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিয়া কিছুকালের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিয়াও আবার সচল হইতে পারে। এই ব্যাপার বিশেষ কতিপয় স্থলে পরিলক্ষিত হয়। জৈবনিক কার্য্য, চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্যু হয়।

উচ্চশ্রেণীর কোন প্রাণীর মরণ হইলে, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সহযোগিতার ফলে সমগ্র শরীরে যে জৈবনিক কার্য্য চলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। সমগ্রভাবে দেহের মৃত্যু হইবার পরও অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য শরীরের কোষগুলি ব্যষ্টিগতভাবে জীবিত থাকে। সময় সময় জীবিত কি মৃত তাহা স্থির করা কিছু কষ্টকর হইয়া উঠে। ডাক্তার হার্টমান লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ সালে প্যারিসে র‍্যাচেল নামক একটি স্ত্রী-লোকের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু হয়। শরীর সংরক্ষণের জন্য যখন বিশোধক

ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছিল, তখন সহসা সে জাগিয়া উঠে, কিন্তু সংরক্ষণ-প্রক্রিয়াজনিত আঘাতের ফলেই দশ ঘণ্টা পরে সে প্রকৃতপক্ষে প্রাণত্যাগ করে। অগষ্টোন নামক একজন পর্যবেক্ষক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত একটি শিশু ও আর একটি নারী যথাক্রমে সাত ও চার ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবন্ত ছিল। প্রাগ শহরের অধ্যাপক মাস্কা বলিয়াছেন, একবার একটি শিশুর বাহ্যতঃ প্রাণহীন শরীর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন ব্যবচ্ছেদাগারে স্থাপিত হয় এবং তথায় চৌদ্দঘণ্টাকাল রক্ষিত হয়। বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পর দেখা গেল ফুস্ফুসটি অপূর্ণ ও নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে কিন্তু হৃৎপিণ্ড তখনও ধীরগতিতে মিনিটে কুড়িবার স্পন্দিত হইতেছে।

আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, প্রাণ কি শুধু অক্সিজেন সহযোগে খাদ্যবস্তুর দহনজনিত রাসায়নিক শক্তি না আর কিছু? শীতশায়িত বাদুড় ও সুষুপ্ত বৃক্ষবীজ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কই অক্সিজেন গ্রহণের ত বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বায়ু ব্যতিরেকে তাহারা বেশ কিছুদিন জীবন্ত থাকে। তবে কি প্রাণ রাসায়নিক শক্তি ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম কোন কিছু? অবশ্য এ কথা ঠিক, রাসায়নিক ক্রিয়া ছাড়া অনির্দ্দিষ্টকাল জীবদেহে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইহাও সত্য, প্রাণশূন্য শরীরে ব্যক্তিগত জৈব রাসায়নিক কার্য্য অসম্ভব। তাহা হইলে কী সিদ্ধান্ত করা যায়, জীবনকে অবলম্বন করিয়া রসায়ন না রসায়নকে অবলম্বন করিয়া জীবন?

আস্বাদ ও আঘ্রাণ-বোধ

স্বাদ ও গন্ধজ্ঞান উভয়ই রাসায়নিক অনুভূতি। আমাদের জিহ্বার উপর বহুসংখ্যক সূক্ষ্মাবোধসম্পন্ন কোরক (টেস্ট বাড্‌স্) ইতস্ততঃ ছড়ান আছে, উহাদের সহিত সংলগ্ন ও মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্নায়ুসূত্রসমূহ মানুষের আস্বাদবোধ জন্মায়। মানুষের স্বাদজ্ঞান প্রধানতঃ অম্ল, মধুর, তিক্ত ও লবণাক্ত এই চারভাগে বিভক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ মিষ্টি স্বাদ অনুভব করে, আর পশ্চাৎভাগ তিক্ত স্বাদ বোধ করিতে পারে। লবণাক্ত ও অম্বল আস্বাদ জিহ্বার সম্মুখ ও পার্শ্ব ভাগ দিয়া অনুভূত হয়। তিক্ত অথচ মিষ্টি কোন রস জিহ্বার অগ্রে দিলে মধুর মনে হয় কিন্তু পশ্চাতে স্থাপন করিলে তিক্ত বোধ হয়। যে কোন বস্তুই মুখের মধ্যে স্থাপন করা যাক না কেন, উহা প্রথমে উত্তমরূপে মুখের লালায় দ্রব হাওয়া আবশ্যক, নচেৎ কোন আস্বাদই অনুভূত হয় না। যদি রসনার সম্মুখভাগ শুষ্ক করিয়া উহার উপর মিছরি কিংবা লবণের ডেলা রাখা হয়, তাহা হইলে কোন স্বাদই বোধ হয় না।

আমাদের আস্বাদ ও আঘ্রাণ, এই দুই ইন্দ্রিয়ই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত রহিয়াছে। খাদ্যের স্বাদ অনেক পরিমাণে উহার গন্ধের উপর নির্ভর করে। সর্দ্দি লাগিয়া নাক বন্ধ হইয়া গেলে সমস্ত খাদ্যবস্তু কিরূপ বিস্বাদ মনে হয়, তাহা সকলেই জানেন। নাক বন্ধ করিয়া দিলে জিহ্বার দ্বারা আপেলের রস ও পেঁয়াজের রসের মধ্যে আর কোন পার্থক্যই ধরা যায় না। সেইরূপ আঘ্রাণ না লইয়া হালকা কুইনাইনদ্রব ও কফির মধ্যে কোন প্রভেদই পাওয়া যায় না। যকৃতের রোগ, মানসিক ব্যাধি এবং অন্য অনেক রকম অসুখে মানুষের মুখের স্বাদ বিকৃত হইয়া পড়ে। উপরোক্ত চারপ্রকার আস্বাদ ছাড়া, বস্তুবিশেষ মুখমধ্যে শীত-উত্তাপ ও জ্বালাবোধ

উৎপন্ন করিয়া রসবৈচিত্র্য আনয়ন করে। মুখে পিপারমিন্ট গেলে ঠাণ্ডা বোধ হয়, মরিচ দিলে ঝাল লাগে। এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কটু ও কষায় লইয়া ছয়টি স্বাদের সত্তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের আস্বাদজ্ঞান ছেলেদের চাইতে বেশী।

রসনার রসায়ন এখনও অবধি ভাল করিয়া জানা যায় নাই। সাধারণতঃ অ্যাসিড বস্তু হইতে অম্ল আস্বাদ জন্মায়, কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম হয়। এমন কয়েকরকম অ্যাসিড আছে, যাহা জিহ্বায় লাগাইলে কিছুমাত্র টক বোধ হয় না। অন্যদিকে রাসায়নিকদিগের মতে, মোটেই অ্যাসিড নয়, এরূপ অনেক জিনিস আছে যাহা মুখে গেলে অম্ল মনে হয়। সেইরূপ চিনি ছাড়া স্যাকারিন, গ্লিসারিন, লেড অ্যাসিটেট প্রভৃতি বিবিধ বস্তু জিহ্বায় দিলে মিষ্টি বোধ হয়। অনেক সময় স্বাদের বৈষম্য হইতে পদার্থের তারতম্য অধিকতর সূক্ষ্মভাবে অনুভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় খুব মৃদু লবণ-দ্রব মুখে দিলে কোন আস্বাদই পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রথমে মুখের ভিতরটা চিনির রস দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া ঐরূপ কোন ক্ষীণ লবণ-দ্রব গ্রহণ করিলে স্বাদ সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। ইহা বৈষম্যজনিত অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই জাতীয় পার্থক্য অম্ল ও লবণ এবং মধুর ও অম্লের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু তিক্ত বস্তুর সংস্পর্শে কোনরকম বিভেদ হয় না। জিহ্বায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হইলে বিশেষ এক প্রকার আস্বাদ বোধ হয়।

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাব্‌লভ কুকুরের আস্বাদবোধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহারা সুস্বাদ ও তিক্ত বস্তুর পার্থক্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। জলচর মৎস্যের স্বাদবোধ শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সারা শরীর-ময় বিস্তৃত। ইহাদের আর্দ্র চর্ম্মও বেশ অনুভূতিসম্পন্ন। যদি কোন মার্জ্জার মৎস্যের পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করিয়া এক টুকরা মাংস নিঃশব্দে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে ছুটিয়া গিয়া উহাতে মুখ দেয়। মার্জ্জার

মাছ ছাড়া কার্প ও অন্য অনেক জাতীয় মৎস্য স্বীয় শরীরসংলগ্ন শুঁয়োর সাহায্যে অংশতঃ আস্বাদ গ্রহণ করে। এক শ্রেণীর উইপোকা আছে, উহারা মৃত্তিকামধ্যস্থ অন্ধকার গর্ত্তে পরস্পরের দেহের স্বাদ গ্রহণ করিয়া একে অন্যকে চিনিয়া থাকে।

এইবার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় আলোচনা করা যাক। নাসারন্ধ্রের উপরের দিকে প্রায় সিকি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত পীতবর্ণের এক স্থান আঘ্রাণের উদ্রেক করে। উহার সহিত সংলগ্ন সুদীর্ঘ স্নায়ুকোষ সকল মস্তিষ্কে গিয়া উপনীত হইয়াছে। প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত কোন বস্তুর বাষ্প কিংবা সূক্ষ্ম কণা নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দ্রবীভূত হইবার পর গন্ধবোধ উৎপন্ন হয়। বাতাসের আর এক নাম গন্ধবহ। আঘ্রাণজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম অনুভূতি। এক মিলিগ্রামের বিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র মৃগনাভি সাধারণ লোকের গন্ধজ্ঞান জাগ্রত করিতে পারে। অপরদিকে মার্কাপটান নামক পচা মাংস হইতে উদ্ভূত দূষিত পদার্থ এক মিলিগ্রামের দুই হাজার কোটি অংশের একাংশ মাত্রায় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেও আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। (এক মিলিগ্রাম এক রতির প্রায় শত ভাগের সমান)। এখনও পর্য্যন্ত কোনরকম রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এত ক্ষুদ্র পদার্থকণার অস্তিত্ব প্রমাণিত করা সম্ভব হয় নাই।

গন্ধোৎপাদক পদার্থসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভিন্ন করা যায়, (১) সুগন্ধবোধক লবঙ্গ, ভ্যানিলা, কমলা ইত্যাদি, (২) ঝাঁঝাল তাপিন তৈল প্রভৃতি (৩) দুর্গন্ধময় পচা বা পোড়া জিনিস।

কতিপয় ইতরপ্রাণীর ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে ঢের বেশী তীক্ষ্ণ। এক-জাতীয় পুরুষ-প্রজাপতির ঘ্রাণশক্তি এত প্রখর হয় যে, কোন স্ত্রী-প্রজাপতি অধ্যুষিত খালি কার্ড-বোর্ডের বাক্সের নিকটে পুরুষ-প্রজাপতিরা এক মাইল দূর হইতে উড়িয়া আসে। মেরু-প্রদেশের অধিবাসী এস্কিমোদের

ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত তীব্র হয় যে, পাঁচ মাইল দূর হইতে মাংসের গন্ধ পাইয়া তাহারা সোজা সেই দিকে গমন করে। কুকুরের নাসাভ্যন্তরে ঘ্রাণানুভূতি-সম্পন্ন স্থানের বিস্তার প্রায় দশ বর্গইঞ্চি। ব্লাড-হাউণ্ড জাতীয় কুকুরের আঘ্রাণবোধ বিশেষ প্রবল। এই সব কুকুর নিজ নিজ প্রভুর গন্ধ অপর ব্যক্তির মধ্য হইতে ঠিক চিনিতে পারে। পলাতক অপরাধীর স্পৃষ্ট ও পরিত্যক্ত কোন বস্তুর আঘ্রাণ লইয়া ইহারা অনেক সময় ঠিক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ সম্মোহনকারী ডাক্তার বলেন, আবিষ্ট (হিপনোটাইজ্‌ড) অবস্থায় পাত্রবিশেষের আঘ্রাণবোধ নির্দ্দেশ (সাজেসশন) দিয়া অধিক অনুভূতিসম্পন্ন করা যায়। ডাক্তার ব্রেড (১৭৯৫-১৮৬০) লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্মোহিত কোন ব্যক্তি পঁয়তাল্লিশ ফুট দূর হইতে গোলাপফুলের গন্ধ নির্ভুলভাবে টের পাইয়াছিল। কার্পেণ্টার নামক অন্য এক পর্য্যবেক্ষক বলিয়া গিয়াছেন, এক সময় কোন সম্মোহিত পাত্র ষাটজন লোকের ভিতর হইতে নির্দ্দিষ্ট দস্তানার অধিকারীকে শুধু আঘ্রাণের দ্বারা চিনিয়া বাহির করে। সোভেয়ারের বিবৃতি হইতে জানা যায়, এক মোহিত পাত্র আটজন লোকের হাতের গন্ধ শুঁকিবার পর প্রত্যেককে তাহাদের নিজ নিজ রুমাল প্রদান করে। যদিও তাহাকে ভুল পথে লইয়া যাইবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়। আসল কথা, সম্মোহনকারীর নির্দ্দেশ অনুসারে পাত্রের মন যত একাগ্র হয়, তাহার আঘ্রাণানুভূতিও সেই মত তীক্ষ্ণ হয়।

দৃষ্টি-তত্ত্ব

আলোক অনুভবের সূক্ষ্ম ক্ষমতাই দৃষ্টিশক্তি। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদ-জ্ঞান অপেক্ষা আলোকবোধই যে মানুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, তাহা প্রত্যেকেই হয়ত স্বীকার করিবেন। সকলেরই দৃষ্টিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ নিম্ন শ্রেণীর জীবের সাধারণ আলোক-অনুভূতি হইতে উচ্চ জাতীয় প্রাণীর আকারবোধ ও বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন নয়নের ক্রমবিকাশ বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানে দর্শনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।

এমিবা নামক অতি ক্ষুদ্র এককোষ প্রাণীর উপর সহসা তীব্র আলোক-রশ্মি পতিত হইলে ইহারা সমস্ত শরীর আকুঞ্চিত করিয়া অস্বস্তি জানায় এবং ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় প্রস্থান করিতে সচেষ্ট হয়। ইহারা সর্ব্ব শরীর দিয়া আলোক অনুভব করে। ইহার পর স্টেনকর নামক এককোষবিশিষ্ট কেশর-যুক্ত প্রাণীর কথা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের দেহের অগ্রভাগ কেবল আলোকানুভব করিতে পারে, কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগের সেরূপ কোন ক্ষমতা নাই। কেঁচো বহুকোষবিশিষ্ট কীট। ইহারা উজ্জ্বল আলোকিত স্থান সর্ব্বদা পরিহার করিয়া চলে। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহারা গর্ত্তের বাহিরে থাকিয়া তৃণপত্র-ভোজনে রত থাকে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বিবরে পুনঃ প্রবেশ করে। ইহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে, চর্ম্মের উপরিভাগে বহুসংখ্যক আলোকানুভূতিসম্পন্ন কোষ সাধারণ দেহ-কোষের সঙ্গে সর্ব্বত্র ছড়ান রহিয়াছে। ব্যাঙের বাচ্চারাও অনুরূপভাবে সর্ব্বশরীর দিয়া আলোক অনুভব করে। অন্ধ বেঙাচির উপর আলোকপাত করিবামাত্র জোরে জোরে সন্তরণ করিতে থাকে। শামুকও আলো ছায়া

ছাড়া আর বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই সব প্রাণীর দৃষ্টি-শক্তি অনেকটা আমাদের চোখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপ গ্রহণের মত হয়। সূর্য্যালোকে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের যেরূপ অনুভূতি হয়, ইহাদের দর্শনবোধ সেইরূপ আলোক ও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইহার পর দেখা যায় বিভিন্ন কীট ও মেরুদণ্ডহীন জীবের শরীরে আলোকবোধসম্পন্ন কোষগুলি দেহের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ না থাকিয়া বিশেষ এক স্থানে একত্র রহিয়াছে। এই সূক্ষ্ম কোষগুলির চতুষ্পার্শ্বে কালো রঙের এক আবরণ আছে, কেবল উপর দিকে উন্মুক্ত থাকে। তারা মাছ, জেলি মাছ এবং কোন কোন কীটের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনেকখানি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের আলোকানুভূতিশীল স্থানটি চামচের মত নিচু ও বাঁকা, উপরে কাঁচের মত স্বচ্ছ উন্নতোদর, convex লেন্স বসান। আবার পতঙ্গের চক্ষু আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের নয়নদ্বয় বহুসংখ্যক লেন্স লাগান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টিমাত্র, ঠিক মোজেইকের মত। প্রত্যেক চক্ষুর দ্বারা গৃহীত খণ্ড খণ্ড প্রতিচ্ছবি, image একত্র হইয়া ইহাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মায়। এইরূপ নয়নকে যৌগিক নেত্র বলা হয়। এককোষ জীবের সাধারণ আলোকবোধ হইতে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া বর্ণবোধবিশিষ্ট ও আকারজ্ঞান সম্পন্ন মানবনেত্রের উদ্ভব হইয়াছে। বানর ছাড়া আর কোন জীবজন্তুর চক্ষু মানুষের মত সপ্তবর্ণবোধসম্পন্ন নয়, আর সব প্রাণী অল্পাধিক বর্ণান্ধ।

মৌমাছি নীল রঙ বেশ দেখিতে পায় বটে, কিন্তু লাল রঙের বেলায় অন্ধ। অন্যদিকে অতিবেগুনী আলো আমরা মোটেই দেখিতে পাই না, অথচ মৌমাছি যে এই অদৃশ্য আলো অনুভব করিতে পারে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রজাপতি এবং মাছও অতিবেগুনী আলো দর্শন করিতে সক্ষম, যদিও প্রজাপতি নীল ও হলদে ছাড়া অন্য রঙের পার্থক্য বিশেষ বুঝিতে পারে না। কুকুর ও বিড়াল কিন্তু কালো ও সাদা ছাড়া

আর কোন রঙ উপলব্ধি করিতে পারে না, তবে রাত্রির অন্ধকারেও ইহারা বেশ দেখিতে পায়। অধিকাংশ পাখি নীল রঙ একেবারেই অনুভব করে না, কিন্তু ঈগল, চিল, শকুন ও বাজ পক্ষীর সাধারণ দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। ইহারা বহুদূর হইতে শিকারের অস্তিত্ব জানিতে পারে। অপরদিকে বড় বড় মাছ মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত দেখিতে পায় আর ছোট মাছ কেবল এক হাত দূরের জিনিস দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ব্যাঙের সামনে কোন কীটপতঙ্গ যতক্ষণ না নড়ে, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। সাধারণ সব প্রাণীর নয়নদ্বয় দেহের দুই দিকে অবস্থিত। কিন্তু কোন কোন চ্যাপ্টা মাছের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। সোল, হ্যালিবাট প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বামদিকস্থ চক্ষু ক্রমশ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ নেত্রের নিকট চলিয়া আসে। তখন উভয় চক্ষুই দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে।

আমরা এতক্ষণ ইতর প্রাণীর দর্শন শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিলাম, এখন জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিবোধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। মানুষের প্রত্যেক নেত্রগোলক প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। ইহার কার্য্য অনেকটা আলোকচিত্র গ্রহণোপযোগী ক্যামেরার মত। নেত্রগোলক তিনটি স্তরে গঠিত, বহিরাবরণের নাম শ্বেতমণ্ডল, scleroic, উহার নীচে থাকে কৃষ্ণমণ্ডল, choroid এবং সর্বনিম্নে ভিতরের দিকে আছে সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন অক্ষিপট বা রেটিনার অস্তিত্ব। চক্ষুর সম্মুখদিকে নেত্রমণি রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি স্বচ্ছ চর্ম্মগঠিত অচ্ছোদপটল বা cornea আছে। উহার পর রঙিন মাংসপেশী নির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত বৃত্তাকার কনীনিকা বা iris রহিয়াছে। কনীনিকা বা চক্ষু-তারকার রঙ গোষ্ঠী অনুযায়ী কালো, বাদামী, কটা, নীল নানারকম হয়। কনীনিকার অন্তবর্ত্তী ছিদ্রের, pupil-এর আয়তন আলোকের তীব্রতা বা অল্পতা অনুসারে

হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। অন্ধকার ঘরে কাহারও চোখের উপর টর্চের আলো নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় তাহার তারারন্ধ্র সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। কনীনিকার পশ্চাতে জেলির মত জৈব বস্তু গঠিত কাচের মত স্বচ্ছ এক উন্নতোদর লেন্স আছে। তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর টানের তারতম্য অনুযায়ী লেন্সের বক্রতা কমবেশী হয়। কাছের জিনিস দেখিবার সময় লেন্সটি অধিকতর বক্রভাব ধারণ করে আর দূরের বস্তু দর্শনকালে শিথিল হইয়া অপেক্ষাকৃত সমতলভাব গ্রহণ করে। পক্ষীদের ও শীতলরক্ত, মেরুদণ্ডযুক্ত জীবগণের চক্ষুর লেন্স ক্যামেরার অনুরূপ প্রয়োজনমত কাছে আসে বা দূরে যায়। অচ্ছোদপটল ও লেন্সের মধ্যবর্ত্তী স্থান এক প্রকার জলীয় পদার্থে পরিপূর্ণ, এবং লেন্সের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সমস্ত চক্ষু জেলির মত আর একরকম স্বচ্ছ বস্তু দিয়া ভরা। সকলের পশ্চাতে অক্ষিপট বা retina অবস্থিত। অক্ষিপটে আলোক অনুভবের জন্য বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম বায়ুকোষ রহিয়াছে। ঐ স্থানে তিন রকম বায়ুকোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। সর্ব্বনিম্নে আছে শুধু বাদামী বর্ণের এক স্তর, উহার উপর দণ্ডাকার rod ও মোচার cone-এর মত বায়ুকোষের অবস্থান। তাহার পর সাধারণ বায়ু-কোষের দুই শ্রেণী। সকলের উপরকার স্তর হইতে নির্গত স্নায়ুসূত্রসমূহ মস্তিষ্কের পশ্চাতে দৃষ্টিকেন্দ্রে উপনীত হইয়াছে। বেগুণী বর্ণের দণ্ডাকার স্নায়ুকোষসমূহ অতি ক্ষীণ আলোক অনুভব করিবার জন্য গঠিত আর মোচাকার স্নায়ুকোষগুলি বর্ণবোধ উৎপাদন করিবার জন্য নির্ম্মিত।

বাহ্য দৃশ্য ও দ্রব্য হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি প্রথমে স্বচ্ছ আচ্ছোদ-পটলের উপর পড়িয়া তারারন্ধ্রের ভিতর দিয়া লেন্সের মধ্যে গমন করে এবং তথায় বক্রীভূত হইয়া অক্ষিপটে কেন্দ্রীভূত হয়। আলোকরশ্মি বক্রীভবনে অচ্ছোদ-পটলও কতকটা সাহায্য করে। অক্ষিপটে সমস্ত বাহ্যবস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, image পতিত হয়। এই সময় আলোক পতনের ফলে

অক্ষিপটে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক উভয়বিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার জন্য নয়নস্থ স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং এই উত্তেজনা প্রবাহ অন্যান্য স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশে নীত হইয়া আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মায়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সকল উন্নতোদর লেন্সের মত আমাদের চক্ষুর লেন্সও সমস্ত প্রতিচ্ছবি উল্টা-ভাবে ক্ষেপণ করে। কিন্তু আমাদের মন ও মস্তিষ্ক উহা ঠিক সোজা করিয়া গ্রহণ করে।

প্রখর সূর্য্যালোক হইতে কোন অন্ধকার ঘরে আসিয়া আধ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিলে আমাদের চক্ষু প্রায় দশ লক্ষ গুণ অধিক অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া যায়। কোন দর্শনীয় বস্তু নয়নের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলেও উহার প্রভাব অক্ষিপর্দ্দায় '২৫ সেকেণ্ড পর পর্য্যন্ত রহিয়া যায়। চলচ্চিত্রে বহু-ছবি দ্রুতবেগে পর পর দেখান হয় বলিয়া জীবন্ত বোধ হয়। আমাদের চোখের সামনে পাশাপাশি দুইটি দ্রব্যের দূরত্ব এক মিনিট কোণের বেশী কম হইলে আমরা উহাদের পার্থক্য আর বুঝিতে পারি না। চক্ষুগোলকের সহিত কতিপয় মাংসপেশী এমনভাবে সংলগ্ন আছে যে, আমরা সকল দিকে চক্ষু চালনা করিতে পারি। দুই চক্ষু দিয়া সমস্ত দৃশ্য দেখি বলিয়া আমরা সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর নিরেট ভাব ও দূরত্ব সঠিকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। এজন্য এক চোখ বন্ধ করিয়া সূচে সূতা পরান এত কঠিন।

সাধারণ লোকে রামধনুর সাতটি রঙই দেখিতে পায়। বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য '০০০৪ মিলিমিটার আর লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য '০০০৮ মিলিমিটার। এই সীমার বহিরের আলোক-তরঙ্গ আমাদের পক্ষে অদৃশ্য। বেগুনী রশ্মির আগে আছে অদৃশ্য অতি-বেগুনী ও রঞ্জন-রশ্মি আর রক্ত-রশ্মির পরে আছে তাপ-রশ্মি ও রেডিও-তরঙ্গ। সাধারণ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় তিন-চারজন লোক বর্ণান্ধ অর্থাৎ এই সব লোক লাল, সবুজ

অথবা হলদে কিংবা নীল রঙের তফাৎ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। রেলের সঙ্কেতকারী ও ইঞ্জিনচালক এবং জাহাজের নাবিক বর্ণান্ধ হইলে মহা মুশকিল। সেজন্য এই সকল কর্ম্মে লোক নিয়োগের সময় উত্তমরূপে বর্ণবোধ পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাসায়নিক জন ডালটন (১৭৬৬—১৮৪৪) রক্তবর্ণান্ধ ছিলেন। নারী অপেক্ষা পুরুষ বর্ণান্ধ দশগুণ অধিক। সাধারণ সাদা আলো সপ্ত বর্ণের সমষ্টি মাত্র। সুবিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, সূর্য্যের আলো কোন তিন-কোনা কাচের দণ্ডের ভিতর দিয়া আসিবার সময় সাত রঙে ভাগ হইয়া যায়।

আমরা সূক্ষ্ম দর্শনের সময় দুই চক্ষু এমনভাবে চালিত করি যাহাতে বহির্বস্তুর প্রতিচ্ছবি অক্ষিপটের সর্ব্বাপেক্ষা অনুভূতিসম্পন্ন জায়গায় পড়ে। অপর দিকে মস্তিস্ক হইতে স্নায়ুগুচ্ছ নেত্র গোলকের পশ্চাতে যে স্থান দিয়া অক্ষিপটে প্রবিষ্ট হইয়াছে ঐ স্থল অনুভূতিহীন ও অন্ধ।

এখন কয়েক রকম সাধারণ নেত্ররোগের কথা বলা হইতেছে। অদূরবদ্ধ দৃষ্টি বা শর্ট সাইট বলিয়া এক প্রকার চোখের অসুখ আছে, এই রোগে নেত্রগোলক অতিরিক্ত লম্বা হইয়া যায় এবং সেজন্য লেন্স হইতে প্রেরিত প্রতিচ্ছবি ঠিক অক্ষিপটের উপর না পড়িয়া উহার কিছু সামনে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার ফলে দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখায়। এই অবস্থায় নতোদর কাচের concave লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করিলে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়া পাওয়া যায়। আবার আর এক রকম চক্ষুরোগে নেত্রগোলক অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা হইয়া যায়। যাহার জন্য অক্ষিপট লেন্সের কাছে সরিয়া আসে। তখন লেন্স হইতে নির্গত আলোকরশ্মি অক্ষিপটের পশ্চাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অসুখের নাম দূরবদ্ধ দৃষ্টি বা লং সাইট। কারণ ইহাতে কাচের উন্নতোদর লেন্স লাগান চশমা ব্যবহার করিলে রোগীর

স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি লাভ হয়। অচ্ছোদ-পটল সুগোল না হইলে অসমদৃষ্টি বা astigmatism রোগ হয়। এই অসুখে বেলনাকার, cylindrical কাচের লেন্সের চশমা লাগাইলে উপকার হয়। কোন কারণে চক্ষুর লেন্স অস্বচ্ছ হইয়া গেলে দর্শনশক্তি বিশেষ ব্যাহত হয়। চলিত ভাষায় ইহাকে ছানি পড়া বলে। অস্ত্রোপচারের দ্বারা চক্ষুর অস্বচ্ছ লেন্স অপসারিত করিয়া পরে উহার স্থলে কাচের উন্নতোদর লেন্স-সংযুক্ত চশমা ধারণ করিলে দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি অসীমের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। বহু কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রালোক আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই। অপর দিকে কাছের জিনিসের বেলায় দশ বছর বয়সের সময় মাত্র তিন ইঞ্চি দূরের বস্তুও বেশ দেখা যায়। ত্রিশ বৎসর বয়সে সুস্পষ্ট দৃষ্টির নিকটতম দূরত্ব প্রায় ছয় ইঞ্চি। চল্লিশ বছর বয়সে দশ ইঞ্চি দূর হইতে স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করা যায়, পাঠ্য পুস্তক আরও কাছে আনিলে অস্বস্তি বোধ হয়। আসল কথা শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কাছের জিনিস দেখিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যায়। ইহার কারণ, চক্ষুর লেন্স ক্রমশঃ অনমনীয় হইয়া পড়ে, উহার স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া যায় এবং উহা আর আগেকার মত প্রয়োজনানুসারে যথোচিত বক্র হইতে পারে না। পরে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এমন অবস্থা আসে যখন কনভেক্স-লেন্সসম্পন্ন চশমা না পরিলে লেখাপড়া, সূচিকর্ম বা কাছের কাজ সহজ-ভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়।

অবশেষে চোখের যত্ন সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অধিকাংশ চক্ষু-চিকিৎসকের মত, রোজ যদি রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এবং প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পরে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া দুই নয়ন উত্তমরূপে ধৌত করা হয়, তাহা হইলে নানারকম ধোঁয়া, ধূলা ও বীজাণুঘটিত নেত্ররোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পড়িবার সময় কিংবা

কোন রকম সূক্ষ্ম কাজ করিবার কালে এমনভাবে উপবেশন করা উচিত যাহাতে আলোকরশ্মি শরীরের বাঁ পাশ হইতে কিংবা পিছন দিক হইতে আগমন করে। আলোকের ঔজ্জ্বল্য ঠিকমত হওয়া বাঞ্ছনীয়, খুব ক্ষীণ হওয়া যেমন খারাপ তেমনি বেশী তীব্র হওয়াও সমান ক্ষতিকর। সব সময় লেখাপড়ার কাজ দশ ইঞ্চি দূর হইতে করা উচিত। সূর্য্যগ্রহণ পরিদর্শন করিবার সময় কদাচ খালি চোখে একদৃষ্টে তাকান উচিত নয়। এ সময় ধূম্র-কাচ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। খালি চোখে সূর্য্য বা তীব্র বৈদ্যুতিক আর্ক-আলোর দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিলে স্থায়িভাবে অন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে রঙিন চশমা ধারণ করাই নিরাপদ। কোন কারণে নয়নদ্বয় ক্লান্ত বোধ হইলে দুই হাতের তালু দিয়া উভয় নেত্র আবৃত করিয়া দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম লওয়া উচিত, তাহা হইলে শীঘ্রই শ্রান্তি দূর হয়।

আমাদের খাদ্যের সহিত দৃষ্টিশক্তির নিকট সম্পর্ক আছে। আহার্য্যবস্তুর মধ্যে ভিটামিন 'এ'র অভাব ঘটিলে চক্ষু-প্রদাহ এবং রাতকাণা রোগ হয়। পরীক্ষার জন্য একবার একজন সুস্থ সবল যুবকের খাদ্যতালিকা হইতে ভিটামিন 'এ' সম্পন্ন সমস্ত খাদ্যবস্তু চৌত্রিশ দিন ধরিয়া বাদ দিয়া দেখা গেল, তাহার অক্ষিপটে অবস্থিত দণ্ডাকার স্নায়ুকোষগুলির অনুভূতি কমিয়া মাত্র এক-নবমাংশ হইয়া গিয়াছে আর ঐখানকার মোচাকার স্নায়ুকোষের অনুভবশক্তি হ্রাস পাইয়া তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যেই যথেষ্ট ভিটামিন 'এ' তাহাকে প্রদান করা হইতে লাগিল অমনি তাহার দৃষ্টিশক্তি সত্বর স্বাভাবিক হইয়া আসিল। এজন্য কোন্ কোন্ খাদ্যে ভিটামিন 'এ' আছে তাহা আমাদের জানা দরকার। ভিটামিন 'এ' মাছের তেল, ডিম, দুধ, ঘি ও মাখনে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, টোমেটো, গাজর, বাঁধাকপি এবং পালঙাদি সবুজ শাক-

সব্জিতে ক্যারোটিন নামক এক রকম হলদে রঙ আছে উহা উদরস্থ হইলে যকৃতে গিয়া ভিটামিন 'এ'তে পরিণত হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ সামগ্রী নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলেও চক্ষুর জ্যোতি স্বাভাবিক থাকে।

ভারতবর্ষে কমবেশী কুড়ি লক্ষ অন্ধ লোক আছে। এদেশে দৃষ্টিহীনতার প্রধান কারণ বসন্তরোগ, যৌনব্যাধি, যান্ত্রিক আঘাত, আভ্যন্তরিক চক্ষু-চাপ বৃদ্ধি এবং বীজাণু সংক্রমণ জনিত নেত্রক্ষত। আমাদের কর্তব্য এই সব অসুখ ও আঘাতের সম্যক্ প্রতিকার করা এবং প্রয়োজন হইলেই চক্ষু চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনশক্তিই প্রধান। দৃষ্টিশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সকলের সব সময় সেই চেষ্টা করা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Diseases of the Eye, by H Parsons.
2. World of Science, by S. Taylor.
3. Science of Life, by Wells & Huxley.
4. Animal Biology, by Haldane & Huxley.
5. Personality of Animals, by M. Fox.
6. Psychology, by Woodworth.
7. Care of the Eyes, by Kirwan & Sen.

মনের স্বাস্থ্য

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় পনের লক্ষ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক আছে এবং অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণসংখ্যক ব্যক্তির মন কোন না কোন প্রকার আংশিক অক্ষমতায় দুর্ব্বল, অথচ এদেশের সমস্ত মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে মাত্র দশ হাজার রোগীর ব্যবস্থা হইয়াছে, সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান সঙ্কুলান হয় না। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর বিপুল সংখ্যাধিক্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বভাবতঃই ইহার নিবারণ ব্যবস্থার কথা মনে উদয় হয়।

মনোবিকারের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও উন্মাদরোগ এখনও দুরারোগ্য ব্যাধি বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু প্রথম অবস্থায় যে এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিও সহজে নিরাময় হয়, তাহা সাধারণতঃ হৃদয়ঙ্গম করা হয় না। এতদ্ব্যতীত মনোবিকারের সহিত অপরাধপ্রবণতারও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অধিকাংশ অপরাধীই স্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রথম হইতেই যথারীতি প্রতিপালিত হইলে অপরাধী ও উন্মাদ রোগীর যে সংখ্যা হ্রাস হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। ইহা দেশের মধ্যে কম লাভজনক নয়, কারণ অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্মাদ প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনের সূত্রপাত

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আজকাল সকলেই সচেতন হইলেও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই,

কারণ মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটিই যে একেবারে নূতন ; কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের উদাসীন থাকা আর মোটেই কাম্য নয়। সামাজিক জীবনে ইহার প্রভাব সমধিক ও সুদূরপ্রসারী। আমেরিকাতেই ক্লিফোর্ড বিয়ার্স কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ক্লিফোর্ড বিয়ার্স নিজেই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বেশ কিছুদিন ভুগিয়াছিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে অল্পকাল হাসপাতালে অবস্থান করিতে হয়। তদনন্তর সম্পূর্ণরূপে ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া তিনি মনের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সবিশেষ উপলব্ধি করেন এবং ১৯০৭ সালে ডাক্তার এডলফ মেয়ারের সহায়তা ও সহযোগিতায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তৎকালে এই বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থা ছিল বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে মনস্তত্ত্বের বিপুল উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং কিরূপ ব্যক্তিগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মন শান্ত ও সুস্থ থাকে এখন তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশেই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

মানসিক ব্যাধির কারণ

প্রথম উন্মাদরোগের বিবিধ কারণ সমূহ সম্যক্ পর্য্যালোচিত হইলে ইহার নিবারণ ব্যবস্থা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, এই আশায় মানসিক ব্যাধির বিভিন্ন হেতু এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। মনোবিকারের প্রধান কারণ চতুর্ব্বিধ, যথা—মানসিক, শারীরিক, বংশানুক্রমিক ও পারিপার্শ্বিক।

মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকগণের মতে কোন দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা বহুকাল স্থায়ী হইলে, পরিশেষে উহা মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। উদ্বিগ্নতার উদ্ভব নানাভাবে হইতে পারে, পারিবারিক অশান্তি, অথবা

ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ভাবনা, কিংবা জীবিকা-সম্বন্ধীয় দুশ্চিন্তা অনবরত মনকে পীড়িত ও ক্লিষ্ট করিতে থাকিলে পরিণামে স্নায়ু-রোগের আবির্ভাব হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। ইহা ছাড়া সাংসারিক অসন্তোষ, নৈরাশ্য, যৌনজীবন সম্পর্কিত অতৃপ্তি এবং স্বজন-বিয়োগজনিত শোক মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। কোন লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দীনতাজ্ঞান বা অপমানবোধ দীর্ঘকাল মনের মধ্যে চাপা থাকিলে মানসিক সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য এই পৃথিবীতে বাস করিতে গেলে দুঃখ ও দুর্ভাবনা হইতে একেবারে পরিত্রাণ লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও অনেকটাই মনের গঠন ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনার কারণ উপস্থিত হইলে অনেকেই অনিদ্রা, অজীর্ণ, উত্তেজনা, অবসাদ ইত্যাদি নানারূপ উপসর্গ দ্বারা উৎপীড়িত ও ক্লিষ্ট হন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় যুক্তিযুক্ত কর্ত্তব্য, সকল ভাবনা-চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজেকে কোন কাজ, খেলা বা আমোদ-প্রমোদে বিনিয়োগ করা, তাহা হইলেই দুর্ভাবনার প্রকোপ হ্রাস পায়। উদ্বেগ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা জয় করা একান্ত প্রয়োজন।

এদেশে একপ্রকার অলীক দুশ্চিন্তায় বহু ব্যক্তিকে কষ্ট পাইতে দেখা যায়। হাত দেখান এবং কোষ্ঠী-বিচারের ফলে অনেকেই অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীসঞ্জাত দুর্ভাবনায় পীড়িত হন এবং কোন অনাগত এবং প্রায় অসম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা বিপদের কথা ভাবিয়া ভয়-ব্যাকুল হইয়া উঠেন। উক্ত দৈব-দুর্বিপাকের প্রতিকারকল্পে নানারূপ ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ও মাদুলি ধারণ করিয়াও তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। এই উদ্বেগ অবচেতন মনে গিয়া বাসা বাঁধে। সাধারণতঃ জ্যোতিষীরা যে আপদ-বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাহা বাস্তবজীবনে কদাচিৎ সংঘটিত হইতে দেখা যায় এবং প্রকৃত দুর্ঘটনা সমূহ অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ পূর্ব্বাভাস প্রদান না করিয়াই অকস্মাৎ

আগমন করে। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া সকলেরই জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তার সংসর্গ দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিয়া চলা উচিত, তবেই মনের শান্তি ও সুস্থতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আজকাল প্রায় সকলেই জানেন, আমাদের মনের দুইটি ভাগ আছে—বহির্ম্মন ও অন্তর্ম্মন অথবা সজ্ঞান মন ও নির্জ্ঞান মন। কখনও কখনও সজ্ঞান মনে পরস্পর-বিরোধী দুইটি বিপরীত ভাব বা বাসনার দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট) উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বের সমাধানকল্পে যদি কোন ভাব বা বাসনাকে নির্জ্ঞান মনে ঠেলিয়া দিয়া উহার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঐ রুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবের অবদমন (রিপ্রেশ্যান) হইতে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশের উদ্ভব হয়। অবদমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ঐ অবরুদ্ধ ভাবরাশি সাধারণ মনের সহিত একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতে থাকে। মনের এই প্রকারবিভাগ (ডিসোসিয়েশন) কিন্তু মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। খণ্ড-বিখণ্ড বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ উন্মাদরোগের উর্ব্বর ক্ষেত্র। মানসিক সুস্থতার জন্য সমগ্র চিত্তের সমতা ও সংযোগরক্ষা বিশেষ আবশ্যক, কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত অবদমিত ভাব বা কামনা নির্জ্ঞান মনোমধ্যে অজ্ঞাত ও বিচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন নীরবে অধিষ্ঠান করিয়া নানাপ্রকার স্নায়ুবিকারের লক্ষণরূপে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং মনের মধ্যে বিরুদ্ধ চিন্তার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য সকল দিক্ বিচার করিয়া কোন একটিমাত্র ভাব বা অভিলাষকে প্রাধান্য দিয়া গ্রহণ করা এবং অপরটিকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা। ইহার জন্য প্রয়োজন আত্মবোধ ও আত্মজ্ঞানের অভ্যাস। নিজের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের সকল রকম প্রবৃত্তির স্বরূপ জানার শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ দরকারী। মানুষের মনে অনেক সময়ই অসামাজিক ও অযৌক্তিক আদিম বাসনার উদয় হয়। ইহার প্রতিকার উহার অস্তিত্ব অস্বীকার বা

নির্জ্ঞান মনে উহাকে প্রেরণ করা নয়। এক্ষেত্রে উচিত কাজ উহার প্রকৃতি জানিয়া লইয়া সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় উহাকে সংযত করা।

মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

মনকে সুস্থ রাখিতে গেলে বাল্যকাল হইতে নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণ কাজ-কর্ম, স্নান আহার, ব্যায়াম, খেলাধূলা, আমোদ, বিশ্রাম ও নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় রাখা অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ নিয়মিত জীবনযাপন দেহ-মন উভয়ের সুস্থতার পক্ষেই বিশেষ হিতকর। ইহা ছাড়া নিজেকে সকল অবস্থার সহিত মানাইয়া চলার অভ্যাস রাখা বিধেয়। মনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সহিত সামঞ্জস্য বিধান মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের জীবনকে এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করা, যাহাতে লক্ষ্যস্থলে সত্বর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। ইহার জন্য যদি কঠোর আত্মসংযম, প্রচুর ত্যাগ-স্বীকার এবং বহু আয়াস সাধনের প্রয়োজন হয়, তথাপি সে সমস্তই প্রফুল্লচিত্তে বরণ করিয়া লওয়া বিধেয়। মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট সকল রকম বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ মনে করা উচিত। এইরূপ স্থির-লক্ষ্য হইয়া নির্দ্ধারিত কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে তবেই মানুষের শ্রেষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করে এবং জীবন-মন পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে।

যৌন স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি

এখন যৌন স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় দুই-একটি কথা বলিব। এই ব্যক্তিগত বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক। এ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যাইতে

পারে, বিবাহিত দম্পতির পক্ষে অবাধ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য এই উভয় ব্যবস্থাই অস্বাস্থ্যকর। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা যেমন স্নায়বিক অবসন্নতা আনয়ন করে, সেইরূপ প্রবৃত্তির পূর্ণ নিরোধ অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্নায়ুমণ্ডলীর অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বিষয়ে মধ্যবর্ত্তী পথ অনুসরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। অবিবাহিত যুবকযুবতীর পক্ষে অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংযত জীবন যাপন করিলে কোন ক্ষতি হয় না, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যকর। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যাভেলক এলিসের অভিমত যৌবনের প্রারম্ভে জীবনকে যদি ঠিকমত পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে যৌন-প্রবৃত্তি অনেকাংশে শান্ত ও সংযত থাকে। তাঁহার মতে সহজ, সরল জীবনযাত্রা, সাধারণ খাদ্য গ্রহণ, শীতল জলে স্নান, বিলাসিতা ত্যাগ, সমস্ত প্রকার দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা বর্জ্জন, মন্দ সংসর্গ পরিহার, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম সাধন এবং কোন উন্নত বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ ও আত্মনিয়োগ ইন্দ্রিয়-সংযমের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যৌবনারম্ভে তরুণ-তরুণীদের অন্তঃকরণে যখন প্রথম যৌন প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, সেই সময় মধ্যে মধ্যে যৌন স্বপ্ন দর্শন এবং যৌন আত্মতৃপ্তি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। এই সকল ব্যাপার লইয়া উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইবার কিছুই নাই। তবে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই সময় অধ্যয়ন, ক্রীড়া-কৌতুক, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, শরীর চর্চ্চা প্রভৃতি কোন এক বিষয়ে প্রাণশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে স্বভাবতঃই যৌন প্রবৃত্তির উত্তেজনা অনেকাংশে প্রশমিত থাকে।

মনের সমতা-বিধানের উপায়

মনের সমতা বজায় রাখিতে গেলে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি সংযত

হওয়াও বিশেষ দরকার। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক উচ্ছ্বাসে অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত হওয়াও যেমন অস্বাস্থ্যকর, সেইরূপ এই সকল স্বাভাবিক মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলাও অত্যন্ত অন্যায়। অবরুদ্ধ ভাবাবেগ নানারূপ স্নায়ুবিকারের লক্ষণরূপে শেষে প্রকটিত হয়। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আবেগ প্রকাশই মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের সহিত সকল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া চিত্তের দৃঢ়তা ও সুস্থতার পরিচায়ক।

স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ ও উত্তেজনা-নিবারণের উপায় সুনিদ্রা

নিদ্রাই দেহ-মনকে যথার্থ বিশ্রাম প্রদান করে। পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে সাত-আট ঘণ্টা নিদ্রাই প্রশস্ত। সুনিদ্রার অভাব ঘটিলে স্নায়ুমণ্ডলীর অযথা উত্তেজনা বা অবসাদ উপস্থিত হয়। বেশীদিন নিদ্রা-হীনতা স্থায়ী হইলে মানসিক অবসন্নতা আসিতে পারে। সেজন্য অনিদ্রারোগের আশু প্রতিকার আবশ্যক। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান অনিদ্রারোগের উত্তম প্রতিষেধক বলিয়া বিবেচিত। পরিপাক ক্রিয়া যাহাতে অব্যাহত থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। নিস্তব্ধ অন্ধকার গৃহ, মুক্ত বাতায়ন, শ্রান্ত শিথিল দেহ এবং শান্ত অনুদ্বিগ্ন চিত্ত গভীর নিদ্রার সবিশেষ সহায়ক। ইহার সহিত ঘুমাইবার ইচ্ছা থাকিলে গাঢ় নিদ্রা সুনিশ্চিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিদ্রাব্যাধির প্রধান কারণ মানসিক দুশ্চিন্তা। অতএব সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান মনে দুর্ভাবনার কোন কারণ থাকিলে উহা বিদূরিত করা আবশ্যক। ইহার জন্য আত্মবিচারের প্রয়োজন। একটা কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পাইলে কখনও উহা লইয়া বেশী ভাবা উচিত নয়। ঐরূপে করিলে অনিদ্রা ব্যাধির প্রকোপ আরও বাড়িয়া যায়, নিদ্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে

নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করাই অনিদ্রারোগের সর্ব্বোত্তম চিকিৎসা। সাধারণতঃ নিদ্রাল্পতার জন্য কোন ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, নিতান্ত আবশ্যক হইলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে।

মানসিক ব্যাধির প্রকার-ভেদ

মনের রোগ দুই প্রকার : অর্জ্জিত ও বংশানুক্রমিক। কতিপয় মানসিক ব্যাধি বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী এই ছয়জনের ভিতর কাহারও স্থায়ী মনোবিকার থাকিলে কখনও কখনও উহা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করিয়া বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক অক্ষমতা যদি জন্মগত হয় এবং উভয় কুলের পিতামাতার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সন্তান-সন্ততির ভিতর নিশ্চিত উক্ত রোগ যথাকালে পরিস্ফুট হয়। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিবর্গ যাহাতে অযথা বংশবৃদ্ধি করিয়া সমাজের ভার সৃষ্টি করিতে না পারে, তাহার একমাত্র প্রতিকার অস্ত্রোপচারের দ্বারা উহাদের উৎপাদিকাশক্তি চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া সহজসাধ্য এবং এইরূপ অস্ত্রোপচারের ফলে যৌন-শক্তির কোন ক্ষতি হয় না, শুধু প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। আমেরিকায় ইতিমধ্যে জাতির উন্নয়নকল্পে ছাব্বিশটি প্রদেশে জড়বুদ্ধি ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগকে এইরূপে বন্ধ্যা করিয়া দিবার ব্যবস্থা আইনসঙ্গত করা হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মানীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভারতেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিকৃতমস্তিষ্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত উন্মাদ রোগী ও রোগিণীর বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। এই সকল ব্যাপারে যাহাতে কেহ প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে না পারে, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, এ জন্য কোন কোন দৈহিক

ব্যাধি বা শারীরিক বিকারের ফলে মনের রোগ উৎপন্ন হয়। যেমন যৌন-ব্যাধির বীজাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া যদি অধিক দিন অবাধে অধিষ্ঠান করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহারা সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী আক্রমণ করিয়া পরিশেষে জি-পি-আই নামক উৎকট উন্মাদরোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং যৌবনে সকলেরই চরিত্রবান ও সংযত হইবার প্রচেষ্টা করা যে কত আবশ্যক, তাহা একবাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষণিক ভুলের দরুণ যৌন-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে অনতিবিলম্বে সুচিকিৎসার দ্বারা রোগ নিরাময় করা কর্ত্তব্য, মনে রাখা উচিত বর্ত্তমানকালে দ্বিবিধ যৌন-রোগই সহজে বিদূরিত হওয়া সম্ভব।

অতিরিক্ত মদ্যপানও মানসিক ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ। অল্প বা অধিক পরিমাণ সুরা উদরস্থ হইলেই মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং বিবেকবুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে অসাড় হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ সুরাপানে মন ও স্নায়ুর অবস্থা স্থায়ী ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় সকলপ্রকার সুরাসার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়। এ বিষয় কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। ভাঙ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য বেশীদিন সেবন করিলে অধিকাংশস্থলেই স্নায়ুবিকারজনিত মানসিক ব্যাধির আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। সেজন্য সর্ব্বপ্রকার নেশার বস্তু সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রলোভনের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

খাদ্যে ভিটামিন 'বি'র অভাব ঘটিলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। কখনও কখনও ইহার আনুষঙ্গিকরূপে মানসিক লক্ষণসমূহ প্রকটিত হয়। অবসাদ, নিদ্রাল্পতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, চিত্ত-বিভ্রম প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ একে একে আবির্ভূত হয়। অতএব নির্দ্দিষ্ট ভিটামিন শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে গৃহীত হইতেছে কি না, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

থাইরয়েড ও অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের অত্যধিক সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা মনোরোগের প্রকৃষ্ট কারণ। মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিলে কখনও কখনও মনের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ইহা ছাড়া, নিম্নোক্ত সমস্ত কারণে মনোবিকারের সাময়িক আবির্ভাব ঘটিতে পারে :—ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ-জনিত দুর্ব্বলতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, মস্তিষ্ক-ক্ষত, করোটি মধ্যে মাংসগঠন, প্রস্রাব নিরোধ, বৃক্ক-ব্যাধি, ঋতুর প্রারম্ভ ও সমাপ্তিকাল, গর্ভাবস্থা, যৌবনারম্ভ, বার্দ্ধক্য, রক্তাল্পতা, হৃদ্‌রোগ, সর্দ্দিগর্ম্মি ইত্যাদি। উল্লিখিত সকলপ্রকার রোগ ও অবস্থায় প্রয়োজনমত ঔষধ সেবন, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং যথোচিত ব্যায়াম ও বিশ্রামকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ

মানসিক ব্যাধির প্রারম্ভেই যদি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ উন্মাদরোগই সহজে সত্বর নিরাময় হইতে পারে। এই তথ্যটি সকলেরই জানিয়া রাখিয়া মনোবিকারের পূর্ব্বলক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। কিন্তু পাগল কে? ইহার সংজ্ঞা কি? উন্মাদ রোগের এক কথায় পরিচয় প্রদান ও বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ কঠিন কাজ। তবে সহজ ভাষায় পাগল আমরা তাহাকেই বলি যে সমাজের নিকট বিপজ্জনক কিংবা নিজের পক্ষে বিপজ্জনক। সকল উন্মাদরোগীই অল্পাধিক অসামাজিক।

উন্মাদরোগীর সাধারণভাবে সমস্ত মননশক্তি হ্রাস পায়। সে আর ভাল করিয়া চিন্তা বা বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না। তাহার স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা অত্যন্ত অবসন্নতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আবার কোন কোন রোগী সম্পূর্ণ ভাববৈচিত্র্যহীন, নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ ও চরম

উদাসীন হইয়া পড়ে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে নানারকম বিভ্রম, hallucination, illusion, delusion উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে ভুল দর্শন, ভুল শ্রবণ ও ভুল বিশ্বাস বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ভ্রান্ত বিশ্বাস দুই রকমের হয়—অহংসঞ্জাত ও আতঙ্কসঞ্জাত, যেমন—কেহ নিজেকে খুব বড় ভাবে কিম্বা মিথ্যা সন্দেহ করে অপরে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। একই রকম ভাবে আবিষ্ট থাকা, obsession বা যন্ত্রের মত ক্রিয়াশীলতা, stereotyped action প্রকাশ মানসিক ব্যাধির অপর উপসর্গ। মানসিক রোগগ্রস্ত লোকের স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়া যায়। মনের অসুখ হইলে যুক্তিহীনতা প্রায়ই প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত অনিদ্রা বা অত্যধিক সুষুপ্তি মনোরোগের অন্যতম চিহ্ন। শিশুর পৌনঃপৌনিক তড়কা, convulsion হওয়া, পিছনে পড়িয়া থাকা এবং অত্যন্ত অবাধ্যতা করা কখনই স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। বাল্যে চৌর্য্যকর্ম্মে বা মন্দ কাজে অভ্যস্ত হওয়া, সর্ব্বদাই অস্থির থাকা, রাগ, দুঃখ বা ভয়ে বেশী অভিভূত হওয়া অথবা অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া বা দিবাস্বপ্ন দর্শন করা অস্বাভাবিকতার চিহ্ন। কৈশোরে সময়ের আগে যৌনবৃত্তির অতি বিকাশ খুবই দুর্লক্ষণ। সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক-বিলোপ।

এখানে মানসিক রোগের প্রধান ও প্রারম্ভিক লক্ষণ সকল সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। সকলেরই মানসিক ব্যাধির প্রারম্ভিক লক্ষণসমূহ চিনিয়া রাখা উচিত এবং নিজের কিংবা অপরের চিত্তের সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিলেই অবিলম্বে কোন সুযোগ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। ফ্রয়েডের মতে, জীবনে সুখভোগের ক্ষমতা ও কৃতিত্ব অর্জ্জনের শক্তি যতদিন যথেষ্ট থাকে, ততদিন স্নায়বিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে মনে করিতে হইবে।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য-গঠন

এখন শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যগঠনের বিষয় কিছু বলা দরকার। প্রথম হইতেই শিশুদের সদভ্যাস ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় দীক্ষিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন ঠিক সময়ে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, আহার, অধ্যয়ন, স্নান, ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুক এবং নিদ্রাগমনে তাহাদের অভ্যস্ত করান বিধেয়। শিশুদের প্রতি কখনও অতি যত্ন ও অযত্ন, অতি মনোযোগিতা বা অবহেলা প্রদর্শন করিতে নাই। স্নেহ ও দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষাদান করা উচিত। শিশুদের বেশী শাসন করা যেমন অন্যায়, অতিরিক্ত আদর দেওয়াও সেইরূপ অসঙ্গত। সকল ক্ষেত্রেই মধ্যবর্ত্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আদর্শ কর্ম্ম। শিশুর সুকুমার মনে কখনও ভূত-প্রেতের ভয়, চোব-ডাকাতের ভয়, আগুনের ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় বা অন্য কোনপ্রকার অসঙ্গত ভীতির বীজ বপন করিতে নাই। ঐরূপ করিলে সে বড হইয়া প্রায়ই ভীত ও দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া দাঁড়ায়। শিশুর কোমলচিত্তে সকল সময়ই যুক্তিপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর এবং দৃঢ় সংস্কাররাশির ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস কবা আবশ্যক। শিশু ভবিষ্যতে যাহাতে সকল অবস্থায় আত্মনির্ভরশীল হর এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা চলিতে পারে সেইরকম ভাবে তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা উচিত। শিশুর চরিত্রগঠন এমন সুসঙ্গত ও সুষম হওয়া দরকার যাহাতে পরিণত বয়সে সে অতিরিক্ত অহংভাবাপন্ন ও আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া না দাঁড়ায়, আবার একেবারে আত্মবিশ্বাসহীন পরনির্ভরশীল হইয়াও না পড়ে।

গীতায় স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ

আমরা এতক্ষণ দেখিলাম স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ সুস্থ শরীরে সুস্থ মন mens sana in corpore sano—অসুস্থ শরীরে সুস্থ মন, কিংবা

সুস্থ শরীরে অসুস্থ মন—ইহার কোনটি সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় নয়। সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন-যাপন দেহ-মন উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। এ বিষয়ে ভগবদ্গীতার আদর্শ সকলের অনুসরণীয়। গীতার কতিপয় শ্লোকে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, যেমন :

"যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মপ্রচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন।"

"জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধক, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়।"

"ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই সাত্ত্বিক।"

"শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে।"

—বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Text Book of Psychiatry, by Henderson & Gillespie. 2. Mind & Its Disorders, by Stoddart. 3. Abnormal Psychology, by William Macdougall. 4. Introductory Lectures on Psycho-Analysis, by Sigmund Freud. 5. Psychology of Sex, by Havelock Ellis. 6. Psychology of Insanity, by Bernard Hart. 7. Common Neuroses, by T. A. Ross. 8. "Indian Association for mental Hygiene," edited by Col Berkeley Hill. 9. Digest of Neurology & Psychiatry, edited by C. Burlingame. 10. The Practice of Medicine, edited by Price. 11. Early Mental Disease, Lancet Number.

মনের শক্তি

যাহা দ্বারা আমরা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ও স্থান কালের সহিত পরিচিত হই এবং সংযোগ রক্ষা করিয়া চলি এবং যাহার বলে আমরা চিন্তা করিতে, স্মরণ করিতে, যুক্তি করিতে, ভাবানুভাব করিতে, সঙ্কল্প করিতে এবং সজ্ঞান ও নির্জ্ঞানভাবে ইচ্ছা করিতে সক্ষম হই, তাহাকেই মন বা চিত্ত বলা হয়। আমাদের মন প্রধানতঃ মস্তিষ্ক, স্নায়ুসূত্র ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। মানুষের মন আশ্চর্য্যরকম কর্ম্মশীল। এই প্রবন্ধে মনন-শক্তির সাধারণ ক্রিয়া আলোচনা না করিয়া উহার অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ এ সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

দেহের উপর মনের প্রভাব

মনের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, ভয়, কাম, উদ্বেগ, দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি কোন এক ভাবের উদয় হইলে তাহার ফলে কিরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয় যখন কোন সম্মোহনকারী, hypnotist সম্মোহিত ব্যক্তির মনের মধ্য দিয়া তাহার দেহযন্ত্রকে প্রভাবিত করেন। সম্মোহকের আজ্ঞানুসারে সম্মোহিতের হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত কিংবা মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। উপযুক্ত অভিভাবের, suggestion-এর দ্বারা তাহার দেহে ঘর্ম্মের সঞ্চার করা যাইতে পারে, এমন কি আদেশ দিয়া আবিষ্ট ব্যক্তির দেহতাপ পর্য্যন্ত বাড়ান বা কমান সম্ভব হয়।

হৃদ্‌স্পন্দন, তাপনিয়ন্ত্রণ, গ্রন্থিরস-নিঃসরণ, শোণিত সঞ্চালন প্রভৃতি

দৈহিক কার্য্য সাধারণ মানুষের মোটেই স্বেচ্ছাধীন নয়।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রযোজকের, operator-এর অভিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে বশীভূত ব্যক্তির দেহে ফোস্কা পর্য্যন্ত পড়িতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার লয়েড টাকী একবার কোন সম্মোহিত ব্যক্তির দেহে ডাকটিকিট লাগাইয়া দিয়া বলেন, 'তোমার শরীরে তপ্ত লোহার ছেঁকা দেওয়া হইল।' ইহার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সত্য সত্যই ঐ স্থানে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ডেলবিউফ আর একটি অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। তিনি প্রথমে দুইজন লোকের দুই হাতের কিয়দংশ ঠিক সমান করিয়া পোড়াইয়া দিলেন। একজনের ক্ষত স্থানের কোন চিকিৎসা না করিয়া তিনি উহার ভার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অন্য লোকটিকে সম্মোহিত করিয়া তিনি অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন যে তাহার হাতের ক্ষত শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখিলেন যে এই ব্যক্তির ক্ষত অপর ব্যক্তির হাতের ক্ষত অপেক্ষা শীঘ্র ও সহজে সারিয়া গেল।

মৌখিক আদেশের দ্বারাই সম্মোহিত লোকের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শানুভূতি অসম্ভব রকম বর্দ্ধিত হয়। প্রয়োগকর্ত্তা সম্মোহিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ইচ্ছামত প্রখর অনুভূতিপ্রবণ বা অল্পানুভূতিসম্পন্ন করিতে পারেন। এমন কি তাহার স্পর্শানুভূতিকে আদেশের দ্বারা একেবারেই লোপ করিয়া দেওয়া যায়। ক্লোরোফর্ম্ম আবিষ্কারের পূর্ব্বে কোন কোন অস্ত্র-চিকিৎসক সম্মোহনের দ্বারা রোগীকে অচেতন ও অসাড় করিয়া নির্ভয়ে তাহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতেন।

এতদ্ব্যতীত নানা রকম অসুখ, ব্যথা, বেদনা, শ্বাসকষ্ট, পরিপাকযন্ত্রের গোলযোগ, সামান্য জ্বর, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধি রোগীর সম্মোহিত অবস্থায় নিরাময় করা যায়। কারণ, এই অবস্থায় তাহার

মন অত্যন্ত নিবিষ্ট ও বিশ্বাসপূর্ণ থাকে। বলা বাহুল্য প্রকৃতপক্ষে রোগীর নিজের মনই তার রুগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ করিয়া তোলে, সম্মোহনকারী চিকিৎসক কেবল তাহার জীবনী-শক্তিকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অতিশয় জাগ্রত ও একাগ্র করেন মাত্র।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনই সমগ্র দেহ-যন্ত্রকে পরিচালনা করে। সম্মোহিত অবস্থায় নির্জ্ঞান মনের সহিত সোজা-সুজি যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া এই সময় যেরূপ আদেশ দেওয়া হয়, রোগীর নির্জ্ঞান মন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়া দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। ইউরোপে ফ্রান্সে এমিল কুএ (১৮৫৭-১৯২৬) এই দিকে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা করেন। তাঁহার মতে সজ্ঞানে যদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা যায় যে, 'আমি দিন দিন সব দিকে উন্নতিলাভ করিতেছি' তাহা হইলে এই স্বাস্থ্যকর চিন্তাধারা ক্রমশঃ নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করিয়া শরীরকে সত্বর সুস্থ নীরোগ করিয়া তোলে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায় অপরের সাহায্যে নিজের মন দিয়া শরীরকে প্রভাবিত করা সম্ভব, এমন কোন কথা নাই। স্বচেষ্টায় দেহযন্ত্রকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকের মনের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগে' লিখিয়াছেন—

'খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে না পারেন, হৃদয়যন্ত্র তাঁহার ইচ্ছামত বন্ধ অথবা চালিত হইতে পারে—শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরি-চালিত করিতে পারেন।'

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একজন শক্তিশালী হঠযোগীর ক্রিয়া-কৌশল

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ইচ্ছামত নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের গতি বন্ধ অথবা চালিত করিতে পারিত। অন্ত্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম এমন যোগীও জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এক্স-রে ফোটোর সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন অন্ত্রের গতি বিপরীত দিকে চালনা করাও যৌগিক ক্রিয়ার অন্তর্গত।

প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম ম্যাকডুগাল একস্থানে বলিয়াছেন, দৈবাৎ কখনও এমন লোকও দেখা যায় যাহার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাধীন। অপর কেহ কেহ আবাব শরীরের অংশবিশেষে রক্তসঞ্চার নিয়ন্ত্রণ কবিতে সক্ষম। ডাক্তার ম্যাকডুগাল এই প্রকার একজন শক্তিধর লোককে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ইচ্ছামত নিজেকে এমন এক সমাধির অবস্থায় আনিতে পারিত, যখন তাহার বাম হস্ত সম্পূর্ণ রক্তহীন হইয়া পড়িত, এমন কি তখন উহাতে একটি মোটা সূচ বিদ্ধ কবিয়া দিলেও মোটেই রক্তপাত হইত না। মানুষের অভ্যাস ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব কতদূর হইতে পারে, এই সকল ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

মনের উপর মনের প্রভাব

আমরা সাধারণতঃ কথা কহিয়া, চিঠি লিখিয়া বা আভাস ইঙ্গিত করিয়া অপরের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু কখনও কখনও ইহা দেখা যায় যে, চক্ষু কর্ণ, চর্ম্ম প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও একজনের মনের ভাব অপরের মনে কোন এক অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় উপায়ে সঞ্চারিত হয়। কাকতালীয় ঘটনার কথা বাদ দিলেও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির, extra-sensory percepion-এর অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি কেহ খুব একাগ্রমনে কোন বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং আর একজন ঠিক সেই সময় নিজের মনকে

অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ও চিন্তাশূন্য করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে এক এক সময় প্রথম ব্যক্তির মনের ভাব দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে প্রবেশ করে। চিন্তা-চালনার ইহাই সাধারণ ব্যাখ্যা।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ চিন্তাচালনা সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটি Nature নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। একদিন সন্ধ্যা বেলায় দুইজন 'প্রেরক' একজন 'গ্রাহকে'র মনে কয়েকবার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর ছবি সাফল্যের সহিত সঞ্চারিত করিবার পর তিনি (লজ) সেই ঘরে সাবধানে একটি পুরু কাগজ আনিলেন। এই মোটা কাগজের একদিকে একটি চতুষ্কোণ এবং অন্যদিকে একটি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তিনি দুইজন প্রেরকের মাঝখানে এই কাগজখানি এমনভাবে স্থাপন করিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের দিক ছাড়া অন্য দিকে কি আছে তাহা জানিতেও পারিল না। ইহার পর প্রেরক দুইজন যথাক্রমে চতুষ্কোণ ও ক্রশের উপর মনঃসংযোগ করিল এবং দূরে উপবিষ্ট চোখবাঁধা গ্রাহকটি পূর্ব্বের মত মনঃস্থির করিল। লজ মনে করিলেন, এই উপায়ে এক জনের উপর দুইজনের পৃথক চিন্তাধারার কিরূপ প্রভাব, তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিছুক্ষণ পরে গ্রাহককে তাহার মনের ভাব লিখিয়া জানাইতে বলা হইল। সে প্রথমে একটি চতুষ্কোণ আঁকিয়া তাহার মধ্যে ক্রশ চিহ্নটি স্থাপন করিল।

এবার আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাপাঠকের কথা বলিব। ইঁহার নাম জোসেফ ডানিঙ্গার, বর্ত্তমান বয়স তিপ্পান্ন। ইনি একজন যাদুকর ও সম্মোহনকারী, বাল্যকাল হইতেই অলৌকিক অনুভূতির অধিকারী। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দুইবার তাঁহাকে ওয়াশিংটনে লইয়া যান। ডানিঙ্গার প্রথমে রুজভেল্টের মনের কথা এইভাবে বলেন, "আপনি ভাবিতেছেন, পরের প্রেসিডেণ্ট কে হইবেন, হ্যামি ফিস্ না হিউ লঙ ?" রুজভেল্ট

হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক তাই।' তদনন্তর ডানিঞ্জার কোষাধ্যক্ষ মর্গেনথ-এর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনার পকেটে এত নম্বরের একটি পাঁচ ডলারের বিল আছে। মর্গেনথ বিলটি বাহির কহিলেন, 'আপনার কথাই ঠিক।' অতঃপর ডানিঞ্জার সেক্রেটারী হালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ভাবিতেছেন, 'আমি যদি আমার স্ত্রীর মনের কথা এই রকম জানিতে পারিতাম'।" হাল বলিলেন, 'নির্ভুল উত্তর।' বৈজ্ঞানিক এডিসন ডানিঞ্জারকে কয়েক বার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও এ রকম অদ্ভুত ও অসম্ভাব্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নাই।'

স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় মনোবিশ্লেষণের সময় কখনও কখনও ডাক্তারের মনের কথা রোগী আশ্চর্য্যভাবে বলিয়া ফেলে। ফ্রয়েড এইরূপ এক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় ভীতিজনক স্বপ্ন, nightmare সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময় তাঁহার চিকিৎসাধীন এক রোগী অকস্মাৎ 'নাইটমেয়ার' কথাটি সম্পূর্ণ অকারণে উচ্চারণ করিয়া বসে। ফ্রয়েড এই ঘটনাকে অতীন্দ্রিয় বোধশক্তির এক উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পর্কে এতক্ষণ কেবল কতিপয় বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথাই বলা হইতেছিল। আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়েব মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক জোসেফ রাইন, পি-এইচ-ডি মহোদয় এই সকল আকস্মিক অনির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আবোপ না করিয়া গবেষণাগারে সংখ্যাবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পর্কিত ব্যাপক পরীক্ষা সম্পাদন করেন। ইংলণ্ডেও মিষ্টার টাইরেল অনুরূপ পরীক্ষা করিয়া সমান সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের পরীক্ষা প্রণালী এইরূপ—পাঁচরকম ছবি আঁকা তাস পরীক্ষক পর পর তুলিয়া রাখেন আর অন্তরাল হইতে ব্যক্তিবিশেষকে আন্দাজ করিতে হয়, কোন্ ছবি কখন

উঠান হইল। অথবা পাঁচটি বাক্সের মধ্যে কোন্ বাক্সে নির্দ্দেশক বস্তুটি পরীক্ষক তাহার অজ্ঞাতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিতে বলা হয়। এস্থলে বলা প্রয়োজন গণিতের সম্ভাব্য ঘটনা, probability or chance অনুসারে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় পাঁচবার চেষ্টার ফলে একবার সাফল্যলাভ করা অর্থাৎ শতকরা ২০ বার কৃতকার্য্য হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়, বরং উহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বহু পরীক্ষাতেই শতকরা ২৪ বার সফল হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা স্বাভাবিক সম্ভাবনা, probability অপেক্ষা শতকরা চার ভাগ অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে সফলতার এই যৎসামান্য আধিক্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিশ্চিত প্রমাণ।

অন্য আর এক প্রকার পরীক্ষায় ব্যক্তিবর্গের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্দ্ধারণ করা হয়। এস্থলে তাহাদিগকে স্থাপনের পূর্ব্বেই অনুমান করিতে হয় পরীক্ষক কোন্ বাক্সে নির্দ্দেশক বস্তু রক্ষা করিবেন। যন্ত্রকৌশলের এমন ব্যবস্থা থাকে যে, পরীক্ষক নিজেও জানিতে পারেন না, তিনি কোথায় বিশেষ বস্তুটি রাখিবেন। এক্ষেত্রেও সাধারণ সম্ভাবনা অপেক্ষা শতকরা চার ভাগ অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষায় সাধারণ লোকের যে যৎসামান্য ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জড়বস্তুর উপর মনের প্রভাব

অধ্যাপক রাইনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব জড় পদার্থের উপর মানুষের মনের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার। প্রাচীনকাল হইতেই লোকের বিশ্বাস জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি-সঞ্চার সম্ভব। এইরূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিক্ষিপ্ত বিবরণ সকল দেশেই অল্প-সল্প পাওয়া যায়। Paul Brunton নামক ছদ্মনামধারী ইংরাজ লেখক তাঁহার পুস্তকে পুরীতে কোন যাদুকরের নিকট তিনি যে আঙটির নৃত্য দেখিয়া অবাক্

হইয়াছিলেন, তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বহু পরীক্ষা ও বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও কোন সূক্ষ্ম সূত্র বা কেশের অস্তিত্বমাত্র পান নাই। তৈলঙ্গ-স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও অন্যান্য অনেক ভারতীয় যোগীর জীবনীতে জড়ের উপর মানসিক শক্তি-প্রয়োগের বিবরণ পাওয়া যায়।

১৯৩৪ সাল হইতে অধ্যাপক রাইন জড়বস্তুর উপর সাধারণ লোকের মনের কোন প্রভাব আছে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। তিনি দেখিলেন, কোন কোন জুয়াড়ীর বিশ্বাস যে, পাশা খেলিবার কালে মনঃশক্তি প্রয়োগ করিলে কখনও কখনও ঈপ্সিত ফল লাভ হয়। তিনি উহাদের এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কি না স্থির করিতে মনস্থ করিলেন। অক্ষ-ক্ষেপণের সময় যাহাতে হস্তকৌশলের কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহার ভাল ব্যবস্থা করা হইল। গবেষণাগারে একটি হেলান তক্তা স্থাপন করিয়া উহার উপর দিকে একটি ক্ষুদ্র দরজার পশ্চাতে পাশা রাখা হইল। এই দরজাটি তুলিলে তবেই পাশা তক্তা দিয়া গড়াইয়া নিম্নে পতিত হইত। ইহার পর বহুসংখ্যক লোকের উপর পরীক্ষা করা হইল। যখনই তাহারা পাশার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উপর মনঃসংযোগ করিত তখনই গণিতের সাধারণ সম্ভাবনা অপেক্ষা পাশার সেই অঙ্কে পতন বেশী দেখা যাইত। পুনরায় অন্য সংখ্যার উপর মনঃশক্তি একাগ্র করিলে পাশার পতনও সেই অঙ্কে অপেক্ষাকৃত অধিক হইত। সহস্র সহস্র বার পরীক্ষা করিয়াও ফলের কোন ব্যতিক্রম হইল না। রাইন ইহাও দেখিলেন, তাঁহার লোকেরা যখন খুবই উৎসাহ এবং একাগ্রতার সহিত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, তখন সফলতার অনুপাতও রীতিমত বর্দ্ধিত হয়। অধ্যাপক রাইন জড়ের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের নাম দিয়াছেন psycho-kinesis বা সংক্ষেপে p. k.। তাঁহার যুগান্তর আনয়নকারী এই গবেষণা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুশীলনের দ্বারা

মনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং আলৌকিক ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার কোন নিশ্চিত উপায় এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান এখানে নীরব। হয়ত আমাদের প্রাচীন ভারতীয় যোগশাস্ত্র এক্ষেত্রে প্রচুর আলোকপাত করিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Science of Life, by Wells & Huxley.
2. Conscious Auto-suggestion, by Coue.
3. Survival of Man, by Oliver Lodge.
4. 'Secret of Luck' by John Murphy. Published in "Read," March, 1944.
5. Readers' Digest—January, 1945.
6. Digest of Neurology & Psychiatry, edited by Burlingame—May, 1949.
7. Abnormal Psychology, by McDougall.
8. Lectures on Psycho-Analysis by Freud.
9. Mind & Its Disorders, by Stoddart.
10. Telepathy & Medical Psychology, by Ehrenwald

মনের কথা বলা

শরীর ও মন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্ঘবদ্ধ। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সহিত সূক্ষ্ম দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অল্পাধিক শারীরিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। মনের সহিত মস্তিষ্ক, স্নায়ুসূত্র, মাংসপেশী ও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে যে কাম, ক্রোধ, ব্যথা, ভয় এবং উদ্বেগ ও উত্তেজনা সমুৎপন্ন হইলে সেই সঙ্গে মানুষের স্নায়ুস্রোত, শোণিত সঞ্চলন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক কার্য্য ও অন্তঃকরণের হ্রাস বৃদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়। নানারকম সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য বিস্ময় বা ভয় উদিত হইলে মানব-শরীরে বৈদ্যুতিক বাধার যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা বিদ্যুৎমাপক যন্ত্রের দ্বারা নিরূপণ করা যায়। কথা কহিবার সময় জিহ্বায় বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এমন কি কেহ যদি মনে মনে নিঃশব্দে গণনা করে অথবা কোন কবিতা আবৃত্তি করে তাহা হইলেও জিহ্বাগ্রে ক্ষীণ বিজলীস্রোতের অস্তিত্ব গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে আবিষ্কার করা যায়। যদি কোন লোক হস্ত আন্দোলনের কল্পনা মাত্র করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বাহুর পেশীতে বিদ্যুতের আবির্ভাব হয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন সুখ, দুঃখ, বিরাগ, বিস্ময়, আতঙ্ক, লজ্জা, গর্ব্ব— এই সকল আবেগ উচ্ছ্বাসের উদয় হইলে মানুষের কি রকম ভাবান্তর হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন লোকের মৌখিক ভাবভঙ্গী, সাধারণ ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও হাতের লেখা হইতে তাহার মনের কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের চিন্তাধারা কতদূর দৈহিক মাংসপেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে। এক বিঘৎ লম্বা সূতায় একটি আঙটি অথবা অন্য কোন বস্তু বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়।

সুতার এক প্রান্ত আঙ্গুলে ধরিয়া যদি মনে মনে চিন্তা করা যায় দোলকটি পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে দুলিতে থাকিবে তাহা হইলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই উহা ঐভাবে আন্দোলিত হইতেছে। যদি ইচ্ছা করা যায় উহা অন্য দিকে গোল হইয়া ঘুরিবে তবে তাহাই হইতে থাকে। বলা বাহুল্য ধারক সজ্ঞানে বা স্বেচ্ছায় দোলকটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবার কোন চেষ্টাই করে না, তাহার অজ্ঞাতসারেই উহা দুলিতে থাকে। এক্ষেত্রে তাহার অবচেতন মনই স্নায়ু ও মাংসপেশীর মধ্য দিয়া হস্তস্থ সূত্রটি চালনা করে।

মানুষের আচরণ হইতে তাহার চিন্তাধারা কতদূর অনুধাবন করা যায় তাহা ডাক্তার ডাটনার নামক একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি একবার এক রেস্তোরাঁয় 'এইচ' নামক এক পি-এইচ-ডি উপাধিধারী সহকর্ম্মীর সহিত ভোজন করিতেছিলেন। আহারকালে সেই বন্ধুটি বলিলেন,—'এক সময় আমি চিলি রাজ্যের অতিরিক্ত মন্ত্রী বা রাজদূতের সহকারীরূপে কর্ম্ম করিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মন্ত্রী অন্যত্র বদলি হইয়া চলিয়া যান এবং আমিও তৎস্থলাভিষিক্ত নবনিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন চেষ্টাই করি নাই'—এই কথা বলিবার সময় তিনি যে খাদ্যবস্তু মুখে তুলিতে-ছিলেন তাহা হঠাৎ ফসকাইয়া পড়িয়া গেল। ডাঃ ডাটনার এই ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সহসা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সন্ধান পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন—'আপনি সেইজন্য আপনার মুখের গ্রাস হারাইলেন।' বন্ধুটি তখনই তাহা স্বীকার করিলেন এবং কিরূপে তিনি নিজের দোষে ঐরূপ উত্তম পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এস্থলে কর্মচ্যুতির চিন্তা রূপকরূপে খাদ্যচ্যুতির আকারে প্রকটিত হইয়াছিল।

এখন মানুষের মনের কথা কি রকম করিয়া বলা যায় তাহার রহস্য

উদ্ঘাটিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ইচ্ছাশক্তি ও মনোপঠনের সাহায্যে ক্রীড়া প্রদর্শন খুবই প্রচলিত ছিল। প্রথমে স্থির করা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার পর মনোপাঠকের চক্ষুদ্বয় রুমাল দিয়া বাঁধিয়া সেই ঘরে আনা হইত। তদনন্তর লুক্কায়িত বস্তু বা অভিপ্রেত ব্যক্তির সন্ধান জানে এ রকম আর একজন মনোপাঠকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইত। এই লোকটিকে চিন্তা সঞ্চালক বলা হইত। সে একাগ্র মনে কেবল ইচ্ছা করিত মনোপাঠক যেন ঠিক জায়গায় গিয়া উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। যদিও সজ্ঞানে কোনরূপ আভাস ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করা হইত না, তৎসত্ত্বেও প্রায়ই দেখা যাইত মনোপাঠক ঈপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে। আসল কথা, চিন্তাসঞ্চালকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাহার মনোভাব অনুযায়ী হস্তস্থ মাংসপেশীর চাপ বা টানের যে তারতম্য হইত, তীক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনোপাঠক তাহা বুঝিয়া লইয়া ঠিক পথে গমন করিত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই সময়কার এরকম একটি ঘটনা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— একদিন আহারের পর সে বাড়ীর মেয়েরা আমাকে এক খেলা দেখাইলেন, একটি মেয়ে আমাকে পাশের এক ঘরে লইয়া গিয়া রুমাল দিয়া আমার দুই চক্ষু বাঁধিয়া বলিলেন, 'তোমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাচ্ছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, নিজে একটু কিছু ইচ্ছা রাখবে না, তারপর চলতে ইচ্ছা হলে চলবে, কিছু করতে ইচ্ছা হলে করবে, তাতে বাধা দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাকব মাত্র।' এই বলিয়া মেয়েটি আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমাকে বৈঠকখানায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল এবং নিজে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত দিয়া রহিল। আমি যথাসাধ্য মনটা নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলাম। ক্রমে চলিতে

ইচ্ছা হইল, অগ্রসর হইলাম, হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হইল, হাত বাড়াইলাম, একটা চেয়ারেব উপব হইতে একখানা কাপড় তুলিতে ইচ্ছা হইল, তুলিলাম, অমনি চারিদিক হইতে করতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন খুলিয়া শুনি, সেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে চোখ-বাঁধা মানুষটি আসিলে তাহা দ্বারা ঐ কাপড়টি তুলাইতে হইবে এবং আমি ঘরের ভিতর আসিলে সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিলেন। অবশ্য যে মেয়েটি আমার পশ্চাতে ছিল, সেও ঐ বিষয় জানিত এবং সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমি যে বিষয়ে কিছুই জানিতাম না সেরূপ কাজ আমাদ্বারা হইল, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম।

বিগত শতাব্দীতে কাম্বারলাণ্ড ও বিশপ নামক দুইজন বিখ্যাত ইংরাজ চিন্তাপাঠক ছিলেন। এখানে কেবল বিশপ সাহেবের ক্রিয়াকৌশলের বিবরণ প্রদত্ত হইল। রোমানিস বলিয়া এক পর্য্যবেক্ষক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'নেচারে' এই ঘটনার কথা প্রকাশ করেন। তিনি প্রথমে বিশপকে গৃহের বাহিরে আনিয়া নীচেকার হলঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার দুই চক্ষু ভাল করিয়া বাঁধিলেন। যখন তিনি এই কাজ করিতেছিলেন, তখন সিজউইক নামক অপর ভদ্রলোক উপবেশন কক্ষের মেঝেতে গালিচার নীচে, একটি ছোট জিনিস লুকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর রোমানিস বিশপকে পুনরায় উপরতলায় লইয়া গিয়া সিজউইকের হাতে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর বিশপ সিজউইকের বাম হাত লইয়া নিজের কপালের উপর স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যেন এক মনে যে স্থানে বস্তুটি লুকান আছে, সেই জায়গার কথা অনবরত চিন্তা করিতে থাকেন। প্রায় দশ সেকেণ্ডকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর বিশপ সহসা ঘুরিয়া সিজউইকের সঙ্গে সোজা একদিকে চলিয়া আসিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানের কার্পেট তুলিয়া গুপ্ত

দ্রব্য বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার সাফল্য অতীব আশ্চর্য্যজনক বোধ হইয়াছিল।

সম্প্রতি লুই নাইজার বলিয়া একজন আমেরিকান আইনজীবী তথাকথিত চিন্তাপঠন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। কোন জায়গায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার মনের কথা বলার কৌশল দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার সন্দেহ হয়। মনঃসংযোগকারীর চিন্তানুযায়ী হয়ত তাহার হাতের স্পর্শ বা চাপের এমন কোন পার্থক্য সূচিত হয় যাহাতে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সঠিক পথে যাইবার নির্দ্দেশ পায়। তিনি এই ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার এক ভাইকে ঘরের ভিতরকার কোন বস্তুর বিষয় একাগ্রমনে চিন্তা করিতে ও মানসিক নির্দ্দেশ দিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ পরে নাইজার নিজের ভাইয়ের হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যেই ভুল পথে যাইবার চেষ্টা করিলেন অমনি ভ্রাতৃ হস্তের সুস্পষ্ট চাপ অনুভব করিলেন। তাঁহার একাগ্রতা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই হাতের টানে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঘরের তিন পাশ ছাড়িয়া কেবল একদিকে দেয়ালের কাছে যাইবার একটা প্রচেষ্টা হইতেছিল। অবশেষে যখন নাইজার নির্দ্দিষ্ট বস্তু স্পর্শ করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতৃহস্তের সম্মতিসূচক মৃদু পেষণ অনুভূত হইল। যদিও সে বেচারী সজ্ঞানে বা স্বেচ্ছায় কোনরকম ইঙ্গিত প্রদান করে নাই। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তাহার মনোভাব মাংশপেশীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। নাইজার বলেন, অনেকেই এই পরীক্ষায় প্রথম হইতেই সাফল্যলাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে ইতরপ্রাণীদের সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। কোন কোন জীবজন্তু মানুষের মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। জার্ম্মানীতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হান্স নামক একটি ঘোড়ার কথা জানা যায়। তাহার মনিব তাহাকে এতদূর সুশিক্ষিত করিতে সক্ষম হন

যে, প্রকাশ, সে নাকি পাটীগণিতের সমস্ত অঙ্কের উত্তর সম্মুখের দুই পা দিয়া ঠুকিয়া বলিয়া দিতে পারিত। এক পা দিয়া সে এককের সংখ্যা ব্যক্ত করিত আর অন্য পায়ের সাহায্যে দশকের সংখ্যা নির্দেশ করিত। কখনও কখনও প্রশ্নগুলি মুখে না বলিয়া কাগজে লিখিয়া শুধু তাহাকে দেখাইয়া দিলেও পদদ্বয়ের সাহায্যে সে উত্তর দিতে পারিত। প্রথমে সকলের ধারণা হইয়াছিল অশ্বের প্রতিপালকই বুঝি বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদধ্বনি হইয়া যাইবার পর থামিবার জন্য তাহাকে কোনরূপ গোপন সঙ্কেত করেন। কিন্তু প্রভুর অনুপস্থিতিতে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সম্মুখেও ঘোড়াটি যখন পাটীগণিতের প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে লাগিল, তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনেক পরে আসল রহস্য প্রকাশ পাইল। দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘোড়া, পা ফেলিবার সময় প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদধ্বনির পর সঠিক উত্তর হইবামাত্র প্রশ্নকর্ত্তার অজ্ঞাতসারে তাঁহার শরীর ও মুখের ভাবের যে পরিবর্ত্তন সূচিত হয়, ঘোড়াটি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পা ফেলা বন্ধ করে। ঐ ঘোড়া কেবল পরীক্ষকের জন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইত, তাঁহার অজানা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সে পারিত না। তখন সে ভুল করিত। তথাপি দেখা যাইতেছে ঘোড়ার মত চতুষ্পদ জন্তুও কতখানি সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক অবস্থা কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Expression of Emotions In Man And Animals, by Darwin. 2. Psychopathology of Every day Life, by Freud. 3. Psychical Research, by Barrett. 4. Science of Life, by Wells & Huxley. 5. Psychology, by Woodworth.

চিন্তা-চালনা ও অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি

রেডিও, টেলিগ্রাফ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমরা দূরদেশে নিজের মনোভাব সহজে প্রেরণ করিতে পারি। কিন্তু কোন রকম যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও চিন্তা-চালনা, thought transference করা যায় এবং দূরবর্ত্তী লোক সময় সময় এই চিন্তা-প্রবাহ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। এই ব্যাপারকে দূরানুভব বা telepathy বলা হয়। একই ঘরে দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনরকম ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে যেমন চিন্তার আদান-প্রদান সম্ভব, তেমনি পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত দুইজন লোকের ভিতর মানসিক ভাব-প্রেরণা হইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রেরককে খুব একাগ্রচিত্ত হইতে হয় এবং গ্রাহককে অপেক্ষাকৃত স্থির ও শান্ত অবস্থায় থাকিতে হয়।

১৯০৫ সালে ইংল্যাণ্ডে মিস মাইল্‌স ও মিস রামস্‌ডেন নাম্নী দুইজন ভদ্রমহিলা বিশেষ সতর্কতার সহিত চিন্তা-চালনা ও দূরানুভব সম্পর্কিত পরীক্ষা সম্পাদন করেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী মিস মাইল্‌স লণ্ডনে থাকিয়া প্রেরকের কাজ করিতেন এবং মিস রামস্‌ডেন কুড়ি মাইল দূরে বাকিং-হামশায়ারে নিজ গৃহে বসিয়া গ্রাহকের কর্ত্তব্য করিতেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় মনঃস্থির করিয়া লণ্ডনস্থ মিস মাইল্‌সের কথা ভাবিতেন, তাহার পর মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইত, তাহা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন। আর মিস মাইল্‌স লণ্ডন হইতে একাগ্রমনে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর কথা চিন্তা করিতেন এবং উহার বিষয় লিখিয়া রাখিতেন। একদিন লণ্ডনে মিস মাইল্‌স একটি চশমার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেইদিন সন্ধ্যা বেলায় বাকিংহামশায়ারে মিস রামস্‌ডেনের মনে কেবল একখানি

চশমার কথা উদয় হইল এবং তিনিও তাঁহার স্মারকলিপিতে সেইরূপ লিখিলেন। আর একবার মিস মাইল্স মানুষেব হাতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ঠিক সেইদিন সন্ধ্যার সময় মিস রামস্ডেন মানসচক্ষে একটি হাতেব ছবি দেখিতে লাগিলেন। অন্য একবাব মিস রামস্ডেন চারিশত মাইল দূরে স্কটল্যাণ্ডে থাকিয়া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত মিস মাইল্সের মনের কথা অনেক সময় বেশ বুঝিতে পারিতেন। কখনও কখনও মিস মাইল্সের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও কথোপকথনের বিষয় আশ্চর্য্যরকম অতীন্দ্রিয়ভাবে দূরবর্ত্তিনী মিস রামস্ডেন অনুভব করিতে পারিতেন।

আমেরিকাব ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়েব মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার রাইনের তত্ত্বাবধানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, extra sensory perception সম্পর্কিত অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে। এই সব পরীক্ষার সময় পঞ্চপ্রকার চিত্রাঙ্কিত কার্ড ব্যবহার করা হয়। পাঁচখানি কার্ডে যথাক্রমে তারা, গোল রেখা, যোগচিহ্ন, ঢেউ ও চতুষ্কোণের ছবি থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশখানি এরকম কার্ড থাকে। ডাক্তার রাইন সংখ্যাবিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে গাণিতিক সম্ভাবনা সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়। পর্য্যবেক্ষক অন্তরাল হইতে একটির পর একটি কার্ড তুলিয়া দেখেন আর পাত্রকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে কোন্ ছবি কখন দেখা হইল তাহা আন্দাজ করিতে বলা হয়। এ ক্ষেত্রে পাঁচবারে একবার বা পঁচিশবারে পাঁচবার ঠিক বলার খুব স্বাভাবিক সম্ভাবনা। কিন্তু অনেক স্থলেই সাধারণ সম্ভাবনার উর্দ্ধে, above chance ফল পাওয়া গিয়াছে। এক সময় মিস ওনবি ও মিস টার্নার নামক দুইজন মহিলার মধ্যে চিন্তা-সঞ্চালন সম্বন্ধীয় পরীক্ষা সম্পাদিত হয়। মিস ওনবি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া প্রেরকের কর্ম্ম করিতেন আর মিস টার্নার তথা হইতে আড়াইশ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া গ্রাহকের কর্ত্তব্য করিতেন। তাঁহাদের দুইজনের কাছেই একরমভাবে

মেলান নির্ভুল ঘড়ি ছিল। নির্দিষ্ট সময় প্রত্যহ মিস ওনবি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছবি আঁকা কার্ড পর পর মনে মনে ভাবিয়া উহার বিষয় লিখিয়া রাখিতেন এবং সেই সময় দূরবর্ত্তিনী মিস টার্নার তাঁহার মনে যে যে ছবির উদয় হইত তাহার কথা সাবধানে লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপ পরীক্ষা তিনদিন ধরিয়া চলে। যখন মিস টার্নার চিঠিতে তাঁহার অনুভূতির ফলাফল লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন মিস ওনবির দৈনন্দিন লিপির সহিত উহা তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, মিস টার্নার গড়ে পঁচিশ বারের মধ্যে সতেরবার নির্ভুলভাবে মিস ওনবির দেখা ছবি অতীন্দ্রিয়ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

এখন দূর-সম্মোহনের, tele hypnotism-এর বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে। ফ্রান্সে ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক জ্যানেট ও ডাক্তার গিলবার্ট একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির উপর এক মাইল দূর হইতে সম্মোহন প্রভাব প্রয়োগ সম্ভব কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। এস্থলে পাত্রের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সময়ে দূরবর্ত্তী সম্মোহনকারী যখন প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেন তখন দেখা গেল পঁচিশবার প্রয়াসের মধ্যে অন্ততঃ আঠারবার সম্পূর্ণরূপে এবং অবশিষ্ট ভাগ আংশিকভাবে তাহার মোহনিদ্রা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কখনও কখনও ক্ষমতাবান লোক নিজের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া দূরস্থ কোন অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে নিজের প্রতিমূর্ত্তি সৃজন করিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড মোজেস এইরকমভাবে একজনের সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রিবেলা রেভারেণ্ড মোজেস কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এক বন্ধুর সম্মুখে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিলেন, যদিও সে বেচারীকে ইহার কথা কিছুমাত্র জানান হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই সময় ঐ বন্ধু মিষ্টার মোজেসকে

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং তিনি যখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। দ্বিতীয়বার এই পরীক্ষা সমান সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার পর মিষ্টার বিয়ার্ড নামক আর একজন ভদ্রলোক এই প্রকার কতিপয় পরীক্ষায় সফলতা অর্জ্জন করেন। একবার মিষ্টার বিয়ার্ডের মায়ামূর্ত্তি একই ঘরে দুইজন ব্যক্তি দেখিয়া চিনিতে পারে, যদিও তাহারা মোটেই জানিত না যে, তিনি কয়েক মাইল দূর হইতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে হেটিঙ্গার বলিয়া একজন ইংরাজ মনস্তত্ত্ববিদ্ অতীন্দ্রিয়বোধশক্তি ও দ্রব্যানুভব, psychometry সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেন। এই গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এই সকল পরীক্ষার সময় কোন সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন পাত্রের হাতে তাহার অজানা অন্য কোন লোকের ব্যবহৃত জিনিষ স্থাপন করা হইত এবং তখন সে তাহার মানসিক অনুভূতির বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিত। প্রথমে তেষট্টিজন লোকের দ্রব্যসামগ্রী তাহাকে প্রদান করা হয় এবং সে ১২৬৬ রকম বিবৃতি দেয়। ইহার মধ্যে ৬০৫টি উক্তি নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আসলে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহৃত বস্তু হাতে লইলে এই সমস্ত দ্রব্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে। ফ্রান্সে ডাক্তার ইউজিন অষ্ট মানুষের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছেন। ১৯২২ সালে এক সময় কাপ্তেন সি নামক একজন ডাক্তার অষ্টির নিকট একটি চিঠি পাঠাইয়া দিয়া জানান যে, পত্রের লেখক আজ জীবিত নাই। ডাঃ অষ্টি চিঠিখানি লইয়া অভিভিয়ানা নামক এক সূক্ষ্মশক্তিশালিনী মহিলার হস্তে প্রদান করেন। ঐ মহিলা কাগজখানি উভয় হস্তে মর্দ্দিত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, পত্রলেখক একজন পদস্থ

ধার্ম্মিক, রৌদ্রদগ্ধ যুদ্ধের সৈনিক, কিন্তু অধুনা মৃত। তাঁহার মৃত্যু আঘাতজনিত নয়, শ্বাসকষ্ট ও মস্তকে বেদনার জন্য উহা সঙ্ঘটিত। তিনি এক স্নেহাস্পদা স্ত্রী ও শিশু রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এক বিশ্বস্ত বড় ভাই বর্ত্তমান। ইহার পর মহিলাটি সমুদ্রের নোনাজল, আর্দ্রতা ও আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে চিঠিখানি জাহাজের উপর লেখা হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার অন্যান্য উক্তিও সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়। ডাক্তার অষ্টি চারদিন পরে পুনরায় পেরুটেট বলিয়া আর একজন সূক্ষ্ম ক্ষমতাবতী নারীর নিকট পূর্ব্বোক্ত পত্রলেখকের এক শ্যালিকাকে উপস্থিত করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের বিষয় জানিতে চাহেন। এই মহিলাও পরলোকগত সৈনিক পুরুষ সম্পর্কে বিবিধ বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাঁহার সকল বর্ণনাই আগেকার মহিলার সব উক্তির সঙ্গে আশ্চর্য্যরকমভাবে মিলিয়া যায়। অনুভূতিসম্পন্না উভয় মহিলাই পত্রলেখক সম্পর্কে নির্ভুল বিবরণ দেন, যদিও তাঁহাদিগকে আভাস-ইঙ্গিতে কোনরূপ সঙ্কেত করা হয় নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভব ও চিন্তা-চালনার অন্তর্নিহিত পদ্ধতি কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা বড় শক্ত। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে—প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্। স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ইহার মানে করিয়াছেন—প্রত্যয় মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্ত জ্ঞান হয়। এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের মতে পরচিত্ত। আবার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগে ঐ শ্লোকটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অপরের শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী শিবানন্দ বেলুড়মঠে অবস্থানকালে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় আছি। একজন ভক্ত আমরা

thought reading মনের কথা বলিয়া দেওয়া জানি কিনা জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী আমাকে ডেকে কি করে তা করতে হয় শিখিয়ে দিলেন। বললেন, 'কারও মনের কথা জানতে হলে প্রথমে নিজের মনটাকে একেবারে খালি করে ফেলবে। তারপর যে চিন্তাটা তোমার মনে প্রথম উঠবে, সেইটিই জানবে প্রশ্নকারীর মনের চিন্তা।' স্বামীজীর কথা শুনে আমি সেই ভক্তকে বললাম, আচ্ছা তোমার মনে কি আছে বলব। এই বলে ধ্যানের দ্বারা মনটাকে একেবারে খালি করে ফেললুম। তারপরেই দেখি একটা চিন্তা উঠেছে। তখন ভক্তটিকে বললুম, তুমি এই মনে করিয়াছিলে, সে স্বীকার করলে।"

পাঠক-পাঠিকারা যদি অবসর সময়ে চিন্তা-চালনা সম্পর্কে নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Psychical Research, by W. Barnett.
2. Personality of Man, by G. M. Tyrrell.
3. New Frontiers of Mind, by J. B. Rhine.

দিব্যদৃষ্টি

ইদানীং কয়েকজন জাদুকর চোখবাঁধা অবস্থায় জনতাপূর্ণ রাস্তায় সাইকেল ও মোটর সাইকেল চালাইয়া এবং বোর্ডের লেখা পড়িয়া দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। তাঁহারা কী কৌশলে এই কার্য্য সমাধা করেন তাহা জানা থাকিলেও এক্স-রে চক্ষুর খেলা সত্যই চমকপ্রদ। বর্তমান

প্রবন্ধে দিব্যদৃষ্টি বা clairvoyance সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাক এই প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ আমাদের কৌতূহল কতদূর চরিতার্থ করিতে পারে। Clairvoyance শব্দটি ফরাসী ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার অর্থ স্বচ্ছ দৃষ্টি। কেহ কেহ ইহাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেন। আসলে দিব্যদৃষ্টিও একরকম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন দিব্যদ্রষ্টা লোক কখনও কখনও দেখা যায়, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব কম।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত ফরাসী শরীরতত্ত্ববিদ্ চার্লস্ রিচেট, একটি সম্মোহিত মেয়েকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি শীলকরা খামে ভরা তাসের নাম নির্ভুলভাবে বলিয়া যাইতে পারিত। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক জন ইলিয়টসন (ইনিই সে-দেশে প্রথম স্টেথস্কোপ ব্যবহার করেন) বলিয়া গিয়াছেন, কোন কোন সম্মোহিত ব্যক্তি চোখ-বোজা অবস্থায় খামে-বন্ধ চিঠি পড়িতে পারিয়াছে, শীলকরা প্যাকেটে কী আছে বলিয়া দিয়াছে, বাক্সে বন্ধ বস্তুর অস্তিত্ব টের পাইয়াছে এবং অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়াও অন্য জিনিসের উপস্থিতি বুঝিতে পারিয়াছে। অথচ সাধারণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী মানুষের পক্ষে এ-ধরনের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ডব্লিউ হ্যাণ্ডস নামে জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক এলেন ডসন নাম্নী এক বালিকাকে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসার সময় লক্ষ্য করেন, তাহার দিব্যদর্শনের অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে। ১৮৪৫ সনে একদিন তিনি ঐ মেয়েটির দুই চোখের উপর দুইটি তুলাভরা কৌটা স্থাপন করিয়া তাহার পর আবার ফিতা বাঁধিয়া দেন। তথাপি ঐ মেয়েটি দিব্য অনুভূতির দ্বারা সম্মুখে স্থাপিত বিবিধ বস্তুর বিষয় অক্লেশে বলিয়া যাইতে লাগিল এবং পুস্তকপাঠ করিতে থাকিল। ইহার পর

তাহাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার এক ঘরে লইয়া গিয়া ডাক্তার সাহেব তাহার হাতে জীবজন্তুর রঙিন ছবিওয়ালা একখানি বই দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনও মেয়েটি সমস্ত পশুপক্ষীর বর্ণ ও বর্ণনা ঠিক ঠিক বলিয়া দিল।

অষ্ট্রেলিয়ার মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা-সভায় ডবি বলিয়া একজন সদস্য সম্মোহনকারী ছিলেন। তাঁহার সম্মোহিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন ছিল দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। একবার ঐ দেশের এডলেড শহরনিবাসী এডাম্‌সন সাহেবের কন্যা একটি ক্ষুদ্র অলঙ্কার হারাইয়া ফেলেন। অতঃপর পিতাপুত্রী উভয়ে ডবির নিকট গিয়া জানিতে চাহিলেন যে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিটি ইহার সন্ধান দিতে পারে কি না। ডবি তখন সেই লোকটিকে সম্মোহিত করিলেন। সমোহিত অবস্থায় লোকটি বলিয়া দিল হারান জিনিসটি কী রকম দেখিতে, কোথায় কী ভাবে উহা হারাইয়া গিয়াছে, কে পাইয়াছে এবং কোথায় রাখিয়াছে। তাহার বর্ণনা এতই নিখুঁত হইয়াছিল যে সত্যসত্যই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বস্তুটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল।

শুধু যে অপরের দ্বারা সম্মোহিত হইলে দিব্যদর্শনের ক্ষমতা জন্মায় তাহা নয়, কেহ কেহ স্বচেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারে। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ইমানুএল সুইডেনবর্গ (১৬৮৮—১৭৭২) যে অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা প্রসিদ্ধ জার্মান মনীষী কাণ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের এক অপরাহ্নে সুইডেনবর্গ আসিয়া গটেনবর্গ শহর হইতে ঘোষণা করেন যে, ২৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্টকহলমে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ি আগুন লাগিয়া সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার নিজের বাসভবনটির অবস্থাও বেশ বিপজ্জনক। তারপর সেইদিনই রাত্রি আট ঘটিকার সময় তিনি অনেকটা

নিশ্চিন্ত হইয়া জানাইলেন যে ঐ অগ্নি তাঁহার বাড়ি হইতে তৃতীয় গৃহদ্বারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ইহার দুই দিন পরে স্টকহলম হইতে একজন বার্ত্তাবহ গটেনবর্গে আসে। তাহাব নিকট হইতে জানা যায় যে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সুইডেনবর্গের প্রত্যেকটি উক্তি যথাযথ।

আমেরিকার উত্তর-আলাবামা প্রদেশে রেভারেণ্ড স্যাণ্ডার্স বলিয়া এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারও দিব্যদর্শনেব শক্তি ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। এই সময় দূরবর্ত্তী কোন বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইলে তখন তিনি তাহার নির্ভুল বিবরণ দিতে পারিতেন। কাহারও কোন ঘড়ির চেন, মুদ্রা কিংবা অন্য জিনিস হারাইয়া গিয়া থাকিলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেন। এখানে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। বেণ্টলী নামে এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, ১৮৬৭ সনের গ্রীষ্মকালে তাঁহার এক গোছা চাবি হারাইয়া যায়। প্রায় এক সপ্তাহকাল পবে স্যাণ্ডার্স সাহেবকে উহার সন্ধান বলিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় স্যাণ্ডার্স সাহেব বলেন, ঐ চাবির গোছা বেণ্টলীর বাড়ির পশ্চিম দরজাব সিঁড়ির নীচে পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যথার্থই তাই।

এখন আর এক রকম সূক্ষ্ম শক্তির বিষয় বলিব। ইহাকে ইংরাজীতে divining বলে। এইপ্রকার শক্তিশালী লোক একটি গাছের ডাল হাতে লইয়া ভূগর্ভস্থ জল বা খনিজবস্তুর অস্তিত্বের আভাস দিতে পারে। কখনও কখনও এই শ্রেণীর অনুসন্ধানকারী মৃত্তিকামধ্যস্থ গুপ্তধন বা লুক্কায়িত মুদ্রার খোঁজও বলিতে পারে। ঠিক জায়গায় উপস্থিত হইবামাত্র সূক্ষ্মসন্ধান-কারীর হস্তস্থিত বৃক্ষশাখা সজোরে বাঁকিয়া যায়। বোধ হয় সূক্ষসন্ধানকারীর অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি তাহার অজ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টস্থানে হস্তধৃত তরুশাখা বাঁকাইয়া দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোন কোন সময় সূতা বাঁধা দোলকও

এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মধ্যযুগে ও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক যুগেও সূক্ষ্ম অন্বেষণ কার্য্যের প্রচলন দেখা যায়।

আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থিত রয়েল কলেজ অব সায়েন্সের সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্ স্যর উইলিয়াম ব্যারেট এক শত জায়গায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সূক্ষ্মসন্ধানকারীর সাফল্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অথচ সে সকল স্থলে অন্যান্য সকল উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল। এমন-কি কোন এক ভূতত্ত্ব সংসদের সভাপতিও এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৮৭ সনে রিচার্ডসন কোম্পানির প্রচুর জল সরবরাহের জন্য কূপ খননের প্রয়োজন হয়। সেজন্য তাঁহারা বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া সুবিধামত এক স্থানে খননকার্য্য করান। কিন্তু তিনবার চেষ্টার পর প্রায় পনের হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও সন্তোষজনক কূপ খনন সম্ভব হইল না। এক স্থানে প্রায় সহস্র ফুট পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্ত করিয়াও জলের অস্তিত্ব মাত্র পাওয়া যায় নাই। তখন তাঁহাদিগকে জন মুলিন্স নামক এক ইংরাজ সূক্ষ্মসন্ধানকারীর সাহায্য লইতে বলা হয়। তাঁহারা রাজী হইলেন। তদনুযায়ী জন মুলিন্স ঐ স্থানে আসিয়া একটি গাছের ডাল হাতে লইয়া সমস্ত জায়গায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কিন্তু আগেকার কথা কিছুই জানান হয় নাই। তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় তাঁহার হস্তস্থিত বৃক্ষশাখা বাঁকিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ঐ স্থানে আশি নব্বই ফুট নীচে প্রচুর জল রহিয়াছে। জন মুলিন্সের কথামত ঐ স্থান খুঁড়িয়া সত্যই যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে লাগিল।

এবার দিব্যদর্শনের আর এক রূপ স্ফটিকদর্পণের, crystal gazing-এর বিষয় বলা যাইতেছে। স্থানবিশেষে এই ব্যাপারকে জলদর্পণ ও নখদর্পণও বলা হয়। আধুনিককালেও ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া,

আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান—পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্য এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। দিব্যদর্শক ব্যক্তি কোন স্ফটিক, জলভরা পাত্র কিংবা কাচের গোলকের দিকে এক মনে চাহিয়া থাকে। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিবার পর সম্মুখস্থ বস্তু অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে কুয়াশার ন্যায় একটি পর্দা গিয়া পড়ে—দিব্যদর্শক তখন উহার উপরে দূরবর্ত্তী দৃশ্য ছবির মত দেখিতে পায়। কখনও কখনও উহাতে ভবিষ্যতের চিত্র পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠে। এই সময় দিব্যদ্রষ্টা সাধারণ নয়ন দিয়া কিছু দেখে না, মানস চক্ষু দ্বারা সে সমস্ত দর্শন করে। সত্যের খাতিরে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অনেক সময়ই দর্শনকারী স্বীয় পূর্ব্বস্মৃতি ও কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যাবলী স্ফটিকের উপর প্রতিফলিত হইতে দেখে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কখনও কখনও সূক্ষ্মদ্রষ্টা স্ফটিকের উপর দূরবর্ত্তী কোন ঘটনার চিত্র এত সুস্পষ্ট দেখিতে পায়, যাহা সাধারণ উপায়ে তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার জোসেফ রাইন এই সব বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ঘটনার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সংখ্যাবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও দিব্যদর্শন সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষাকার্য্য করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার সময় পাঁচ রকম রেখাচিত্র অঙ্কিত পঁচিশখানি তাস ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষক সাবধানে একটির পর একটি তাস তুলিয়া রাখেন আর অন্তরাল হইতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন্ তাসে কি ছবি আঁকা আছে তাহা আন্দাজ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, পাঁচ বারে এক বার ঠিক বলা বা পঁচিশ বারে পাঁচ বার কিংবা এক শ বারে কুড়ি বার ঠিক বলার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সম্ভাবনা, কিন্তু পরীক্ষার সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক সম্ভাবনার উর্দ্ধে ফল পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক রাইন লিঞ্জমেয়ার বলিয়া এক ছাত্রের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। সে তিন শত বারের মধ্যে ১১৯ বার তাসের ছবি ঠিক ঠিক বলিয়াছিল। অথচ সাধারণ হিসাবে তাহার সফলতার সম্ভাবনা ৬০ বার মাত্র। একবার ত লিঞ্জমেয়ার পনেরখানি তাসের নাম পর পর ঠিক ডাকিয়াছিল। অন্য সময় তাহাকে সোডিয়াম এমাইটাল নামক নিদ্রাকারক ঔষধ সেবন করাইয়া উহার ফলাফল পরিদর্শন করা হয়। ঔষধ প্রয়োগের আগে সে গড়ে পঁচিশের মধ্যে ৬·৮ বার কৃতকার্য্য হইতেছিল, কিন্তু ঔষধ পানের পর তাহার সফলতার সংখ্যা নীচে নামিয়া স্বাভাবিক সম্ভাবনার সমান হইয়া যায়। এই পরীক্ষায় পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্নায়ুর অবসাদকারক কোন কারণ উপস্থিত হইলে প্রথমে অতীন্দ্রিয় ও পরে ইন্দ্রিয় অনুভূতি লোপ পায়। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত শ্রান্তি, তন্দ্রা, উদ্বেগ ও শারীরিক অসুস্থতা অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি বিশেষ ব্যাহত করে।

হিউবার্ট পিয়ার্স নামক আর একজন আমেরিকার ছাত্র আশ্চর্য্যরকম অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি বা দিব্যদর্শনের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। একবার সে ক্রমান্বয়ে পঁচিশবার নির্ভুলভাবে তাসের নাম বলিয়াছিল। সে নিজের ইচ্ছামত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ বা ক্ষীণ করিতে পারিয়াছে, সফলতা অর্জ্জনে আগ্রহান্বিত হইলে সে পঁচিশের মধ্যে দশবার হয়ত ঠিক বলিয়া গিয়াছে, আবার ভুল করিতে অনুরুদ্ধ হইলে সে সব কয়বারই ভুল বলিতে সক্ষম হইয়াছে। পরীক্ষাকালে বহু প্রচেষ্টার ফলে পিয়ার্স যখন ক্লান্ত হইয়া সাধারণ সম্ভাবনার সমান তাসের নাম বলিতে আরম্ভ করিত, তখন তাহাকে চা বা কফির ন্যায় কেফিনযুক্ত কোন উত্তেজক তরল পদার্থ পান করাইয়া দিলে সে আবার আগেকার মত স্বাভাবিক সম্ভাবনার উপরে সফলতা অর্জ্জন করিতে থাকিত। জর্জ্জ জার্ফল বলিয়া আর এক বিদ্যার্থীর

কথা জানা যায়, সেও পিয়ার্সের মত একবার তাসের নাম ডাকায় পর পর পঁচিশ বার কৃতকার্য্য হইয়াছিল। অন্য সময় সে সাধারণতঃ পঁচিশ বারে নয় বার সফল হইত।

পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে জনসাধারণের মধ্যে শতকরা প্রায় কুড়ি জনের অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি আছে। তবে মনে হয় অবশিষ্ট আশিজন যদি ধৈর্য্য ও আগ্রহের সহিত চেষ্টা করে তবে তাহারাও সূক্ষ্মশক্তির পরিচয় দিতে পারে। নর ও নারী উভয়ের দিব্যবোধশক্তি সমান। বয়সের হিসাব করিলে দেখা যায়, চার বছরের শিশু হইতে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রমাণ দিতে পারে। অন্ধলোকের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বোধ বেশী, শতকরা প্রায় চল্লিশজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির অল্পাধিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে। পাত্র ও পরীক্ষকের মধ্যে দূরত্ব বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন তারতম্য হয় না।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে হইলে মনের স্থৈর্য্য, একাগ্রতা, বিচার বোধ, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বিশেষ রূপে আবশ্যক। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু দিব্য অনুভবশক্তি স্থান ও সময়ের দ্বারা সেরূপ সীমাবদ্ধ নয়। সূক্ষ্ম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রায় একরকম ভাবেই প্রাতিভাত হয়। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য পরীক্ষার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, এ দেশের বিষয় কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অধিকাংশ ভারতীয় যোগীর জীবনেই দিব্য অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহাদের জীবনী পড়িয়া দেখিতে পারেন।

সম্মোহনতত্ত্ব

সম্মোহনতত্ত্বের সম্যক্ সমালোচনার অভাবে এদেশে ঐ বিদ্যা এখনও বহুল পরিমাণে রহস্যাবৃত এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয় সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা সন্দেহভঞ্জন ও কৌতূহল-নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে, তবে সংক্ষেপে এই প্রয়াস কতদূর ফলপ্রসূ হইবে বলা যায় না।

সম্মোহিত অবস্থাকে একপ্রকার কৃত্রিম তন্ময় নিদ্রা বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক নিদ্রার সময় বহির্জগতের সহিত মানুষের বিশেষ কোন মানসিক যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু সম্মোহন-সময়ে অল্পাধিক বাহ্যজ্ঞানশূন্য পাত্রের, subject-এর মন শুধু সম্মোহনকারীর প্রতি একাগ্রভাবে আকৃষ্ট থাকে। এ অবস্থায় সে নিকটস্থ দর্শকদের কোন কথায় প্রভাবিত হয় না, কিন্তু সম্মোহকের ক্ষীণতম আজ্ঞাও তৎক্ষণাৎ পালন করে, সেজন্য সম্মোহক এই সময়ে সম্মোহিত ব্যক্তির কতিপয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদের মতে সম্মোহন-কালে পাত্রের সমগ্র মনের একাংশ বিশ্লিষ্ট, dissociated হইয়া সম্মোহন-কারীর সহিত আবদ্ধ হয়। অপরের উপর ক্ষমতাবিস্তারের অভিপ্রায় এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবার আশঙ্কা—মানব-মনের এই দ্বিবিধ অস্তিত্বের জন্য সম্মোহন-বিদ্যার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। খুব সম্ভব, সম্মোহনতত্ত্ব সর্ব্ব-প্রথম ইউরোপে ডাক্তার মেসমার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়। ভারতে তন্ত্রশাস্ত্রে বশীকরণবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্মোহন-পদ্ধতির যে রূপের সহিত বর্ত্তমানে আমরা পরিচিত তাহার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বশীকরণ-তত্ত্বের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সম্মোহন-বিজ্ঞান প্রধানতঃ

পাশ্চাত্ত্য ভাবেই অনুপ্রাণিত। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় যোগীরা নাসাগ্র অথবা প্রদীপশিখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আত্ম-সম্মোহন অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পর-সম্মোহনের সহজসাধ্য প্রক্রিয়া-পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ইউরোপবাসীদেরই প্রাপ্য। অনেকের ধারণা—যাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল এবং যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাহারা সহজে সম্মোহিত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস সত্য নয়। অধিকাংশ অভিজ্ঞ সম্মোহনকারী ডাক্তারের অভিমত শতকরা প্রায় ৯০ জন সুস্থ সবল ও বুদ্ধিমান নর-নারীকে অল্পাধিক মোহাচ্ছন্ন করা সম্ভব। ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি এবং উন্মাদরোগী বেশীক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের প্রভাবিত করা একরূপ অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন—সম্মোহক প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অন্য লোককে বশীভূত করেন—কিন্তু এই প্রকার ধারণারও কোন ভিত্তি নাই, কারণ অত্যন্ত অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোর করিয়া কখনও সম্মোহিত করা যায় না। সম্মোহন-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে পাত্রের সম্মতি ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। সম্মোহন-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা কঠিন নয়, ইহার জন্য চাই আত্মবিশ্বাস আর বিচারবুদ্ধি। কোন রোগের চিকিৎসায়, মনোবিশ্লেষণ-কর্ম্মে, মনোবৃত্তির উন্নতিসাধনে এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে সম্মোহন-বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেজন্য এইদিকে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

এখন মোহনিদ্রা উৎপন্ন করিবার যে চারি প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে :

১। ডাঃ মেসমারের প্রক্রিয়া

২। ডাঃ ব্রেডের প্রণালী

৩। ডাঃ বার্ণহিমের পন্থা

৪। রাসায়নিক পদ্ধতি।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েনার জার্মান ডাক্তার ফ্রেডরিক এন্টন মেসমার (১৭৩৩-১৮১৫) কোন মাদকদ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত যে মানুষকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার নাম হইতেই mesmerism শব্দের উৎপত্তি। ডাঃ মেসমার জৈব-চৌম্বক শক্তির, animal magnetism-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সম্মোহনের সময় প্রয়োগকর্ত্তার, operator-এর শরীর হইতে এক প্রকার চৌম্বক-শক্তি বাহির হইয়া পাত্রের দেহে প্রবেশ করে বলিয়া সে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই প্রণালীতে নিদ্রা উৎপন্ন করিতে হইলে পাত্রের চক্ষুর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়, আর তাহার সমস্ত শরীরের উপর দিয়া স্পর্শ না করিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন, passes করিতে হয়।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে ডাক্তার জেম্‌স ব্রেড তন্দ্রা উৎপাদন করিবার আরও সহজসাধ্য প্রণালী উদ্ভাবনা করিয়া তাহার নাম hypnotism দেন। গ্রীক শব্দ hypnos মানে নিদ্রা। ডাক্তার ব্রেড তাঁহার রোগীকে উপবেশন করাইয়া কোন উজ্জ্বল ধাতব বস্তুর দিকে এক মনে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট তাকাইয়া থাকিতে বলিতেন। ইহাতেই খানিকক্ষণের মধ্যে সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িত।

তদনন্তর উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক বার্ণহিম প্রচার করেন যে, কৃত্রিম নিদ্রা সৃজন করিতে হইলে কেবল মৌখিক আদেশ বা অভিভাব, suggestion যথেষ্ট। ডাক্তার বার্ণহিম রোগীকে স্থির ভাবে বসাইয়া ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া যাইতেন—তাহার চোখের পাতা ভারী বোধ হইতেছে, সমস্ত শরীর তন্দ্রালু হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বদেহ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে, শীঘ্রই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে—এই ভাবে কিছুক্ষণ নিদ্রাবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বহু

ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মোহাবিষ্ট করিবার আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকায় কোন কোন চিকিৎসক রোগীর শরীরে মৃদু মাত্রায় সোডিয়াম এসিটাল, সোডিয়াম পেণ্টোথাল প্রভৃতি ঔষধ ইঞ্জেকশন দিয়া সম্মোহনের মত আবিষ্ট অবস্থা সৃজন করিয়া থাকেন। এইরূপে উৎপন্ন অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাব মনোবিশ্লেষণ ও মানসিক চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও অল্প পরিমাণ ক্লোরোফর্ম্ম বা ইথারের আঘ্রাণ লওয়াইয়া কিংবা যৎসামান্য সুরাসার সেবন করাইয়া কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সম্মোহনের অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করা যায়।

গভীরতা অনুসারে সম্মোহন-অবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে :

প্রথম অবস্থায়—পাত্রের চোখের পাতা ভারী বোধ হয় আর দেহ তন্দ্রাচ্ছন্ন বোধ হয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়—পাত্রের হস্ত কোন বিশেষ ভঙ্গীতে স্থাপন করিয়া যদি বলা হয় তাহার হস্ত ঐ ভাবেই অবস্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হস্ত অপসারণ করা অসম্ভব হইয়া যায়। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন প্রকার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকেও আপনা হইতেই সম্মোহনাবিষ্ট পাত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নমনীয় হইয়া পড়ে যে, সম্মোহনকারী তখন যে ভাবেই তাহার অঙ্গ রক্ষা করুন না কেন উহা সেই ভাবেই অবস্থান করে। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় পাত্রের জ্ঞান ও স্মৃতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে।

তৃতীয় অবস্থায়—বহির্জগতের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, সে কেবল প্রয়োগকর্ত্তার গলার স্বর শুনিতে পায়।

চতুর্থ অবস্থায়—সম্মোহনকালীন কোন ঘটনা পরে জাগ্রত হইয়া সে

আর মোটেই স্মরণ করিতে পারে না। এই স্তরে পাত্রের মনে নানা রকম বিভ্রম উৎপন্ন করা যায়।

কাহারও মনে কোন রকম ভয় ভাবনা, অনিচ্ছা, অবিশ্বাস, বিরুদ্ধতা বা ব্যঙ্গের ভাব বিদ্যমান থাকিলে কিংবা কোন প্রকার শারীরিক অস্বস্তি-অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইলে তাহাকে সম্মোহিত করিবার সকল প্রয়াস বিফল হয়। পাত্রের মন শান্ত ও শরীর স্বচ্ছন্দ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক ম্যাকডুগালের মতে বহির্মুখীচিত্ত, extrovert ব্যক্তিবর্গকে সম্মোহিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, যাহাদের মন অন্তর্মুখী, introvert, তাহাদের সম্মোহিত করা কিছু কঠিন। অভিজ্ঞ সম্মোহকগণের ধারণা মানুষকে পাঁচ হইতে আশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মোহাচ্ছন্ন করা যায়। কোন কোন লোককে এক বারের চেষ্টাতেই প্রভাবিত করা যায়, আবার কাহাকেও কাহাকেও তিন-চারি বারের প্রয়োগের পর কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

সচরাচর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে কোন ক্লেশ পাইতে হয় না,—পাত্রকে দৃঢ়কণ্ঠে কয়েকবার জাগিয়া উঠিতে বলিলে এবং তৎসহ করতালি প্রদান করিলে তখনই সে সজাগ হইয়া উঠে। অবশ্য সম্মোহিত ব্যক্তি কোন কারণে সত্বর জাগরিত না হইলে ভয়ের কোন হেতু নাই। ঐরূপ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার সম্মোহন-নিদ্রা ক্রমশঃ স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিণত হয় এবং সে সময়মত নিজেই জাগ্রত হয়।

আবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কিরূপ বিভ্রম উৎপাদন করা যায় এখন তাহার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যদি তাহার হাতে একটি ছড়ি দিয়া বলা হয়—উহা ছিপ এবং সম্মুখে এক স্বচ্ছ জলাশয় রহিয়াছে, উহাতে অসংখ্য মৎস্য বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে মৎস্য শিকারের কৌতুকজনক অনুকরণ করিতে থাকে। একটি রশুন তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট ধরিয়া যদি বলা হয় উহা গোলাপ ফুল, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করে এবং মনে করে

যথার্থই উহা হইতে গোলাপের সুমধুর সৌরভ উত্থিত হইতেছে। সম্মোহিত ব্যক্তির মুখে এক টুক্‌রা আলু দিয়া যদি তাহাকে বলা হয় উহা নাসপাতি, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উহা সাগ্রহে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাকে বধির বলিয়া সম্বোধন করিলে সে আর কোন শব্দই শ্রবণ করিতে পারে না; যদি তাহাকে কুকুর বলা হয়, তবে সে ঠিক সারমেয়সুলভ আচরণ আরম্ভ করিয়া দেয়। এই প্রকারে আবিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপরেই সম্মোহনকারী প্রভূত পরিমাণে কর্তৃত্ব করিতে পারেন—তবে মোহনিদ্রা যথেষ্ট গভীর হওয়া চাই।

ইহা ছাড়া সম্মোহক পাত্রের ইন্দ্রিয়সমূহকে ইচ্ছামত প্রখর অনুভূতি-প্রবণ বা স্বল্পানুভূতিপ্রবণ করিয়া দিনে পারেন। খুব সম্ভব আবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত আজ্ঞা অনুসারে পাত্রের মনোযোগের যেমন প্রভেদ হয়, তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও সেই অনুযায়ী তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

সম্মোহিত অবস্থায় পাত্রের স্পর্শবোধকে অভিভাবেব দ্বারা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়। ইথার, ক্লোরোফর্ম্ম, নাইট্রাস অক্সাইড, নভকেন প্রভৃতি বেদনালোপকারী ঔষধের ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন অস্ত্র-চিকিৎসক সম্মোহন-শক্তির সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিতেন। কলিকাতা নগরেই বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রেসিডেন্সী সার্জ্জন ডাক্তার জেম্‌স এসডেল সম্মোহন-বিদ্যার সহায়তায় ২৬১ সংখ্যক বেদনা-বিহীন অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে বিলাতে—যিনি প্রথম ষ্টেথিসকোপ যন্ত্র ব্যবহার করেন—সেই ডাক্তার জন ইলিয়টসন বহুসংখ্যক রোগীর অঙ্গে সম্মোহিত অবস্থায় সাফল্যের সহিত অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন। পরবর্ত্তীকালে ক্লোরোফর্ম্ম ও অন্যান্য অসাড়তা-উৎপাদক পদার্থ উদ্ভাবনের ফলে রোগীকে অচেতন ও

অবশ করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হওয়ায় সম্মোহন শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সম্মোহকের আদেশমত পাত্রের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শবোধ আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শোভেয়ার নামক এক বৈজ্ঞানিক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—যে স্থলে কোন আবিষ্ট ব্যক্তি আট জন লোকের হাতের আঘ্রাণ লইবার পর প্রত্যেককেই ঠিক ভাবে তাহাদের নিজ নিজ রুমাল প্রদান করে, যদিও তাহাকে ভুলপথে পরিচালিত করার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রেড একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে ৪৫ ফুট দূর হইতে গোলাপের গন্ধ নির্ভুলভাবে নিরূপিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ প্রায় তিন ফুট দূর পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু মোহাবিষ্ট অবস্থায় কেহ কেহ এই ক্ষীণ শব্দ ৩৫ ফুট দূর হইতেও যে শ্রবণ করিতে পারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্রেড আরও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন—কোন কোন সম্মোহিত লোকের স্পর্শশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয় যে, চোখ বাঁধা থাকিলে কিংবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরেও তাহারা কোন বস্তুর সহিত সঙ্ঘর্ষ না বাধাইয়া অক্লেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। খুব সম্ভব উত্তাপের প্রভেদ ও বায়ুর চাপের পার্থক্য হইতে তাহারা বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বের আভাস পায়।

সম্মোহনবিদ্যার আরও অনেক অদ্ভুত ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। আজ্ঞানুযায়ী পাত্রের হৃৎপিণ্ড অতি শীঘ্র কিংবা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। উপযুক্ত অভিভাবের দ্বারা তাহার দেহের ঘর্ম উৎপন্ন করা যায়। এমন কি আদেশ দিয়া মোহাবিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক উত্তাপ দুই-তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তসঞ্চার প্রয়োজকের অনুজ্ঞানুযায়ী বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে। কখনও কখনও বাক্ প্রয়োগের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির চর্ম হইতে রক্তক্ষরণ

করানোও সম্ভবপর হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, প্রয়োগ-কর্ত্তার বাক্যের প্রভাবে কোন কোন স্থলে বশীভূত ব্যক্তির দেহে ফোস্কা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

ডাক্তার লয়েড টাকী একবার কোন এক সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরে একখানি ডাক টিকিট আটকাইয়া দিয়া বলেন যে, তাহার দেহে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ করানো হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল সত্য সত্যই ঐ জায়গায় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। ম্যাকডুগাল ও হ্যাডফিল্ড উভয় চিকিৎসকই পৃথকভাবে এই পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া সমান সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে অধ্যাপক ভেলবিউফ আর একটি অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথমতঃ দুইজন লোকের দুই হাতের কিয়দংশ ঠিক সমান করিয়া দগ্ধ করিয়া দিলেন। প্রত্যেকেরই এক হাতের ক্ষতস্থানের কোন চিকিৎসা না করিয়া তিনি উহার ভার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে সম্মোহিত করিয়া তিনি অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন যে, অপর হাতের ক্ষত সত্বর নিরাময় হইবে। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখিলেন যে, সেই হাতের ক্ষত অন্য ক্ষত অপেক্ষা শীঘ্র ও সহজে সারিয়া গেল।

ডাক্তার লয়েড টাকী তাঁহার গ্রন্থে সম্মোহনের সাহায্যে এক বৃদ্ধা বহুমূত্র রোগিণীর চিকিৎসার কথা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি উক্ত রোগিণীকে গভীরভাবে সম্মোহিত করিয়া প্রায়ই বাক্ প্রয়োগ করিতেন যে তাহার রোগ নিশ্চয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। একজন রাসায়নিক ঐ বৃদ্ধার মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকৃতই রোগিণীর প্রস্রাবে শর্করার ভাগ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। মানুষের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির উপরেও কতখানি মানসিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়।

এখন, সম্মোহন-বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় দিকটি আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলেও সাধারণতঃ অত্যন্ত বিরল। বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ব্যারেট ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি সম্মোহিত বালিকার চোখ বাঁধিয়া তাহার দিব্য অনুভূতির প্রসার পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি বালিকার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় মুখমধ্যে লবণ, চিনি, রাইসরিষা, আদা, মরিচ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু ক্রমান্বয়ে স্থাপন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালিকাটি নির্ভুলভাবে ঐ সমস্ত পদার্থের নাম ও আস্বাদ বলিয়া গেল। তাহার এই অতীন্দ্রিয় আস্বাদজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারেট সাহেব অবাক হইয়া যান। অতঃপর তিনি নিজের এক হাত জ্বলন্ত মোমবাতির উপর ধরিয়া যৎসামান্য দগ্ধ করিলে, সম্মোহাচ্ছন্ন বালিকা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল কে যেন তাহার হাতখানি পোড়াইয়া দিয়াছে। আর একবার ব্যারেট একখানি তাস লইয়া একটি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহার ভিতর কি আছে। সে উত্তর দেয় লাল ফোঁটা সম্বলিত কোন কিছু রহিয়াছে। উহাতে কয়টি ফোঁটা আছে প্রশ্ন করায় বালিকা পাঁচটি ফোঁটার কথা বলিল, তাসখানি প্রকৃতই রুহিতনের পাঞ্জা ছিল।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সভার, Psychical Research Societyর প্রথম দিকে এডমণ্ড গুর্ণী ও উইলিয়াম ব্যারেট উভয়েই সম্মোহিত অবস্থায় অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি সম্পর্কিত কতিপয় পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন—কখনও কখনও সম্মোহক যদি পাত্রের অজ্ঞাতসারে কোন মুদ্রা, পুস্তক বা অন্য কোন বস্তুর উপর অল্পক্ষণের জন্য হস্তসঞ্চালন কিংবা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন, তাহা হইলে পরে ঐ কক্ষে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন পাত্রকে আনয়ন করিলে অবিলম্বে সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তু নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইত।

এখন দূর-সম্মোহনের বিষয়ের অবতারণা করা হইবে। ফ্রান্সে ১৮৮৬ সনে অধ্যাপক জানেট ও ডাক্তার গিবার্ট একজন অনুভূতিশীল ব্যক্তির উপর প্রায় এক মাইল দূর হইতে সম্মোহন-প্রভাব প্রয়োগ সম্ভব কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে পাত্রের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সময়ে যখন দূরবর্ত্তী সম্মোহনকারী প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেন তখন দেখা গেল পঁচিশ বার প্রয়াসের মধ্যে অন্ততঃ আঠার বার তাহার মোহনিদ্রা উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনেকেই বোধ হয় জানেন, সম্মোহনবিদ্যার দ্বারা বিমোহিত ব্যক্তির স্মরণশক্তি কত দূর বাড়ানো যায়। ইহার সহায়তায় তাহার পূর্ব্বলব্ধ অনেক অভিজ্ঞতা ও বিস্মৃত বিষয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয়। রিকার্ড এমন একজন সাধারণ স্মৃতিসম্পন্ন যুবকের কথা জানিতেন, যে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আগের দিনের পড়া কোন বই ঠিক ভাবে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। নিম্নের ঘটনাটি কৌতুকজনক। একখানি ডুবো-জাহাজের বিস্ফোরণের ফলে উহার পরিচালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জ্ঞানলাভের পর তাহার এমনই স্মৃতিভ্রংশ ঘটে যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে সে বিবাহ করিয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। ইহার জন্য সে তাহার নববিবাহিতা পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া তাহার সহিত বসবাস করিতেও অসম্মত হয়। বলা বাহুল্য, সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে তাহার এই স্মৃতিবিভ্রম সত্বর অপসারিত হইয়াছিল।

কাহারও অন্তর্নিহিত অব্যক্ত কোন ক্ষমতা থাকিলে সম্মোহনের দ্বারা সহজেই তাহার বিকাশসাধন করা যাইতে পারে। যদি কোন লোকের মনে সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা থাকে, তবে উহা এইরূপে ক্রমে ক্রমে জাগাইয়া তোলা যায়।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সম্মোহন-অবস্থায় মানুষের সময়জ্ঞান

অসাধারণ রকম বাড়িয়া যায়। মিলনে ব্র্যামওয়েল একবার এক উনিশ বৎসর বয়স্কা তরুণীকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া আজ্ঞা দেন, সে যেন ৪৩৩৫ মিনিট পরে ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত করে। যদিও নিদ্রাভঙ্গের পর এই কথা তাহার আর কিছুই মনে থাকিল না, তথাপি নির্দ্ধারিত সময় আগমন করিবামাত্র সে ঘড়ি না দেখিয়া আদিষ্ট কর্ম্ম ঠিক ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিল। মোহাবস্থায় প্রদত্ত যে আদেশ জাগরণের পর কার্য্যকরী হয় তাহাকে সম্মোহনোত্তর-অভিভাব post-hypnotic suggestion বলা হয়। সম্মোহনোত্তর আদেশ এক বৎসর পরেও সক্রিয় হইয়াছে।

সম্মোহন-শক্তির সাহায্যে নানা প্রকার চরিত্রদোষ ও মন্দ অভ্যাস সংশোধন করা যায়। মাতাল ও নেশাখোরের মদ বা মাদক-দ্রব্যের প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, এই বিদ্যাবলে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। কৈশোরকালীন অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা কতকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্মোহন-বিজ্ঞানের সহায়তায় সম্ভব হয়।

শরীরক্রিয়ার ক্রটিজনিত নানারকম অসুখ, ব্যথা-বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ, সামান্য জ্বর, অনিদ্রা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধি সম্মোহনশক্তির সাহায্যে নিরাময় করা যায়। কারণ এই আবিষ্ট অবস্থায় রোগীর মন অত্যন্ত বিশ্বাস-প্রবণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে পীড়িত ব্যক্তির নিজের মনই তাহার রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ করিয়া তোলে, সম্মোহনকারী চিকিৎসক কেবল তাহার জীবনীশক্তিকে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অতিশয় জাগ্রত ও একাগ্র করেন মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উন্মত্ত রোগীকে সম্মোহিত করা একরূপ অসম্ভব, কিন্তু ফ্রান্সে ডাক্তার আগষ্ট ভয়সিন এক সময় এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত এক উন্মাদিনীকে সম্মোহিত করিতে মনস্থ করেন। প্রথমে ঐ উন্মাদ রোগিণী তাঁহার প্রতি কিছুতেই স্থির

ভাবে না চাহিয়া অধিকতর উত্তেজিত ভাবে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডাক্তার ভয়সিন অবিচলিত ভাবে—যে দিকেই সে চক্ষু ফেরাক না কেন—সেই দিকে তাঁহার মর্ম্মভেদী অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিতে লাগিলেন। প্রায় পনেরো মিনিটকাল পরে ঐ উন্মত্তা নারীর নয়নদ্বয় ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া আসিল এবং সে গাঢ় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই প্রক্রিয়া বহুদিন হইতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ঐ ব্যাধিগ্রস্তা রমণী আবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য প্রকৃতিস্থ থাকিতে আরম্ভ করিলেও জাগ্রতকালে পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। ক্রমশঃ সে আবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত আদেশ ও উপদেশ জাগ্রত অবস্থায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার আচরণ ক্রমে ক্রমে এতই স্বাভাবিক ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহাকে এক হাসপাতালে নার্সের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়।

অনেকের ধারণা বশীভূত ব্যক্তিকে দিয়া যখন সম্মোহক যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে সক্ষম, তখন তাহাকে চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার বা অন্য কোন দুষ্কর্ম্মে প্ররোচিত করাও হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু এই কথা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। সাধারণতঃ কোন চরিত্রবান ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া অন্যায় কাজ করিতে আদেশ দিলে, সে তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে এবং তাহার মোহনিদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় কিন্তু কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সহজে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করানো যায়। ডাক্তার হলাণ্ডারের মতে মন্দ লোকেরাই মন্দ অভিভাব গ্রহণ করে। তবে একথাও যথার্থ যে, সম্মোহন-নিদ্রা যদি প্রগাঢ় হয় এবং পাপকার্য্যকে যদি পুণ্যের আকারে পাত্রের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে উহা নিষ্পন্ন করিতে ইতস্ততঃ নাও করিতে পারে। এজন্য কোন কোন দেশে সুযোগ্য চিকিৎসক ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্মোহন আইনবিরুদ্ধ।

এতক্ষণ পর-সম্মোহনের বিষয় আলোচনা করা হইতেছিল, এখন আত্ম-সম্মোহনের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা হইবে। সচরাচর হৃৎস্পন্দন, তাপ-নিয়ন্ত্রণ গ্রন্থিরস নিঃসরণ, শোণিত-সঞ্চলন প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য সাধারণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া সমগ্র দেহ-যন্ত্রকে পরিচালনা করে। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্জ্ঞান মনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া এই সময় যেরূপ আদেশ দেওয়া হয় রোগীর নির্জ্ঞান মন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়া দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। শুধু যে সম্মোহিত অবস্থায় অপরের সাহায্যে নিজের মন দিয়া দেহকে প্রভাবিত করা সম্ভব এমন কোন কথা নাই। স্বচেষ্টায় শরীর-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবাব ক্ষমতা প্রত্যেকের মনের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে। ফ্রান্সে এমিল কুইএ (১৮৫৭-১৯২৬) এই দিকে যথেষ্ট গবেষণা করেন। তাঁহার মতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এবং রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার অগ্রে যদি সজ্ঞানে কুড়ি বার একাগ্রভাবে চিন্তা করা যায়—আমি প্রতিদিন সব রকমে উন্নতিলাভ করিতেছি—তাহা হইলে এই স্বাস্থ্যকর চিন্তাধারা ক্রমশঃ নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করিয়া শরীরকে সত্বর সুস্থ নীরোগ করিয়া তোলে। কুইএ এইভাবে তাঁহার রোগীদের আত্ম-সম্মোহনের অভ্যাস শিক্ষা দিয়া বহুবিধ ব্যাধি বিদূরিত করেন।

প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক উইলিয়াম ম্যাকডুগাল এক স্থানে বলিয়াছেন, কদাচিৎ কখনও এমন লোকও দেখা যায়, যাহার হৃৎপিণ্ডের গতি পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অপর কেহ কেহ আবার শরীরের অংশবিশেষে রক্তসঞ্চার নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার একজন শক্তিধর লোককে সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, সে ইচ্ছামত নিজেকে এমন এক সমাধি-অবস্থায় আনিতে পারিত, যখন তাহার বাম

হস্ত সম্পূর্ণ শোণিত শূন্য হইয়া পড়িত, এমন কি তখন উহাতে একটি মোটা সূচ বিদ্ধ করিয়া দিলেও মোটেই রক্তপাত হইত না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগে লিখিয়াছেন, "খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে আনিতে না পারেন, হৃদয়যন্ত্র তাঁহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে—শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন।"

মানুষকে সম্মোহিত হইতে দেখিয়া যাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইতর প্রাণীদেরও সম্মোহিত করা সম্ভব। জৈব সম্মোহনের দুইটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে: (১) অকস্মাৎ তীব্র উত্তেজনা প্রয়োগ; (২) অবিরাম মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ।

প্রথম পদ্ধতি—ফড়িং, কাঁকড়া, ব্যাঙ, পাতিহাঁস, খরগোস, ছাগল, শূয়র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীবকে অতর্কিতভাবে ধরিয়া হঠাৎ চিৎ করিয়া ফেলিলে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। সাপের ঘাড় ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দিলে সে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—এই প্রণালীতে চিংড়ি, মুরগী, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীকে সম্মোহিত করা সম্ভব। প্রথমে ইহাদের দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ একভাবে ধরিয়া রাখা হয়, তাহার পর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু অপসারিত হইলেও উহারা পূর্ব্বে যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল ঠিক সেই ভাবে স্থির হইয়া কয়েক মিনিট অবস্থান করিতে থাকে। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ কুকুরের কানের কাছে অবিরাম একঘেয়ে মৃদু শব্দ করিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিতে সফল হইয়াছিলেন।

শব্দসঞ্চার

ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌ বা শব্দসঞ্চার বিদ্যার সহিত হয়ত অনেকের অল্পাধিক পরিচয় আছে। সুকৌশলী প্রদর্শক এই বিদ্যাবলে বাহ্যতঃ বিবিধ দিক ও বিভিন্ন স্থান হইতে নানারকম শব্দ উৎপাদন করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারেন। কখনও মনে হয় যেন বহুদূর হইতে একটা শব্দ আসিতেছে, আবার বোধ হয় যেন শূন্য হইতে কোন ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, কখনও বা ধারণা হয় যে, ভূগর্ভ হইতে গুরুগম্ভীর রব উঠিতেছে। আবার কোন কোন সময় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যেন কোন বস্তু বা মূর্ত্তি হইতে শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে। রহস্যসৃষ্টির জন্য শ্রোতাদের বলা হয় কোন অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠানের জন্য এই সমস্ত বাণী সকলের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কখনও কখনও ধ্বনি-দক্ষ হরবোলা অনেক জীবজন্তুর ডাক আশ্চর্য্যরকম অনুকরণ করিতে পারেন। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও মিশরে যে আকাশবাণী অথবা মূর্ত্তিবিশেষের শব্দ উচ্চারণের কথা শুনা যায়, খুব সম্ভব তাহা পুরোহিত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি। প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় তাঁহারাই বোধ হয় সেখানে বিশেষ নিপুণতার সহিত এই ধ্বনিবিদ্যা প্রয়োগ করিতেন।

এখন বোধ হয় সকলেরই এই শব্দবিদ্যার বিশদ ব্যাখ্যা জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছে। প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানের দিক হইতে শব্দতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। শব্দ উৎপত্তির আদি কারণ কোন বস্তুবিশেষের কম্পন। কোন লোক যখন কথা বলে, সেই সময় তাহার গলার ভিতরকার স্বরসূত্র কম্পিত হইতে থাকে। কণ্ঠের বাহিরে হাত দিলেও এই কম্পন অনুভব হয়। গলমধ্যস্থ স্বরসূত্রের স্পন্দন অবিলম্বে নিকটস্থ বায়ুতে সঞ্চারিত হয়, তাহার

ফলে বাতাসেও একপ্রকার কম্পন উৎপন্ন হয়। এই কম্পন-তরঙ্গ গিয়া যখন অন্য লোকের কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন সে উহা শব্দরূপে শুনিতে পায়। বায়ুবাহিত শব্দ সেকেণ্ডে এগারশ' ফুট গমন করে। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কুড়ির কম কিম্বা কুড়ি হাজারের বেশী হইলে মানুষ সাধারণতঃ তাহা আর শব্দরূপে শ্রবণ করিতে পাবে না। ডান কান আর বাম কানের অনুভূতির তারতম্য হইতে আমরা শব্দের দিক স্থির করি। কিন্তু ঠিক সামনের বা পিছন দিকের শব্দের পার্থক্য সূক্ষ্ম ভাবে নির্ণয় করা কিছু কষ্টকর।

এই প্রসঙ্গে দূরত্ব অনুযায়ী শব্দের কি রকম হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহা জানা প্রয়োজন। যদি দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে, শব্দের শক্তি চার গুণ কমে। আর যদি ব্যবধান অর্দ্ধেক হইয়া যায় তাহা হইলে শব্দের জোর চারগুণ বাড়ে। শব্দেব পরিবর্ত্তন দূবত্বের বর্গের বিপরীত হয়। সেজন্য ইহাকে বিপরীত বর্গের নিয়ম বলে। উদাহবণ স্বরূপ কুড়ি গজ দূব হইতে একসঙ্গে চারিটি ঘণ্টা বাজাইলে যত জোরে শুনাইবে, দশ গজ ব্যবধান হইতে সেইরূপ একটিমাত্র ঘণ্টায় ততখানি শব্দ হইবে। আর একটি কথা। কোন এঞ্জিন বাঁশী বাজাইয়া কাছে আসিলে বাঁশীব শব্দ সরু ও তীক্ষ্ণ শুনায়, আর দূরে চলিয়া গেলে ঐ স্বব মোটা ও ক্ষীণ মনে হয়। এই ব্যাপার অধ্যাপক ডপলার আবিষ্কার করেন।

শব্দসঞ্চারকারী সুকৌশলে প্রতিপন্ন করেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব। তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, যেন তাঁহার মুখ হইতে কোন কিছুই নিঃসৃত হইতেছে না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মন প্রভাবিত কবিবার জন্য কতিপয় বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। দেখা যায়, যখনই কোনরকম ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন শব্দসঞ্চারকের মুখমণ্ডল প্রশান্ত, ওষ্ঠাধর স্থির। অনেকদিন অভ্যাস করিলে একটুও ঠোঁট

না নাড়িয়া কথা বলা আয়ত্ত করা যায়। ইহার জন্য প্রতিদিন প্রায় পনের মিনিট আর্শির সামনে ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া ধীরে ধীরে বাঙলা বর্ণমালা ক হইতে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত এবং ইংরাজী অক্ষর এ হইতে জেড অবধি সুস্পষ্ট অথচ স্বাভাবিক স্বরে উচ্চারণ করিয়া যাইতে হয়। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মুখ যদি একেবারেই বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অস্ফুট শব্দ ব্যতীত অন্য কোন বাক্য নির্গমন সম্ভব নয়, এজন্য মুখবিবর যৎসামান্য উন্মুক্ত রাখিতে হয়। ঠোঁট না নাড়িয়া প্রথম প্রথম প, ব আর ম অথবা পি, বি, এম উচ্চারণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কয়েক মাসের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই বর্ণগুলি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতকটা আয়ত্তে আনা যায়। অভ্যাসকালে যাহাতে কোনরকম মুখবিকৃতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

এখন শব্দ প্রক্ষেপের বিষয় সকলের জানা আছে। দূরের শব্দ আস্তে শুনা যায়, আর কাছের শব্দ জোরে শুনায়। তবে শ্রোতাদের পশ্চাৎদিকে, দক্ষিণে কিম্বা বাম পার্শ্বে কখনও শব্দ সঞ্চালন করা যায় না। এই প্রভেদ তাহারা সহজেই ধরিয়া ফেলে। কেবল স্বর-সঞ্চারকের বাম বা দক্ষিণ দিক কিম্বা পশ্চাৎ হইতে শব্দ-বিভ্রম সম্পাদন করা সম্ভব। বিভিন্ন অবস্থায় শব্দের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সে বিষয় বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা সমীচীন। ইহার জন্য কোন সঙ্গীকে দূর হইতে ডাকিয়া তাহার সাড়ার শব্দ কিরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করা বিধেয়। অথবা কোন ছোট ঘরে সহকারীকে বন্ধ করিয়া আহ্বান করিলে তাহার উত্তর কি রকম চাপা স্বরে শুনায়, তাহা মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করা উচিত। ইহার পর নির্জ্জনে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত এই সকল শব্দের প্রভেদ বহুবার অনুকরণ করা আবশ্যক।

ক্রীড়া-প্রদর্শনকালে কোন সাহায্যকারী থাকে না, কিন্তু সেই সময় যদি

কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে শব্দসঞ্চারক কান পাতেন কিংবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে দর্শকগণ স্বভাবতঃই সেই দিক হইতে শব্দ আগমনের প্রত্যাশা করে, তখন দূরত্ব অনুযায়ী আস্তে বা জোরে স্বর নিয়ন্ত্রণ করিলেই তাহারা ঠিক মনে করে, যেন সেই স্থান হইতেই তাহারা ঐ শব্দ শুনিল। সেইজন্ত এই বিদ্যা প্রয়োগকালে আভাস-ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন হয়, কারণ উহার উপর অর্দ্ধেক সাফল্য নির্ভর করে, অবশিষ্ট অংশ নির্ভর করে শব্দ উচ্চারণের কৌশলের উপর।

সুবিধামত কোন মুখনাড়া পুতুল সংগ্রহ করিতে পারিলে উহার সহিত কথোপকথন চালাইয়া নিপুণতা অর্জ্জন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। উহাকে প্রশ্ন করিবার সময় স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে হয়, উহাকে দিয়া উত্তর দেওয়াইবার কালে মাত্রামত উহার মুখ নাড়াইতে হয় এবং সেই সঙ্গে নিজের মুখ ও ওষ্ঠাধর স্থির রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাতে দর্শকগণ স্বতঃই মনে করে, পুতুলটি যেন সত্যসত্যই কথা বলিতেছে। শব্দসঞ্চারবিদ্যা, ভেন্ট্রিলোকুইজম খুবই চিত্তাকর্ষক। তেমন অনুশীলন করিলে অনেকেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারেন।

আঁধারে আলো

সাধারণতঃ তাপযুক্ত আলোকের সহিতই আমাদের পরিচয়। চন্দ্রের আলোক ব্যতীত সূর্য্যের আলোকে, বৈদ্যুতিক আলোকে এবং গ্যাস ও তৈলের দীপালোকে যথেষ্ট উত্তাপ আছে। এই সকল আলোকের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ শক্তি তাপরূপে নিঃসারিত হয়; অবশিষ্ট ২ ভাগ মাত্র আমরা আলোকরূপে পাই। বৈজ্ঞানিকগণ এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী

ভাবে তাপহীন আলোক-আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে আলোক বিকিরণ করিতে দেখা যায়। এই প্রকার আলোক, phosphorescence সেরূপ উজ্জ্বল না হইলেও ইহাতে উত্তাপের অনুপাত কম।

জ্যোতিবিকিরণকারী পদার্থের মধ্যে রেডিয়ামের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী এই বিস্ময়কর রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। রেডিয়াম অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করে। রেডিয়ামের রশ্মি, ধাতু এবং কাঠের পর্দ্দা ভেদ করিয়া ফটোগ্রাফির প্লেটে ক্রিয়া করিতে পারে। রেডিয়াম স্বকীয় জ্যোতিবিকিরণশক্তি অন্যান্য পদার্থে অস্থায়িভাবে সঞ্চারিত করিতে পারে। কাঁচের আবদ্ধ আধারে একটি পাত্রে রেডিয়াম রাখিয়া নিকটে আর একটি পাত্রে জল রাখিলে, ক্ষণকাল পরে ঐ জলও আলোক বিকিরণের শক্তি লাভ করে, —যদিও জলের ঐ শক্তি ক্ষণস্থায়ী।

ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড, ষ্ট্রনসিয়াম সালফাইড, জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের আলোক-গ্রহণের শক্তি আছে। এই সকল পদার্থ কোন উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে অল্পকাল রাখিয়া অন্ধকারে অপসারিত করিলে আলোক বিকিরণ করে; কিন্তু এই আলোক ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন হীরকও এইরূপে আলোক শোষণ করিয়া পুনরায় সেই আলোক বিকিরণ করিতে পারে। একটি মাটীর ভাঁড়ে সমুদ্রের ঝিনুকের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া কয়লার উনানে প্রায় ৪৫ মিনিট প্রচণ্ড উত্তাপ দিলে আলোক-বিকিরণকারী ক্যালসিয়াম সালফাইড প্রস্তুত হয়। ক্যালসিয়াম সালফাইড ও বেরিয়াম সালফাইডের সহিত অল্প পরিমাণ রেডিয়াম মিশাইয়া luminous paint বা দীপ্তি-সমুজ্জ্বল রঙ প্রস্তুত হয়। রেডিয়াম হইতে

অনবরত আলো পায় বলিয়া ঐ ক্যালসিয়াম সালফাইড ও বেরিয়াম সালফাইডের স্ফুরিতজ্যোতি দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকে। ঘড়ির ডায়ালের উপর এই ভাস্বর রঙ দিয়া অঙ্কন করিলে ঐ ঘড়িতে অন্ধকারেও সময় দেখা যায়।

ফসফরাসকে আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে আনিলে, তৎক্ষণাৎ উহা বায়ুর অম্লজানের, oxygen-এর সহিত সংযুক্ত হয়। এই রাসায়নিক সংযোগের সময় অন্ধকারে নীলাভ আলো দেখা যায়। সরু নলযুক্ত ফ্লাস্কে ফসফরাস ও জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে, ঐ নলের মুখে অন্ধকারে তাপবর্জ্জিত এক প্রকার নীলাভ আলোক-শিখা লক্ষিত হয়।

এই স্থানে ফসফরেটেড হাইড্রোজেনের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ, এই গ্যাসের সহিত আলেয়ার সম্পর্ক আছে। কষ্টিক সোডা, জল এবং ফস্‌ফরাস একত্র উত্তপ্ত করিলে ফসফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শেই জ্বলিয়া উঠে।

কখনও কখনও অন্ধকারে জলাভূমিতে এক প্রকার আলোকপুঞ্জকে অদ্ভুত ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। কুসংস্কারান্ধ গ্রামবাসীরা ইহা ভূতের আলো মনে করিয়া আতঙ্কাভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু আলেয়ার এই আলোকের প্রকৃত কারণ উল্লিখিত ফসফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, জলাভূমিতে যখন জীবদেহ বা উদ্ভিদ্‌দেহ বিগলিত ও রূপান্তরিত হয়, তখন তাহা সামান্য পরিমাণে ফসফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। জলাভূমি হইতে উঠিয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই এই গ্যাস জ্বলিয়া উঠে। দিবাভাগে ফসফরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইলেও—নৈশ অন্ধকারেই আলেয়ার আলোরূপে তাহা সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে কৃত্রিম আলেয়া উৎপাদন করা যাইতে পারে। কোন

মাঠে একটি ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে অল্প ক্যালসিয়াম ফসফাইড রাখিবেন ; তাহার পর বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকাচূর্ণ ছড়াইয়া আলগা ভাবে সেই গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিবেন। উহার উপর জল ছিটাইয়া দিলেই অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মত আলো দৃষ্টিগোচর হইবে।

উপরি-উক্ত জড় পদার্থ ব্যতীত, নানাপ্রকার প্রাণীরও তাপহীন আলোক-বিকিরণের শক্তি লক্ষিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরেব গভীর জলে জ্যোতি-বিকিরণকারী কয়েক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমুদ্রের এরূপ সুগভীর অংশে বাস করে যে, সূর্য্যালোক সমুদ্রের তত নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে পাবে না। সেই জন্য বোধ হয় প্রকৃতি দেবী ইহাদের দেহে এইরূপ সন্ধানী-আলোক বিকিরণের শক্তি দিয়াছেন, যাহার সাহায্যে ইহারা সাগরের অন্ধকারময় গর্ভেও নির্ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমূদ্রগর্ভে বিচরণশীল জেলি মাছগুলিও রাত্রির অন্ধকারে এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে।

জোনাকি-পোকার পুচ্ছ হইতে কিরূপ স্নিগ্ধ, নীলাভ আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন। খদ্যোতপুঞ্জ ইচ্ছামত এই আলো জ্বালিতে ও নিবাইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার কীট আছে, তাহাদেরও শরীর হইতে অন্ধকারে অতি স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোক নিঃসারিত হইতে দেখা যায়। কোন কোন প্রকাব কেঁচোরও আলোক-বিকিরণের শক্তি আছে।

অনেক সময়ে অন্ধকারে সমুদ্রের জল হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। তরল অগ্নিরাশির মত এই সামুদ্রিক আলোক-বিকিরণই বোধ হয় "বাড়বানল" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই উজ্জ্বলতার প্রধান কারণ—সমুদ্রজলমধ্যস্থ আলোকপ্রদানকারী noctiluca miliaris (নকটিলিউকা মিলিয়ারিজ) নামক অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব।

চিংড়ি ও ইলিশ মাছ, হাঁস বা মুরগীর মাংস পচিতে আরম্ভ করিলে অনেক সময়ে উহা হইতে নীলাভ আলোক নিঃসারিত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, মাছ-মাংস বাসি পড়িয়া থাকিলে উহাতে আলোক-বিকিরণ-কারী এক প্রকার আনুবীক্ষণিক জীবাণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই সকল জীবাণু হইতেই আলোকের উদ্ভব হয়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলেন, "সময় সময় নোনা জলের চিংড়ি মাছের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ আলোক নির্গত হয় যে, দশ-বার ইঞ্চি দূর হইতেও তাহার সাহায্যে অন্ধকারে বাইরের অক্ষর পড়িতে পারা যায়।"

উল্লিখিত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর আলোক-বিকিরণের জন্য অক্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগ করিলে ঐ সকল কীটপতঙ্গ ও জীবাণু আরও উজ্জ্বলভাবে আলোক বিকিরণ করিতে থাকে।

এই সকল প্রাণী কেমন করিয়া এরূপ স্নিগ্ধ তাপহীন আলোক উৎপাদন করে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ এ কাল পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। প্রাণীর দীপ্তিবিকিরণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকের বিভিন্ন অভিমত লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানবিৎ মেয়ারের, Mayer-এর মতে এই সকল প্রাণী সূর্য্যকিরণ হইতে আলোক সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা বিকিরণ করে। আর একজন বৈজ্ঞানিক—ব্রাগনাটেলির, Brugnatelli-র মতে ইহারা খাদ্যের সহিত আলোক উদরস্থ করিয়া, তাহাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে পুনর্ব্বার সেই আলোক নিঃসারিত করিয়া থাকে। ডারউইন, Darwin এবং ডেভির, Davy-র ধারণা, ইহারা নিশ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তাহা ইহাদের শরীরস্থ ফসফরাসের সহিত সংযুক্ত হওয়াতেই ঐরূপ আলোক উৎপন্ন হয়। টড, Todd ও ম্যাকআর্টনী, Macartney নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কীট-পতঙ্গের আলোক-বিকিরণ প্রাণের বা জীবনের এক

বিশেষ ক্রিয়া, এবং এই শক্তি স্নায়ুসূত্রের উপর নির্ভর করে, আর উহা দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণিদেহে যেরূপ স্নায়বিক শক্তিকে বিদ্যুৎ, গতি, তাপ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায়, সেই-রূপ এই সকল দীপ্তিমান কীট-পতঙ্গাদির স্নায়ুশক্তিও আলোকে রূপান্তরিত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে জোনাকি ও অন্যান্য জীবের দীপ্তিবিকিরণের কারণ এক রকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। ইহাকে chemiluminescence বলা হয়। ইহাদের মতে আলোকপ্রদানকারী কীট-পতঙ্গের শরীরে লুসিফারিন বলিয়া এক প্রকার বস্তু থাকে, উহা লুসি-ফারেজ নামক অপর এক পদার্থ সংযোগে আলোক উৎপন্ন করে। ঐরূপ আলোক জ্বালিবার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক।

কীট-পতঙ্গ ও জীবাণু ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা ছত্রক, কন্দ ও ঘাসকে বনে-জঙ্গলে অন্ধকারে স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোক বিকিরণ করিতে দেখা যায়।

উদ্ভিদের জ্যোতি-বিকিরণের প্রকৃত কারণ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—এই সকল আলোক-বিকিরণকারী উদ্ভিদকে অক্সিজেন-গ্যাসের মধ্যে রাখিলে, ইহাদের আলোকের ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এ জন্য কোন কোন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন—গাছপালার দীপ্তি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের মতে অক্সিজেন, জল এবং উত্তাপের সাহায্যে উদ্ভিদদেহে নিরন্তর একরূপ মৃদু দহন বা জ্বলন, slow combustion হইতেছে; ধীরে ধীরে এই দহন বা জ্বলনের জন্য উদ্ভিদ্‌বিশেষ অন্ধকারে আলোক প্রদান করে বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা।

জীবজন্তুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি

আমরা যে জগতে বাস করি, জীবজন্তুর জগৎ উহা হইতে অনেক ভিন্ন, কারণ উহাদের বোধশক্তি বিষয়ানুভূতি একেবারেই অন্যপ্রকারের। অধিকাংশ প্রাণীরই ইন্দ্রিয় মনুষ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা ঢের কম অনুভূতিসম্পন্ন। আবার অন্যদিকে কতিপয় জীবের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অনুভূতিশক্তি মানুষের চেয়েও তীক্ষ্ণ হইতে দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে একথা সত্য যে, মানুষ তাহার অতুলনীয় মস্তিষ্ক ও সূক্ষ্ম পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায় এই রূপ-রসগন্ধ সমন্বিত বিচিত্র ধরণীর যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে, তাহা হইতে অন্ত্যজ প্রাণীরা সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত। যাহা হউক, প্রাণীদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর যে সকল মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখন তাহা একে একে বিবৃত করিতেছি।

সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিশক্তির কথা লওয়া যাক।

এমিবা, amœba একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। ইহাদের দেহ কেবল একটি কোষ, cell লইয়া গঠিত। অন্ধকার জায়গায় ইহাদের উপর উজ্জ্বল আলো ফেললে, প্রদীপ্ত অংশ আকুঞ্চিত করিয়া ইহারা অস্বস্তি জানায় এবং আলোকোজ্জ্বল স্থান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করে। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাদের কেবল আলোক অনুভব করিবার সামান্য ক্ষমতা বর্ত্তমান।

কেঁচো আর একটি চক্ষুহীন জীব। ইহাদের উপরেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আলো ফেলিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহারা উহাতে উত্তেজিত হয়। কেঁচোর গাত্রে কতকগুলি তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন কোষ ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে, চর্ম্মস্থ এই সকল কোষই উহার আলোকজ্ঞান জন্মায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি,

কেঁচো কেবল আলো ছায়ার পার্থক্য বুঝিতে পারে মাত্র, কোন জিনিষের আকার-প্রকার ইহাদের আদিম চক্ষুর অগোচর থাকিয়া যায়।

ব্যাঙের দুইটি চোখ আছে, কিন্তু ইহারা এত ক্ষীণদৃষ্টি যে সম্মুখস্থ পোকামাকড় যতক্ষণ না নড়ে, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, ভেকজাতি গাত্রচর্ম্ম দ্বারাও আলোক অনুভব করিতে পারে।

প্রাণীদের বর্ণজ্ঞান আছে কি না, তাহা লইয়াও অনেক গবেষণা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক বানর ছাড়া আর সব জীব-জন্তুই অল্পাধিক বর্ণান্ধ, colour-blind।

মধুমক্ষিকার বর্ণজ্ঞান এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়—বাগানে একটি টেবিল লইয়া গিয়া উহার উপর একটি নীল রঙের কার্ডবোর্ড স্থাপন করা হয়। তাহার পর ঐ কার্ডের উপর একটি কাচের পাত্র রাখিয়া উহাতে কয়েক ফোঁটা মিষ্ট সরবত ঢালিয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই মৌমাছিরা সেখানে আসিয়া ঐ সরবত আহরণ করিয়া চাকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। অল্পক্ষণ এইভাবে চলিবার পর, মৌমাছিরা যখন এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন একটু অদল-বদল করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে যে স্থান নীল কার্ডবোর্ড ও কাচপাত্রের দ্বারা অধিকৃত ছিল, তাহা খালি করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে ঐ জায়গার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে একটি কারয়া নীল ও লাল কার্ড বসাইয়া দিয়া তাহার উপর এক একটি শূন্য কাচ-পাত্র পূর্ব্বের মত রাখিয়া দেওয়া হয়। মৌমাছির দল আবার যখন টেবিলের নিকট আসে, তখন কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাহারা সোজা বাম দিকের নীল কার্ডের কাছে চলিয়া গিয়া উহার উপরস্থ কাচ পাত্রের নিকট উড়িতে থাকে। উহাতে প্রমাণ হয় যে, মৌমাছিরা লাল নীলের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে।

কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—মধুমক্ষিকাদের প্রকৃতপক্ষে নীল বর্ণজ্ঞান আছে, না উহারা নীল রঙকে গাঢ় ধূসর বর্ণ মনে করে? এইরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে, কারণ এক রকম বর্ণান্ধতা আছে, যাহার ফলে মানুষ লাল, নীল, হলদে, সবুজ,—কোন রঙেরই প্রভেদ করিতে পারে না। এইরূপ বর্ণান্ধ লোক সব কিছু কালো, সাদা না হয় ধূসর দেখে।

মৌমাছিরা বর্ণান্ধ কি না, তাহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে পরীক্ষা করা হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মধুমক্ষিকাদের প্রথমে নীল কার্ডবোর্ডস্থ সরবত সংগ্রহে অভ্যস্ত করা হয়। তাহার পর নীল কার্ডের চারিপাশে আরও কতকগুলি কালো, সাদা ও ধূসর বর্ণের কার্ড স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের উপরই ঐরূপ এক একটি খালি কাচ-পাত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। মৌমাছির ঝাঁক কিন্তু ঠিক নীল কার্ডের কাছেই উড়িয়া আসে। এই প্রণালীতে বিভিন্ন বর্ণের কার্ড লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মধুমক্ষিকারা সকল রঙই চিনিতে পারে; কেবল লোহিত বর্ণের বেলা দেখা গিয়াছে ইহারা ঐ রঙ কালো রঙের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলে। সুতরাং মৌমাছিদের কেবল রক্ত-বর্ণান্ধ বলা চলে।

প্রজাপতিরা কিন্তু নীল ও পীত বর্ণ ব্যতীত আর কোন রঙই চিনিতে পারে না। অন্য সকল বর্ণই ইহাদের নিকট গাঢ় ধূসর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মোরগের বর্ণশোভা আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু মুরগী কি তাহার সঙ্গীর রঙীন পালকের সৌন্দর্য্য আমাদের মতই দেখিতে পায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য একটি অন্ধকার ঘরে এমনভাবে একটি বাতি ও ত্রিকোণ কাচ, prism রাখা হয়, যাহাতে ঐ বাতির আলো ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া বাহির হইবার সময় রামধনুর সাতটি বর্ণে

বিভক্ত হইয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়ে। এখন ঐ বর্ণচ্ছত্রের সব সারির উপর শস্যকণা ছড়াইয়া দিয়া একটি মুরগী ধরিয়া আনিয়া ঐ ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুরগী ঘরে আসিয়াই ঐ সব শস্যকণা ঠুকরাইয়া খাইতে আরম্ভ করে। উহার আহার কার্য্য সমাধা হইলে উহাকে ঘরের বাইরে ছাড়িয়া দিয়া মেঝের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সবুজ, হলদে এবং লাল সারির প্রায় সকল শস্যকণাই মুরগীর উদরস্থ হইয়াছে; নীল সারির মাত্র অল্প কয়েকটি দানা ভক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু বেগুনী বর্ণস্থ দানাগুলি যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মুরগীর নীল বর্ণজ্ঞান তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু বেগুনী বর্ণ একেবারেই উহার দর্শনেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত।

অনেক পরীক্ষা করিয়াও কুকুরের কোন বর্ণজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহারা ধূসর বর্ণের বৈচিত্র্যহীন জগতে বাস করে। কিন্তু বানরের বেলা দেখা গিয়াছে, অভ্যাস করাইলে ইহারা নির্দ্দিষ্ট রঙ করা বাক্সের ঢাকনা খুলিয়া খাবার খাইতে পারে। ঐ বাক্সের পাশে অন্য রঙের খালি বাক্স রাখিয়া দিলেও উহারা ভুল করে না। জীবজগতে একমাত্র বানরই মানুষের মত বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন।

এইবার প্রাণীদের শ্রবণশক্তির বিষয় উত্থাপন করিতেছি।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল মাছেরা শুনিতে পায় না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মৎস্যজাতি কোনক্রমেই বধির নয়। প্রথমে জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় একটি মাছ ছাড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া উহাকে খাবার দেওয়া অভ্যাস করা হয়। ছয় সাতবার এইরূপ বংশীধ্বনি করিয়া আহার্য্য দিবার পর দেখা যায় মৎস্যটি বাঁশীর স্বর শুনিবামাত্র আহারের প্রত্যাশায় নিজেই কাছে চলিয়া আসে। বলা বাহুল্য পরীক্ষক পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া বংশী ধ্বনি করেন, সুতরাং মাছের তাহাকে দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে

না। শুধু ইহাই নয়, মৎস্যরা যে সুরের পার্থক্যও বুঝিতে পারে তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সর্পশরীরে কোথাও কাণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যে কোথায় অবস্থিত তাহা আজও অজ্ঞাত। সাপের শ্রুতিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য কর্ণেল ওয়াল একবার একটি গোখুরার মস্তকে আঠাযুক্ত ফিতা জড়াইয়া প্রথমে উহার দুই চক্ষু ঢাকিয়া দেন। তৎপরে উহার মাথার উপরে টিনের ক্যানেস্তারা বাজাইয়া প্রচণ্ড শব্দ করেন; কিন্তু গোখুরা যে ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়াছে, তাহাব কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না অথচ যেই তাঁহার সহকাবী ভূমির উপব জোবে জোবে কয়েকবার পদক্ষেপ করিল, অমনি সাপটি ফণা তুলিল। ইহাতে মনে হয় সাপ বায়ুবাহিত শব্দ শুনিতে পায় না, ভূমির কম্পনই কেবল ইহাদেব শ্রুতিগোচর হয়।

কুকুরেব শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। রিষ্টওয়াচের টিক্ টিক্ শব্দ আমরা কেবল ৪ ফুট দূব অবধি শুনিতে পাই; কিন্তু কুকুর ৪০ ফুট দূব হইতেও ঘড়ির মৃদু শব্দ অনাযাসে শ্রবণ করিতে পাবে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ কুকুরের বুদ্ধি ও শ্রুতিশক্তি সম্পর্কিত অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করেন, সম্মুখে কোন সুখাদ্য দেখিলে যেমন আমাদের মুখ সরস হইয়া উঠে, তেমনি ক্ষুধার্ত্ত কুকুবের সামনে আহার্য্য আনিলে উহাবও ঐরূপ লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। এখানে তাঁহার একটি বিখ্যাত পরীক্ষার উল্লেখ করিতেছি। কোন কুকুরকে খাবার দিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রত্যেকবার একরকম বিশেষ শব্দ করা হয়। এই রূপে কয়েকবার শব্দ করিয়া উহাকে ভোজ্য দেওয়াব পর ঐ কুকুরের ধারণা হইয়া যায় যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত আহারপ্রাপ্তির পূর্ব্বাভাস। এখন শুধু শব্দ শুনিলেই তাহার আপনা হইতে লালা পড়িতে থাকে। কিন্তু যদি

অন্যপ্রকারের শব্দ করা হয় তাহা হইলে উহার কোনরূপ ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে সুস্পস্ট প্রতীতি হয় যে কুকুরের শব্দজ্ঞান খুবই সূক্ষ্ম।

এতদ্ব্যতীত শব্দের দিক নির্ণয় করিবারও কুকুরের ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকমের। কোন জায়গা কার্ডবোর্ডের পর্দ্দা দিয়া গোল করিয়া ঘিরিয়া উহার মধ্যে একটি কুকুব ছাড়িযা দিয়া যদি চারিদিক হইতে শব্দ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, কোন্ দিক হইতে শব্দ করা হইতেছে, সে তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারে। এইরূপ ৩২টি ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে শব্দ করিলেও কুকুর তাহা নির্ভুলভাবে নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় মানুষ কেবল ১৬টি দিকেব পার্থক্যই নির্দ্দেশ করিতে পাবে।

কীটপতঙ্গেরা ডানা কাঁপাইয়া কিম্বা পা ঘষিয়া যে বিচিত্র গুঞ্জন উৎপন্ন করে, তাহাতে নীরব নিশা মুখব হইয়া উঠে। ইহাদেব যখন শব্দ কবিবার ক্ষমতা আছে, তখন শ্রবণ করিবারও কোন না কোন ব্যবস্থা থাকা আশ্চর্য্য নয়। উত্তমরূপে পরীক্ষা কবিলে পতঙ্গবিশেষের সম্মুখের পদদ্বয়ে কিম্বা উদরে যথার্থই শ্রুতিযন্ত্রের অস্তিত্ব পাওযা যায়।

অনেক প্রাণীর গন্ধবোধ মানুষেব চেয়ে ঢেব সূক্ষ্ম। শিকারী কুকুর মুখ নীচু করিয়া মাটি শুকিতে শুকিতে শিকারের সন্ধানে অগ্রসর হয়। পোষা কুকুর একদল লোকের মাঝখান হইতে শুধু গন্ধের দ্বারাই তাহার প্রভুকে ঠিক চিনিয়া বাহির করে। এক জাতীয় বুদ্ধিমান কুকুরকে গোয়েন্দার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা পলাতক অপরাধীর পরিত্যক্ত ছড়ি, ছাতা কিম্বা রুমালের ঘ্রাণ লইয়া কেবল উহার সাহায্যে দোষী ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করে। কুকুর ছাড়া অধিকাংশ চতুষ্পদ পশুরই ঘ্রাণশক্তি দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা তীব্র। কিন্তু পাখীর বেলা ইহা ঠিক উল্টা, ইহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ই অধিক শক্তিশালী।

কীটপতঙ্গের নাসিকা নাই। ইহারা মস্তকস্থ দীর্ঘ শুঁড়ের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করে। একপ্রকার পুরুষ-প্রজাপতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন যে, কয়েকশত গজ দূর হইতে ইহারা স্ত্রী-প্রজাপতির উপস্থিতি জানিতে পারিয়া উহার নিকট উড়িয়া আসে।

জলচর মৎস্যের স্পর্শানুভূতির সহিত আমাদের বোধশক্তির কোন তুলনাই হয় না। রজনীর অন্ধকারে কোন মগ্নশৈলের নিকটস্থ হইলে, ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বেই ইহারা উহার সান্নিধ্য টের পাইয়া সাবধান হইয়া যায়। মাছেরা কেমন করিয়া উহার উপস্থিতি বুঝিতে পারে? বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বে প্রসারিত দুইটি সূক্ষ্ম রেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সলিল মধ্যস্থ কোন উপলখণ্ডের সম্মুখীন হইলে জলের চাপের যে তারতম্য ঘটে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি সরু রেখার সাহায্যে মৎস্য তাহা বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হয়।

বাদুড় ও চামচিকার অনুভবশক্তি আরও অদ্ভুত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পালাঞ্জানি নামে একজন ইতালীয়ান বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে এক অভিনব পরীক্ষা করেন। তিনি কোন ঘরের কড়িকাঠ হইতে সূতা বাঁধিয়া কতকগুলি ঘণ্টা ঝুলাইয়া দেন। তাহার পর ঐ ঘর অন্ধকার করিয়া একটি বাদুড় ধরিয়া আনিয়া সেখানে ছাড়িয়া দেন। বাদুড়টি কিন্তু অন্ধকারে উড়িবার সময় সূতা বাঁধা ঘণ্টাগুলি ঠিক এড়াইয়া গেল এবং সেইজন্য কোন ঘণ্টাই বাজিল না। কাহারও কাহারও মতে বাদুড়ের মুখের চামড়া এত অনুভূতিসম্পন্ন যে কোন কঠিন পদার্থের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে বাতাসের চাপের যে সামান্য পরিবর্ত্তন হয়, বাদুড় তাহা এই সূক্ষ্ম চর্ম্মের সাহায্যে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া আগে হইতে সাবধান হইয়া যায়।

মানুষের যেমন সময়জ্ঞান আছে, নিম্নশ্রেণীর কোন জীবের সেরকম সময়বোধ আছে কি না, তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক!

মৌমাছির কালজ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানে তাহার বিষয় বলিতেছি। আগের মত বাগানে একটি টেবিল স্থাপিত করিয়া উহার উপর কোন আধারে মিষ্ট রস রাখিয়া দেওয়া হয়। মধুমক্ষিকারা মধুর সন্ধানে ঠিক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। মৌমাছিরা যখন শর্করা রস সংগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত, সেই সময় উহাদের দেহ রঙের ফোঁটা দিয়া চিহ্নিত করিয়া ফেলা হয়। এইরূপে উহাদের কয়েক দিন নিয়মপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিষ্ট রস প্রদান করিবার পর দেখা যায় যে, ঐ সকল চিহ্নিত মধুমক্ষিকারা প্রতিদিন ঠিক সময় সুমিষ্ট পানীয়ের লোভে তথায় আসিয়া হাজির হয়। অন্য সময় তাহাদের বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এমন কি রস রাখা বন্ধ করিয়া দিলেও, পাঁচ সাত দিন তাহারা নিয়মিত ঐ সময় আগমন করে। ইহারা এত নির্ভুলভাবে কিরূপে সময় নির্দ্ধারণ করে? বৈজ্ঞানিকরা বলেন, দেহাভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের হারই মৌমাছির সময়জ্ঞান জন্মায়। ইহাদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। থাইরয়েড গ্রন্থিরস, thyroid extract উত্তেজক পদার্থ, ইহা সেবনে শারীর ক্রিয়া দ্রুত হয়। পূর্ব্বোক্ত মধুমক্ষিকাদের ইহা পান করাইয়া দিলে উহারা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই চলিয়া আসে। আবার ঐ সকল মৌমাছিদের অল্প পরিমাণ কুইনিন উদরস্থ হইলে, উহারা গম্যস্থানে কিছু বিলম্বে গিয়া পৌঁছায়। থাইরয়েড উহাদের শারীর ঘটিকা আগাইয়া দেয়, কুইনিন উহা পিছাইয়া দেয়।

এখন জীবজন্তুর কয়েকটি অদ্ভুত ক্ষমতার উল্লেখ করিব।

অনেকেই বোধ হয় জানেন, অতি-বেগুনী রশ্মি, ultra-violet ray মানবচক্ষুর অগোচর। কিন্তু মৌমাছিরা যে তাহাদের যৌগিক চক্ষু দিয়া এই অদৃশ্য অতি-বেগুনী আলোও দেখিতে পায়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুকুরের শ্রবণশক্তি এক বিষয়ে মানুষের চেয়ে ঢের প্রখর। খুব সরু স্বর—যাহা আমাদের কর্ণগোচর হয় না, কুকুর তাহাও সুস্পষ্ট শুনিতে পায়। গাল্টন সাহেব নিজোদ্ভাবিত বাঁশীর সাহায্যে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পশুপক্ষীরা কেমন করিয়া বহুদূর হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহাও আর একটি অজ্ঞাত রহস্য।

বিলাতে একবার এক ব্যক্তি নিজের পাঁচটি কুকুর সঙ্গে লইয়া ট্রেণে করিয়া ২৫ মাইল দূরে কোন জায়গায় শিকার করিতে গিয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভুলক্রমে তাহার কুকুরগুলি সেখানেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচটির মধ্যে চারিটি কুকুরই তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর ব্রিমেন নামক স্থানে পরীক্ষার জন্য সাতটি চাতক পাখী ধরা হয়। চিনিবার যাহাতে সুবিধা হয় সেজন্য তাহাদের কয়েকটি শাদা পালকে লাল রঙ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর চাতকগুলিকে এরোপ্লেনে করিয়া ব্রিমেন হইতে ৪০০ মাইল দূরে ইংলণ্ডের ক্রয়ডন নামক স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাতটির মধ্যে পাঁচটি চাতকই ব্রিমেনে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দৌড়ের পায়রা, racing pigeon যে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কানাডায় এক জাতীয় জলচর পক্ষী, plover বাস করে। গ্রীষ্মাবসানে ইহারা কানাডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া যায়। সমুদ্রের উপর দিয়া অবিশ্রাম উপর দিয়া ২৫০০ মাইল উড়িয়া, তবে ইহারা গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছায়। জলচারীদের এই কার্য্য যে অসাধারণ

সহনশীলতাব পরিচয়, শুধু তাহাই নহে, অকূলপাথারে ইহারা কিরূপে দিক নির্ণয় করে তাহাও ভাবিবা'র বিষয়। বিজ্ঞান এখনও ইহার কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়।

জীবজন্তুর মনস্তত্ত্ব

সকলেই জানি, ক্ষুধার্ত্ত কুকুবের সম্মুখে আহার্য্য রাখিলে, উহাব লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। পবীক্ষাব জন্য প্রথমে কুকুবকে একটি নির্জ্জন কক্ষে আটক করিয়া রাখা হয়। ক্ষুধাব সময় প্রতিবাব উহাকে আহার দিবার স্বল্পক্ষণ পূর্ব্বে একপ্রকাব শব্দ করা হয়। এইরূপ কয়েকবার শব্দ কবিয়া ভোজ্য দেওয়াব পর কুকুবের ধাবণা হইয়া যায় যে, ঐ বিশেষ শব্দ আহাবপ্রাপ্তিব পূর্ব্বাভাস। তখন শুধু শব্দ শুনিলেই তাহার আপনা হইতেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। পাঠক বুঝিয়াছেন বোধ হয় যে, ইহা অভ্যাসজনিত পরাবর্তক ক্রিয়া ছাড়া আব কিছুই নয়। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, অর্জ্জিত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা কম শক্তিশালী এবং ইহার গতিও অপেক্ষাকৃত মন্থব।

জীবজন্তুর মধ্যে আত্মরক্ষামূলক বা বংশরক্ষামূলক কতিপয় জন্মগত প্রবৃত্তি পবিদৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানীরা এইগুলির সহজাত সংস্কাব, instinct নাম দিয়াছেন। সহজাত সংস্কারের বশে কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীরা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই সকল কার্য্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহা সম্পন্ন করিতে কোনরূপ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা, অভ্যাস বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জীবজন্তুরা ঠিক কলের মত নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লয়। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে,

তাহা হইলে ইতর প্রাণীরা মোটেই উহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি অন্ত্যজ জীবদিগকে কেবল নির্দ্দিষ্ট আবেষ্টনীর উপযোগীই কতকগুলি মানসিক শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নিপুণ ইঞ্জিনীয়ারের মত বীবরের খাল কাটা ও বাঁধ দেওয়া, বাবুই পাখীর তাঁতীর মত টানাপোড়েন দিয়া বাসা নির্ম্মাণ, মাকড়সার জটিল জাল প্রস্তুত করা, গুটিপোকার গুটি তৈয়ারী করা—এ সবই সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া। এই সকল কার্য্য করিতে উহাদের কোনই শিক্ষালাভ করিতে হয় না। বাবুই পাখী কিম্বা মাকড়সাকে যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অন্যত্র পালন করা হয়, তাহা হইলেও উহারা বড় হইয়া ঠিক স্বজাতিসুলভ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা জীবনযাত্রায় উপযোগী সকল প্রকার সংস্কার লইয়া এ জগতে আগমন করে বলিয়া উহাদের বৃদ্ধিকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে ধীমান চতুষ্পদ পশু ও মানুষের পিতামাতার নিকট অনেক কিছু শিখিবার থাকে বলিয়া প্রকৃতি ইহাদের বৃদ্ধিকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়াছেন।

বুদ্ধির সংজ্ঞা এইভাবে নির্দ্দেশ করা হয়—(১) শিক্ষালাভ করিবার সামর্থ্য, অথবা (২) পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে আনিবার ক্ষমতা। সুতরাং কোন প্রাণীর মধ্যে যে অনুপাতে এই দুই শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান বলা চলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কেঁচোর উপর পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথমে এমন একটি সরু নল লওয়া হয় যাহা মূল হইতে কিছুদূর গিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা ইংরাজী 'y'এর মত। কেঁচোকে ধরিয়া নলের প্রবেশমুখে স্থাপন করিয়া দিলে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং

হয় ডান দিকে কিম্বা বাঁ দিকে চলিয়া আসে। এখন নলে বাঁ দিকের শাখায় এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে, কেঁচোটি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ঈষৎ বৈদ্যুতিক শক পায়। কিন্তু নলের দক্ষিণ শাখায় ঐরূপ কোন ব্যবস্থা না থাকায় উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এইরূপে নলের মধ্য দিয়া কয়েক বার যাতায়াত করিবার পর কেঁচোটি ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, বাঁদিকে গমন করা সুবিধাজনক নয়। তখন সে কেবল ডানদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অতি ক্ষুদ্র জীব কেঁচোরও যৎসামান্য শিক্ষা করিবার শক্তি তথা বুদ্ধি বর্ত্তমান।

মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে পশুপক্ষীরা অনেক সময় আশ্চর্য্য ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু মানুষের আহার্য্য ব্যতিরেকে ইহারা যাহা কিছু শিখে তাহাতে ইহাদের আরও বেশী কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কুকুরের আত্মচেষ্টায় শিখিবার ক্ষমতা এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়—ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের সামনে একটি বাক্সে খাবার রাখিয়া উহার ঢাকনাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঢাকনার সহিত একটি হাতল এমনভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উহাতে চাপ দিলে ঢাকনাটি খুলিয়া আসে। কুকুরটি প্রথমে অর্থহীন ভাবে বাক্সের চারিপাশ পা দিয়া আঁচড়াইতে থাকে, তাহার পর ঘটনাক্রমে যেই হাতলে পা লাগিয়া ঢাকনা খুলিয়া যায় অমনি সে তত্রস্থ খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। এইরূপে এলোমেলো ভাবে আঁচড়াইয়া দুই একবার ঢাকনা খুলিবার পর কুকুরটি বাক্স খুলিবার সহজ উপায়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখন সে সোজাসুজি হাতল ঠেলিয়া ঢাকনা খুলিয়া ফেলে।

জীবজন্তুর শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা পদে পদে ভুল করিয়া তবেই ঠিক পথটি ধরিতে পারে (এক কথায় ইহারা ঠেকিয়া শিখে)। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজে হাত দেওয়া ইহাদের কোষ্ঠিতে নাই।

সচরাচর ইতর প্রাণীদের কোন রকম অনুকরণ করিবার ক্ষমতা দেখা যায় না। কেবল বানর মানুষের অঙ্গভঙ্গী কিছু কিছু নকল করিতে পারে। ইহা ছাড়া টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পাখীর গলার স্বর অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অল্লাধিক দেখা যায়।

জৈবমনোবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বিচারকালে আরও দুইটি কথা পাঠককে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি—প্রথম, জীবজন্তুর সমস্ত কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক ; দ্বিতীয়, প্রত্যেক প্রাণীরই সুখজনক কর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ এবং দুঃখজনক কর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ বিদ্যমান।

ইতর প্রাণীরা পরস্পরের নিকট কিরূপে স্ব-স্ব মনোভাব প্রকাশ করে তাহার আলোচনা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বলা বাহুল্য আমাদের মত উহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা বা বাক্য নাই, উহারা কেবল হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি মানসিক আবেগ শব্দ কিম্বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র। খরগোস ভয় পাইলে মাটিতে পিছনের পা ঠুকিয়া বিপদসূচক একরকম শব্দ করে, ইহাতে দলের অন্যান্য খরগোস সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। কর্ম্মী মৌমাছি মধুপূর্ণ নূতন পুষ্পের খোঁজ পাইলে বাসায় ফিরিয়া একপ্রকার বিশেষ নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়, ইহাতে তাহার সহকর্ম্মীরা বুঝিতে পারে যে, কাছাকাছি কোথাও মধুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হইয়া তদন্বেষণে বহির্গত হয়। মুরগী যখন আপন শাবকগুলি লইয়া আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা ঘটে তাহা হইলে এক প্রকার ভয়ার্ত্ত রব করে। শাবকগুলি এই রব শুনিবামাত্র মাতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। পিপীলিকারা পরস্পরের শুঁড় স্পর্শ করিয়া কথোপকথন চালায়।

এতক্ষণ জীবজন্তুর চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা

হইতেছিল। এবার বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর স্বভাব সম্বন্ধে জৈব মনস্তত্ত্ববিদ্ ও পশুশিক্ষকদিগের অভিমত বিশদভাবে বিবৃত করিব।

পুকুরের জলে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, slipper animalene বাস করে। জলে বিচরণ করিতে করিতে কোন কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা তৎক্ষণাৎ পিছু হটিয়া আসে এবং অল্প বাঁকিয়া আবার নবীন উদ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হয়। পুনরায় যদি বাধা পায় তাহা হইলে আবার পশ্চাতে সরিয়া আসে। এইরূপে যতক্ষণ না পাশ কাটাইতে পারে ততক্ষণ ইহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। দৈবক্রমে যদি তাহাদের এই অন্ধ প্রয়াস সফল হয়, তখন নিরস্ত হয়। ইহারা এতই নির্ব্বোধ যে অন্য কোন উপায়ে বাধা অতিক্রম করিতে পারে না।

মৌমাছির জীবন ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক। প্রথমে পূর্ণগঠিত হইয়াই কর্ম্মী-মক্ষিকা স্বীয় কক্ষ পরিষ্কার করিয়া ফেলে। ইহার তিন দিন পরে সে অন্যান্য শাবকগুলিকে আহার প্রদান করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর কর্ম্মী মাছি চক্রে প্রত্যাগত অধিক বয়স্ক মক্ষিকার মুখ হইতে মিষ্ট পুষ্পরস গ্রহণ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলে এবং পাকস্থলীর ভিতর যখন ঐ পুষ্পরস মধুতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তখন সে উহা উগরাইয়া চাকের নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখে। ইহার দুই একদিন পরে সে চক্র পরিষ্কার রাখিবার ভার লয়। তদনন্তর কর্ম্মী-মক্ষিকা নিজ দেহ হইতে মোম উৎপন্ন করিয়া নূতন নূতন কোষ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। আরও কিছুদিন পরে সে দ্বার-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। চক্রে অপর জাতীয় কোন মৌমাছি প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে হুল ফুটাইয়া নিরস্ত করিয়া দেয়। অবশেষে ২০ দিনের দিন, সে পুষ্পরস ও পরাগ সংগ্রহার্থ বাসা হইতে বহির্গত হয়। আমরা দেখিলাম—কর্ম্মী-মক্ষিকা একের পর এক কাজ কলের মত পর পর নিষ্পাদন করিয়া যায়। এই সব কাজ করিতে তাহার কোন

শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সে এই সকল জটিল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া ফেলে।

কয়েক জাতীয় পিপীলিকার ভিতর সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া আরও আশ্চর্য্যভাবে প্রতীয়মান হয়। এক শ্রেণীর পিঁপড়ে বাসস্থানের নিকট একরকম ছত্রাক রোপণ করে। পরে এই ছত্রাক, fungus উহাদের আহার জোগায়। আবার আর এক জাতীয় পিঁপড়ে, আমরা যেমন দুধের জন্য গরু রাখি, সেই রকম মিষ্টরস প্রদানকারী একপ্রকার কীট পালন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত একপ্রকার যোদ্ধা পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। ইহারা অপর জাতীয় পিপীলিকার বাসভূমি আক্রমণ করিয়া তথা হইতে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া আনে এবং তাহাদের দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণ, সন্তান-পালন, খাদ্য-সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করাইয়া লয়।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে মৌমাছি ও পিঁপড়েরও সামান্য শিখিবার ক্ষমতা আছে। পিঁপড়ে নিজ বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন রাস্তাঘাট ভাল করিয়া জানিয়া রাখে। মৌমাছিও চক্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় এক ক্রোশ জায়গা চিনিয়া ফেলে এবং সেজন্য খাদ্য সংগ্রহের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইহাদের কোন অসুবিধা হয় না। আরও দেখা গিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় কয়েকদিন নিয়মিত মিষ্টরস প্রদান করিলে মৌমাছিরা ঠিক সেই স্থানে সেই সময় আগমন করিতে সক্ষম হয়।

মৎস্যই প্রথম মেরুদণ্ডী জীব। ইহাদের যৎসামান্য বোধশক্তি আছে। থর্নডাইক কাচের চৌবাচ্চায় মাছ ছাড়িয়া উহার বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছেন। চৌবাচ্চার পশ্চাৎদিকে লোভনীয় খাদ্যবস্তু রাখিয়া সম্মুখভাগে মৎস্যকে স্থাপন করা হয়। মাঝখানে পর পর কয়েকটি কাচের দেওয়াল থাকে। প্রত্যেক দেওয়ালে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। বলা বাহুল্য ছিদ্রগুলি ঠিক এক লাইনে থাকে না। মৎস্যপ্রবর প্রথমে অবশ্য উপর্য্যুপরি কয়েকবার কাচের

দেওয়ালে ধাক্কা খায়, তাহার পর কিন্তু সে ঠিকভাবে সব কটি ছিদ্র অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত আহার্য্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

উভচর ভেক জাতির শিখিবার সামর্থ্য আছে, যদিও উহাদের এই ক্ষমতা যৎসামান্য। ইহারা প্রধানতঃ সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

টিকটিকি, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীসৃপের মানসিক গঠনও বিশেষ উন্নত নয়। মনোবিজ্ঞানী ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাচিত স্থানে ইহাদের কোন প্রিয় আহার্য্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ঐ স্থানে যাইবার একটি উঁচু-নীচু, আঁকাবাঁকা পথ থাকে। প্রথম প্রথম ইহারা এলোমেলোভাবে খাদ্যের প্রত্যাশায় অগ্রসর হয়, কিন্তু নির্দ্ধারিত জায়গায় কয়েকবার ঠিকভাবে পৌছিবার পর ইহাদের অভ্যাস হইয়া যায়। তখন আর তথায় গমন করিতে ইহাদের কোন ভুল হয় না।

কীটপতঙ্গাদির মত পাখীরাও প্রধানতঃ সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে ইহাদের কোন কোন কার্য্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা পাইলে পায়রা দুই একটি ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে। পক্ষী-জাতির পরিমাণ-জ্ঞানের অল্পস্বল্প লক্ষণ পাওয়া যায়। বাসা হইতে চারিটি ডিমের মধ্যে দুইটি ডিম অপসারিত হইলে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু চারিটি হইতে একটিমাত্র ডিম সরাইয়া লইলে সে তাহা বুঝিতে পারে না।

মুরগীকে এক সারি শস্যকণার মধ্যে কেবল একটি দানা অন্তর একটি দানা গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রথমে একটি শস্যকণা অন্তর একটি শস্যকণা মাটিতে আঠা দ্বারা সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করা হয়। মুরগী তথায় আসিয়া শীঘ্রই অসংলগ্ন প্রতি দ্বিতীয় শস্যের দানা ভক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। তদনন্তর শস্যসারির একটিও দানা আর ভূমি সংলগ্ন না রাখিয়া

মুরগীকে আহার করিতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু উহার অভ্যাস এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সে পূর্ব্বের মত একটি দানা অন্তর অন্তর শস্যকণা উদরস্থ করিতে থাকে।

ইঁদুর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশু। গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ছাড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা অল্পায়াসে গমনাগমনের পথ চিনিয়া ফেলে। ইঁদুর ছানা বেশ পোষ মানে এবং পালকের হাতে, পায়ে ও কাঁধে উঠিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। কিন্তু হাতে করিয়া টিপিয়া ধরিলে ইহারা বড় বিরক্ত হয় এবং বিরাগভাজনকে দংশন করিয়া ছাড়ে। খরগোস ও কাঠবেড়ালী অনেকেই পুষিয়াছেন এবং ইহাদের চালচলনও সকলেই জানেন।

হরিণশিশু, ছাঁগলছানা ও ভেড়ার শাবক সহজেই মানুষের বাধ্য হয়। ইহারা পালককে খুব চিনিতে পারে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করে। এই সকল তৃণভোজী জন্তুরা মৃদুমন্দ চাপড় মারিয়া আদর করা খুব পছন্দ করে। কিন্তু হাতে করিয়া তুলিয়া ধরা মোটেই ভালবাসে না। সব পশুদের বিচারবুদ্ধি বিশেষ উন্নত নয়। ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও তত তীক্ষ্ণ নয়, গলার স্বর ও আঘ্রাণ হইতে ইহারা প্রধানতঃ লোক চেনে।

যদিও বহুকাল হইতে উট গৃহপালিত পশুর অন্তর্গত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজও ইহাদের ঠিকভাবে পোষ মানানো সম্ভবপর হয় নাই। ইহারা অল্পস্বল্প নিজ নিজ প্রভুর আজ্ঞা পালন করে বটে, কিন্তু ইহাদের স্বভাবের কোন ঠিক নাই। কোন কারণে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইলেই কি পালক, কি আগন্তুক, কোন বিচার না করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়। তবে খাদ্যপ্রদানকারীর উপর ইহাদের যৎসামান্য প্রীতির ভাব দেখা যায়।

হস্তীশাবক সাধারণতঃ শান্ত, বন্ধুভাবাপন্ন ও কৌতুকপ্রিয় হয় এবং রক্ষকের প্রতি তাহার প্রবল আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। হাতীর স্মরণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, কেহ কোন অপকার বা উপকার করিলে সহজে তাহা বিস্মৃত হয়

না। শিক্ষিত হস্তীর সার্কাসে ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন সকলেই উপভোগ করিয়াছেন।

দৈহিক গঠনে ব্যাঘ্রের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় বিড়ালকে চলিত কথায় বাঘের মাসী বলা হয়। খাদ্যের লোভ দেখাইয়া পোষা বিড়ালকে কয়েকটি কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। মার্জ্জারকুলের গৃহস্বামী অপেক্ষা গৃহের প্রতি যেন অধিক আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

জীবজন্তুর মধ্যে কুকুরই বোধ হয় মানুষের প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভই কুকুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখা যায়, তেমনি কুকুরের স্বভাবের পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে উদ্ধত, বিষণ্ণ, উদ্যমী ও নিরীহ—প্রধানতঃ এই চার রকমের কুকুর আছে। পাভলভ আরও বলেন যে, অবস্থা বিশেষে উদ্বেগ অথবা মানসিক দ্বন্দ্ব হইতে মানুষের যেমন নিউরাসথিনিয়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির উদ্ভব হয়, তেমনি কুকুরেরও অনুরূপ স্থলে মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। তিনি উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে কুকুরের মানসিক ব্যাধি নিরাময় করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাঁহারা কুকুর পুষিয়াছেন তাঁহারা ভাল করিয়া জানেন যে, পোষা কুকুর মানুষের দুই একটি কথা বুঝিতে পারে। এখানে মিষ্টার হারবার্ট নামে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক নিজের পোষা কুকুরকে কি রকম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বিষয় বলিতেছি। তাঁহার 'ফেলো' নামে একটি চতুর জার্ম্মাণ মেষপালক কুকুর ছিল। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কুকুরটিকে কয়েকটি মৌখিক আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এই কুকুরটিকে মিষ্টার হারবার্টের অনুপস্থিতিতে নানা

ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস 'ফেলো' মানুষের ভাষা অল্পস্বল্প বুঝিতে পারিত।

সার্কাসে ব্যাঘ্র-সিংহ-ভল্লুকাদির ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ পাই। প্রাণীশিক্ষকগণ পশু বশ করিবার জন্য প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করেন—

(১) ভয় প্রদর্শন ও শাস্তিদান।

(২) পুরস্কার প্রদান (এক্ষেত্রে অবশ্য খাদ্যবস্তু)। বিশেষজ্ঞদের মতে যে সকল বন্যপশু শৈশবে বেশী দিন ধরিয়া পিতামাতার সান্নিধ্য ও স্নেহাদর লাভ করে, পরে তাহারাই সহজে মানুষের পোষ মানে এবং শিক্ষা করিবার ক্ষমতাও নাকি তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা আরও বলেন, বাঘ, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরা যত দিন ছোট থাকে, ততদিন তাহারা খুব পোষ মানে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক হইয়া গেলে ইহাদের মেজাজের ঠিক থাকে না এবং তখন ইহাদের সংসর্গ বিশেষ নিরাপদ নয়। এইসকল মাংসাশী পশুদের স্মৃতিশক্তি প্রখর। ইহারা বহু বৎসর অদর্শনের পরও সাক্ষাৎ পাইলে পূর্ব্ব প্রভুকে ঠিক চিনিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। বিড়াল হইতে ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর সমস্ত মাংসাশী জন্তু হাত বুলাইয়া আদর করা বিশেষ পছন্দ করে।

ইতরপ্রাণীর মধ্যে শিম্পাঞ্জী সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব। ইহাদের বুদ্ধি ব্যতীত যুক্তি ও বিচার করিবারও অত্যল্প ক্ষমতা আছে। কোন উঁচু জায়গায় আহার্য্য রাখিয়া দেওয়ায় ইহারা নিকটস্থ পরিত্যক্ত খালি বাক্স একটির উপর আর একটি চাপাইয়া ঈপ্সিত খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়াছে, এরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। লণ্ডন জীবনিবাসে স্যালি নামে একটি শিম্পাঞ্জী ছিল, সে এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গুণিতে পারিত বলিয়া শুনা যায়। কনসাল নামে আর একটি শিক্ষিত শিম্পাঞ্জীর বিষয় জানা যায়।

তাহার নামে ব্যাঙ্কে টাকা ছিল এবং সেই টাকা সে চেকে নিজের নাম সহি করিয়া তুলিত। অবশ্য নামসহির মর্ম্ম সে অবগত ছিল না। এতদ্ব্যতীত শিম্পাঞ্জীরা যে ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, টেবিলে বসিয়া সভ্যভব্যভাবে ভোজন করিতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। কোন কোন শিম্পাঞ্জী আবার সাইকেল চড়িতে বেশ পটুতা প্রদর্শন করে।

প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম ম্যাকডুগাল বলেন যে, চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী পশুদের মন নিম্নলিখিত চৌদ্দটি সহজাত সংস্কার লইয়া গঠিত :—
(১) অপত্যস্নেহ (২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি (৩) অনুসন্ধিৎসা (৪) খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি (৫) বর্জ্জন করিবার বাসনা (৬) পলায়ন স্পৃহা (৭) দলবদ্ধ হইয়া বাসের অভিরুচি (৮) সহানুভূতি (৯) প্রাধান্যলাভের চেষ্টা (১০) নম্রতা (১১) যৌন প্রবৃত্তি (১২) সঞ্চয় করিবার অভিলাষ (১৩) সংগঠন প্রচেষ্টা (১৪) কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা। ম্যাকডুগালের মতে পশুদের সকল কার্য্যই উল্লিখিত চতুর্দ্দশ প্রকার মৌলিক বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা এতক্ষণ এককোষ বিশিষ্ট জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকোষ বিশিষ্ট বানর পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রাণীর ব্যবহার সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জৈব মনের ক্রমবিকাশ এইভাবে ধাপে ধাপে সংসাধিত হইয়াছে—

প্রথম অবস্থা :—কেবল স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া,

দ্বিতীয় অবস্থা :—স্মৃতির সামান্য উন্মেষ,

তৃতীয় অবস্থা :—বুদ্ধির বিকাশ,

চতুর্থ অবস্থা :—বিচার ও যুক্তির উদ্ভব।

মানুষকে সম্মোহিত হইতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইতর প্রাণীদেরও

সম্মোহিত করা সম্ভব। সম্মোহন করিবার দুইটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে—

(১) অকস্মাৎ তীব্র উত্তেজনা প্রয়োগ,

(২) অবিরাম মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ।

প্রথম পদ্ধতি—ফড়িঙ, কাঁকড়া, বেঙ, পাতিহাঁস, খরগোস, ছাগল, শুয়র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীবকে অতর্কিতভাবে ধরিয়া হঠাৎ চিৎ করিয়া দিলে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। সাপের ঘাড় ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দিলে সে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—এই প্রণালীতে চিংড়ি, মুরগী, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীকে সম্মোহিত করা সম্ভব। প্রথমে ইহাদের দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ একভবে ধরিয়া রাখা হয়। তৎপরে ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু হস্ত অপসারিত হইলেও উহারা পূর্ব্বে যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল ঠিক সেইভাবে স্থির হইয়া কয়েক মিনিট অবস্থান করিতে থাকে। পাভলভ কোন কুকুরের কানের কাছে একঘেয়ে অবিরাম মৃদু শব্দ করিয়া, তাহাকে সম্মোহিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

(1) Animal Behaviour, by Lloyd Morgan.

(2) Behaviour of Lower Organisms, by Jennings.

(3) Animal Intelligence, by Holmes.

(4) Mentality of Apes, by Kohler.

(5) Almost Human, by Yerkes.

(6) Science of Life, by Wells & Huxley.

(7) An Outline of Psychology, by McDougall.

জীব-জন্তুর ক্রীড়া কৌতুক

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের খেলাধূলা করিবার আগ্রহ জন্মগত। সেই সুদূর প্রাচীন যুগেও ভারত, মিশর, গ্রীস, রোম ও ব্যাবিলনের শিশুরাও যে খেলা করিত, তাহা যাদুঘরে সংরক্ষিত সেই সময়কার পুতুলখেলনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীকে শৈশব ও বাল্যে ক্রীড়াকৌতুক মত্ত থাকিতে দেখা যায়।

বিড়াল ছানার কৌতুকপ্রিয়তা কে না উপভোগ করিয়াছেন। নেকড়ার ফালি, সূতার গুটি, কাগজের টুকরা কিম্বা ঐ জাতীয় অন্য কোন বস্তু মার্জ্জার শাবকের সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলিত করিলেই সে সবেগে ঝম্প প্রদান-পূর্ব্বক উহা ধরিতে আসে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বিড়ালের এই রসবোধ বিলুপ্ত হয়, তখন সে বাল্যচপলতা পরিত্যাগ করিয়া ভারিক্কি চালে ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে ভালবাসে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক বিড়ালের এক প্রকার ক্রীড়ার প্রতি আজীবন আকর্ষণ থাকিয়া যায়,—তাহা হইতেছে ধৃত ইঁদুর লইয়া খেলা। ইহারা জীবন্ত ইঁদুর ধরিতে পারিলে তখনি তাহাকে বধ না করিয়া খানিকক্ষণ উহাকে লইয়া খেলা করে। একবার করিয়া হতভাগ্য ইঁদুরটিকে ছাড়িয়া দেয় এবং সে বেচারী যেই পলায়নপর হয়, অমনি তাহাকে আবার বন্দী করিয়া ফেলে। এইরূপে কিছুক্ষণ কৌতুক করিবার পর উহাকে বধ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কুকুর ছানারা সাধারণতঃ দল বাঁধিয়া খেলাধূলা করে। ইহারা আক্রমণের ভান করিয়া পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কিছুক্ষণ মাটিতে লুটাপুটি করিয়া পুনরায় গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তবে ইহাদের কৌতুকবোধ এত সূক্ষ্ম যে, ইহারা কৃত্রিম যুদ্ধের সময় কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া

সঙ্গী সাথীকে মারাত্মকভাবে দংশন করে না। উহারা ভাল করিয়াই জানে কোন্ সময় থামিতে হইবে। কখনও কখনও সারমেয় শাবককে নিজের লেজের পিছনেই অনবরত ঘুরিতে দেখা যায়।

ছাগল ছানা, ভেড়ার বাচ্চা ও হরিণ শিশুকে নাচিয়া কুঁদিয়া এই রকম খেলা করিতে দেখা যায়। খরগোস ছানাকেও স্ফুর্ত্তিভবে এইরূপ উল্লম্ফন করিতে দেখিয়াছি।

সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী পশুদেব মধ্যেই বাল্যকালে ক্রীড়াকৌতুকের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের খেলাধূলাও কমিয়া যায়। তবে বয়স্ক পশুরা যে একেবারেই আমোদপ্রমোদ করে না তাহা নয়। শুশুক এক প্রকার জলজন্তু বিশেষ। এক এক সময়ে ইহারা সমুদ্রগামী জাহাজের চারিপাশে ওলটপালট খাইয়া সাঁতরাইয়া এমন রঙ্গ করিতে থাকে যে, ইহাতে জাহাজের যাত্রী ও নাবিকেরা বিশেষ কৌতুক বোধ করে।

শিম্পাঞ্জীব ক্রীড়াকৌতুক আর একটু উঁচু দরের, কারণ ইহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী। নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। কোন এক জীবনিবাসে শিম্পাঞ্জীর খাঁচার কাছে কতকগুলি মুরগীকেও রাখা হইয়াছিল। শিম্পাঞ্জীদের খাইবার জন্য রুটি দেওয়া হইত। ইহার মধ্যে একটি শিম্পাঞ্জী করিত কি, রুটি চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে হস্তস্থিত রুটির টুকরাটি খাঁচার বাহিরে বাড়াইয়া দিত। যেই কোন মুরগী উহাতে ঠোকরাইতে আরম্ভ কবিত অমনি সে উহা ভিতরে টানিয়া লইত। কখনও আবার দুইটি শিম্পাঞ্জীতে মিলিয়া খেলা করিত। একজন রুটি বাড়াইয়া ধরিত এবং মুবগীটি যেই ঠোকরাইতে আসিত, অন্যটি তখন একটি ছড়ি দিয়া তাহাকে খোঁচা মারিত। এই খেলাটি কপিদ্বয় নিজেরাই উদ্ভাবন করিয়াছিল।

এখন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব—জীবনে খেলার কি বাস্তবিক কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্রীড়ার দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। প্রথম, পরিণত জীবনে যে সকল কাজ সম্পাদন করিতে হইবে বাল্যে খেলাধূলার মধ্য দিয়া তাহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা হয়। বিড়াল ছানা সুতার গুটি লইয়া খেলা করিতে করিতে অবশেষে ইঁদুর ধরায় পরিপক্ক হইয়া উঠে। কুকুর বাচ্চা পরস্পরের সহিত ক্রীড়াকৌতুকের ভিতর দিয়া আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় দক্ষতা লাভ করে। বাঘ ও সিংহ অনেক সময় কোন ক্ষুদ্র পশুকে আহত অবস্থায় ধরিয়া আনিয়া শাবকদিগের নিকট ছাড়িয়া দেয়। উহাদের ছানারা ঐ আহত জন্তু লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পরিশেষে উহাকে হত্যা করে। এইরূপে খেলার ছলে ইহারা শিকার ধরা শিখিয়া লয়। কিন্তু এই প্রকার খেলার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ কেবল স্তন্যপায়ী পশুদের ভিতরই দেখা যায় এবং সেইজন্য বাল্য ও কৈশোরে চতুষ্পদ জন্তুরা প্রায়ই ক্রীড়ারত থাকে।

কিন্তু পক্ষী জাতি প্রধানতঃ জন্মগত প্রবৃত্তির, instinct-এর দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তাহাদের শিক্ষালাভের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ইহারা বাল্যে বিশেষ খেলাধূলা করে না। তবে আর একটি কথা আছে। যথেষ্ট পানভোজন এবং বিশ্রামের পর শরীরে যে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চিত হয় তাহা প্রায় সব জীবজন্তুই ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া ব্যয় করিতে ব্যগ্র হয়—Play is the overflow of surplus nervous energy. ইহাই খেলাধূলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। পূর্ণবয়স্ক পশু এবং পাখীরা সচরাচর এই দ্বিতীয় প্রকার ক্রীড়ায় নিরত হয়।

কখনও কখনও দেখা যায় একদল কাক প্রথমে খুব উঁচুতে উঠিয়া তাহার পর ডানা গুটাইয়া হুস করিয়া নীচে নামিয়া আসে এবং ভূমির কিছু উপরে থাকিতে থাকিতে আবার পক্ষ প্রসারিত করিয়া সোজা সামনের

দিকে কিছু দূর উড়িয়া যায়। এই রকম তাহারা বার বার করিতে থাকে। সম্ভবতঃ ইহা হইতে উহারা গতির উদ্দীপনা বিশেষ করিয়া উপভোগ করে। আবার কখনও কখনও কাকেরা আকাশে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ শূন্যে ডিগবাজী খাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করে।

পেঙ্গুইন পাখীর কৌতুকপ্রিয়তা আরও মজার। ইহাদের আবাসস্থল হিমশীতল মেরু প্রদেশে। তথায় সদা সর্ব্বদা বরফের চাঁই স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতে থাকে। পেঙ্গুইন পাখীরা বরফের উপর চড়িয়া বেড়ান খুবই পছন্দ করে। তাহারা করে কি, দলবদ্ধ হইয়া এক একটি বরফশিলার উপর উঠিয়া মাইল খানেক খুব উৎসাহভরে গমন করে; তাহার পর সাঁতরাইয়া পুনরায় নিজের বাসায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর আবার আর একটি হিমশিলায় আরোহণ করিয়া নবীন উদ্যমে কৌতুক ভ্রমণে যাত্রা করে। লেভিক সাহেব পর্য্যবেক্ষণ করেন, পেঙ্গুইনরা উজ্জ্বল রঙ বিশেষতঃ রক্তবর্ণ বড ভালবাসে। তিনি কতকগুলি রঙিন প্রস্তরখণ্ড উহাদের বাসার কাছে রাখিয়া দেন। উহারা আগ্রহভরে পরস্পরের নিকট হইতে ঐ রঞ্জিত উপলখণ্ডসমূহ এত শীঘ্র শীঘ্র অপহরণ করিতে লাগিল যে, ঐগুলি ক্রমশঃ সব বাসাতেই ছড়াইয়া পড়িল।

ফিঙে পাখী কাকের পিছনে লাগিয়া তাহাকে কি রকম উত্যক্ত ও বিরক্ত করিয়া তুলে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা ফিঙের কৌতুকবোধের উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্রীড়া-কৌতুকের তৃতীয় লক্ষ্য হইতেছে, প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রাধান্য লাভ। বলা বাহুল্য একমাত্র মানুষের খেলাধূলায় কেবল প্রাধান্য লাভের ভাবটি সুপরিস্ফুট। সময় সময় জয়লাভের নেশা উভয় পক্ষকে এমনই পাইয়া বসে যে, তখন খেলাধূলা মারামারিতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

মানুষ ও পশুপক্ষী ছাড়া কীটপতঙ্গ বা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে ক্রীড়া-কৌতুকের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

জীবজন্তুর প্রণয়কলা

প্রণয়ের পুলকোচ্ছ্বাসে বিভিন্ন জীবজন্তুর ব্যবহার যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। স্ত্রীপ্রাণীদের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার করিবার জন্যই যেন প্রকৃতিদেবী স্বয়ং পুরুষ প্রাণীদের অধিক সৌন্দর্য্যশালী ও সুদর্শন করিয়া বরবেশে প্রেরণ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পুরুষ প্রাণীরা সাজসজ্জায় সুসজ্জিত ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া প্রেম নিবেদন করিতে খুবই উৎসুক রহিয়াছে, অথচ স্ত্রীপ্রাণীরা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, পুরুষ-জাতির ভালবাসিবার অভিলাষ প্রবল, কিন্তু স্ত্রী-জাতির মধ্যে ভালবাসা পাইবার বাসনাই বলবতী। এই প্রবন্ধে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর জীবের প্রণয়প্রণালী পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিব।

সাগরের জলে একপ্রকার কেশ-কীট, bristle worm বাস করে। মদনকালে পুংকীটগুলি স্ব স্ব দেহ নৃত্যচ্ছন্দে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া স্ত্রী-কীটগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে।

সারঙ্গী কর্কট, fiddler crab নামে একজাতীয় কাঁকড়া আছে। মাদী কাঁকড়ার ছোট ছোট দুইটি দাঁড়া থাকে, যদ্দারা ইহারা আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে। কিন্তু এই জাতীয় মদ্দা কাঁকড়ার একটি দাঁড়া অন্যটি অপেক্ষা অনেক বড় এবং কখনও কখনও বেশ সুরঞ্জিত হয়।

সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের সময় পুরুষ কাঁকড়া তাহার বৃহৎ দাঁড়াটি সারঙ্গ বাজাইবার ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া স্ত্রী-কাঁকড়ার সম্মুখে যাওয়া আসা করিতে থাকে। এইভাবে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া ইহারা প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন করে।

মাকড়সার বিবাহ ব্যাপার আরও বিস্ময়কর। মদ্দা মাকড়সা প্রণয় নিবেদনকালে একটি তন্তুতে আঘাত করিয়া জালে এক বিশেষ কম্পনের সৃষ্টি করে। শিকার জালে পড়িলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, এই প্রেম-কম্পন উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মাদী মাকড়সা কম্পনের এই পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারে এবং উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সত্বর পুরুষ মাকড়সার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মিলনের অব্যবহিত পরেই মাদী মাকড়সা একটি অদ্ভুত কাজ করিয়া বসে—পুং মাকড়সার জৈবনিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইলেই উহাকে বধ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

জোনাকির আলো এবং ঝিঁঝির ডাক প্রণয়-সঙ্কেত ভিন্ন আর কিছুই নয়। শব্দ ও আলো স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সুবিধা করিয়া দেয় মাত্র।

কোন কোন জাতীয় মাংসাশী পুরুষ-মক্ষিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কীট ধরিয়া স্বীয় দেহনিঃসৃত বুদ্‌বুদের সহিত উহা সংবদ্ধ করতঃ স্ত্রী-মক্ষিকাকে উপহার প্রদান করে। কখনও কখনও কীটের পরিবর্ত্তে ফুলের পাঁপড়ি কিংবা ঘাসের শীষ বুদ্‌বুদের সহিত সংলগ্ন করিয়াও উপঢৌকন দেয়। অনুরাগ প্রদর্শনকালে মক্ষিকার এইরূপ সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

একজাতীয় নীল রঙের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, এই গোষ্ঠীর পুরুষ-প্রজাপতির শরীরস্থ গন্ধকোষ হইতে সময় বিশেষে একপ্রকার সুগন্ধ বাহির হয়। স্ত্রী-প্রজাপতি এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অবিলম্বে উহার সহিত মিলিত হয়। অপর এক জাতীয় প্রজাপতির ব্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত। এই শ্রেণীর পুরুষ-প্রজাপতির ঘ্রাণশক্তি এত তীক্ষ্ম যে, স্ত্রী-প্রজাপতির

অধ্যুষিত কোন খালি কার্ড বোর্ডের বাক্সের নিকটেই পুরুষ প্রজাপতিরা এক মাইল দূর হইতে উড়িয়া আসে।

মৎস্যজাতি প্রীতি প্রদর্শনে একেবারেই অপটু। তবে অল্প কয়েক জাতীয় পুং-মৎস্যকে ঋতুবিশেষে উজ্জ্বল রামধনু বর্ণ ধারণ করিয়া স্ত্রী-মৎস্যের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিয়া তাহার কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করিতে দেখা যায়।

ভেকেরা সু-উচ্চ কলরব করিয়া পরস্পরের উপস্থিতির আভাস দেয়। ইহাদের অনুরাগ প্রকাশ কণ্ঠস্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিউট গোষ্ঠী, newts উভচর ভেক জাতির অন্তর্গত। পুং-নিউট যথাকালে সুদৃশ্য বিবাহবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রী-নিউটের সম্মুখে পূর্ব্বরাগ নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। এই সময় উহার গাত্রস্থ গন্ধকোষ হইতে এক প্রকার সুবাস নির্গত হইয়া চারিপাশের বাতাসকে আমোদিত করে। স্ত্রী-নিউট এই গন্ধ ও নৃত্যচ্ছন্দে মুগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে তাহার নিকট গমন করে।

সরীসৃপের পূর্ব্বরাগ প্রণালী ভাল করিয়া জানা নাই। কেবল দেখা গিয়াছে, অস্ট্রেলিয়ার এক জাতীয় মদ্দা টিকটিকি মানুষের মত পিছনের দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গিনী অধিকার করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিষম মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

পাখীরা পূর্ব্বরাগপালাকে উচ্চ কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে। পালকের বর্ণবৈচিত্র্য এবং কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের সাহায্যে ইহারা স্ত্রী জাতির চিত্ত জয় করে।

ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূরকে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। আমহার্স্ট ফেঝাণ্টের, Amherst pheasant-এর অনুরাগ প্রদর্শনও অনুরূপ চিত্তাকর্ষক। পুং-ফেঝাণ্টের পালকের বর্ণসম্ভার এবং গলার রঙ্গীন ঝালর ও সুদৃশ্য পুচ্ছের সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। বসন্তকালে পুচ্ছের পালক বিস্তার করিয়া এবং গলার ঝালর দোলাইয়া পুংপক্ষী স্ত্রীপক্ষীর মন হরণ করে।

অস্ট্রেলিয়ায় কুঞ্জবিহার, bower bird নামে শালিখ জাতীয় এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুংপক্ষীরা ডালপালার সাহায্যে সুন্দর কুঞ্জ নির্ম্মাণ করে। কুঞ্জ ভবনের প্রবেশপথ ইহারা নানারকম রঙ্গীন পাথর, ঝিনুক এবং পাখীর পালক দিয়া সাজাইয়া রাখে। স্ত্রী-পক্ষীরা এই সকল বিচিত্র বর্ণের দ্রব্যসামগ্রীতে প্রলুব্ধ হইয়া তথায় আগমন করে। এস্থলে ব্যক্তিগত দৈহিক সৌন্দর্য্যের স্থান সুদৃশ্য দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করিয়াছে।

মেরু প্রদেশের অধিবাসী পেঙ্গুইন পাখী, penguin সঙ্গিনীকে নীড় নির্ম্মাণের উপযোগী পাথরের টুকরা উপহার দিয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করে।

বসন্তকাল সমাগত হইলেই অধিকাংশ গায়ক পক্ষী নীড়রচনার উপযুক্ত কোন স্থান বাছিয়া লইয়া অধিকার করিয়া বসে। অনেক সময় নিজের অধিকাব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীব সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। নির্ব্বাচিত স্থানে বসিয়া পুং-পক্ষী আহার নিদ্রা ব্যতীত সমস্ত সময়টা গান গাহিয়া অতিবাহিত করে। ইহাদের এই সুমিষ্ট সঙ্গীত স্বামিত্ব ও বাসস্থানের বিজ্ঞাপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েক দিন পরেই স্ত্রী-পক্ষীরা তথায় আগমন করিয়া এই স্বরলহরাতে আকৃষ্ট হইয়া গায়কদিগের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। স্ত্রী-পক্ষীদের মধ্যে পতিনির্ব্বাচন লইয়া এই সময় বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা চলে। পুং-পক্ষী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু প্রতিযোগিতার পালা সাঙ্গ হইলেই বিজয়িনাকে সে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। ইহার পর পুং-পক্ষী বাসা তৈয়ারী যোগ্য লতাপাতা মুখে লইয়া সঙ্গিনীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করে এবং নিজের রূপ ও উড্ডয়ন কৌশল দেখাইয়া তাহাকে আরও প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে।

পশুদের মধ্যে মিলনের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে দেখা গিয়াছে যে বন্য মেষ, মহিষ ও হরিণের ভিতর স্ত্রী-অধিকার লইয়া পুং-পশুদের মধ্যে সময় অসময় বিষম যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সংগ্রামান্তে স্ত্রী-পশু বিজয়ী বীরের আধিপত্য সানন্দে স্বীকার করিয়া লয়। সেই জন্য এই সকল পুং-পশু বাহ্যিক চাকচিক্যের পরিবর্ত্তে শৃঙ্গ প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং শারীরিক শক্তির জন্য বিশেষত্ব লাভ করে।

মানুষের পূর্ব্বরাগ পদ্ধতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের উক্তি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব,—"স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টিপদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন এমন বোধ হয় না।"

নরনারীর মধ্যে কে বেশী সুন্দর, ইহা লইয়া অবশ্য মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে নারীর রূপকে যে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে সে বিষয় সকলেই বোধ হয় একমত। অপরদিকে রূপবান পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক শক্তি, সাহস, বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী পুরুষ যে বিবাহ বাজারে অধিক মূল্য পায়, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। মনুষ্য সমাজে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুণে পূর্ব্বরাগ ও পরিণয় বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রেমের প্রভাবে মানুষের কতদূর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন

সংঘটিত হয়, একজন অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক (ডাঃ বার্ণাড হলাণ্ডার) তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব,—"যে নরনারীর মনে এরূপ ভাব জাগিয়াছে তাহারা প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর প্রতি কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যাহার ফলে উহারা অন্য সকল লোকের আকর্ষণ এবং ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীব শারীরিক ও মানসিক দোযক্রটি সম্বন্ধে একরূপ দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। প্রেমাসক্ত নরনারী কখনও কখনও জীবনব্যাপী কোন অভ্যাস ত্যাগ করে, আত্মীয়স্বজনেব সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য পরিজনদেরও বিদায় কবিযা দেয়, বিশেষ আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করিয়া লয় এবং ক্লাব ও ধূমপান বর্জ্জন করিয়া দেয়। এমন কি তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতও পরিবর্ত্তন করিতে পাবে। এই সকল মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি শারীরিক লক্ষণও প্রকাশ পায়। পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকাব শরীর মৃদু অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং মস্তকে রক্তোচ্ছ্বাসের জন্য মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ কবে। বিশেষতঃ তরুণ-তরুণীর কথাবার্ত্তা ও চিন্তায় এ সময় খুব গোলমাল দেখা যায়। প্রেম প্রবল হইলে অক্ষুধা ও অনিদ্রার উৎপত্তি হইতে পারে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এবং সময় সময় মনে হয়, যেন উহা গলার কাছে ঠেলিতেছে। প্রণয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মনোভাবের প্রতি বিলক্ষণ অনুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সামান্য অমনোযোগিতা কিংবা সম্ভাষণের একটুও ক্রটি ঘটিলে বিশেষ বিক্ষোভ, দুর্ভাবনা ও কষ্টের সৃষ্টি হয়, যাহা কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। উপেক্ষিত উপেক্ষিতা বিমর্ষ হইয়া লোকজনের সহবাস পরিহার করিয়া চলে। বেশী দিন অবহেলা পাইলে উহারা ম্লান

ও কৃশকায় হইয়া পড়ে, এমন কি, আত্মহত্যা করিবার অবৈধ চিন্তাও উহাদের মনের মধ্যে উদয় হয়। কখনও কখনও কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবে নরহত্যা করিবার প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। আবার অন্যদিকে ক্ষণিকের জন্যও পরস্পরের সংস্পর্শ—স্থায়ী আনন্দ ও সুখের সঞ্চার করিতে পারে।"

মৎস্যতত্ত্ব

মাছ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট ও ফুলকাযুক্ত বারিবিহারী জীব। প্রায় চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে আদিম জলচর কীটের ক্রমবিকাশের ফলে মৎস্যের উৎপত্তি হইয়াছে। মৎস্যের বিবর্তনের ইতিহাস সাইলুরিয়ান ও ডেভনিয়ান যুগের পাললিক শিলার স্তরে স্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পৃথিবীর নদনদী, হ্রদ ও সাগরজলে প্রায় কুড়ি হাজার রকম মাছ আছে। ইহাদের প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। অধিকাংশ সৌমশরীর-সম্পন্ন ও অস্থি-পঞ্জরযুক্ত মৎস্য প্রথম পর্য্যায়ের মধ্যে পড়ে। হাঙ্গরাদি মাছ ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট ও তরুণাস্থিসংযুক্ত, ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহা ছাড়া, দ্বিশ্বাসযন্ত্রী এক রকম মাছ আছে, উহাদের ফুসফুস ও ফুলকা দুই থাকে।

মৎস্যের শারীরিক গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, ইহাদের দেহ সর্ব্বতোভাবে সলিল মধ্যে সুখে বিচরণ করিবার উপযোগী। ইহাদের মস্তকের করোটি, বক্ষের পঞ্জর ও পিঠের শিরদাঁড়া বহু সংখ্যক অস্থির সমাবেশে গঠিত। ইহাদের শরীরের অগ্রভাগে ও পশ্চাৎ দিকে দুই পাশেই দুইটি করিয়া পাখনা থাকে, এই পাখনাগুলিই মাছের হাত ও পা।

অধিকাংশ মাছের সর্ব্বশরীর আঁশ দিয়া ঢাকা। তবে শিঙ্গি, মাগুর জাতীয় মাছের আঁশ নাই। সব মাছই জলমধ্যস্থ দ্রবীভূত বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। মাছেরা মুখ দিয়া অনবরত জল গিলিতে থাকে এবং গ্রীবার দুই পার্শ্বস্থিত ফুলকার সাহায্যে ঐ দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বাকি জল কানকুয়া দিয়া বাহির করিয়া দেয়। মাছের ফুলকায় জালের মত অনেক রক্তবাহী নালী আছে, এখানেই অক্সিজেন গৃহীত ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হয়। কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছের শরীরে ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের ব্যবস্থা আছে, সেজন্য ইহারা জলছাড়া হইয়াও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

মাছের দেহের ভিতর যে বায়ুপূর্ণ থলি থাকে উহাকে চলতি কথায় পটকা বলে। মাছ জলের নীচে যাইবার সময় এই বায়ুস্থলী সঙ্কুচিত করিলে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত হয়, আর উপরে উঠিবার সময় উহা প্রসারিত করিলে দেহ অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া যায়। মাছের রক্ত ঠাণ্ডা, ইহাদের দেহতাপ জলের উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। মাছের হৃৎপিণ্ড দুইটি কুঠুরিবিশিষ্ট। বেশীর ভাগ মাছ নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ ও কীট ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। অপর কয়েক জাতীয় বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলসধারী জীব ও ছোট ছোট মাছ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করে। মাছের শরীরের অভ্যন্তরে পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্র সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। দেহের দূষিত বস্তু বহির্গমনের জন্য মাছের অপানদেশ বর্ত্তমান। ইহাদের বৃক্ক বা কিডনির সহিত অপানদেশের যোগাযোগ আছে। মস্তিষ্কের যে অংশ শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত করে মাছের সেইভাগ বিলক্ষণ বিকাশপ্রাপ্ত। অনেক মাছের চোয়ালেই দাঁতের অস্তিত্ব আছে।

হাঙ্গর জাতীয় মাছই আকারে সর্ব্বাধিক বড় হয়। ইহাদের দৈর্ঘ্য

চল্লিশ ফুট পর্যন্ত হয় এবং ওজন প্রায় আট শত মণ অবধি হয়। অপর দিকে ক্ষুদ্রতম মৎস্য লম্বায় এক ইঞ্চিরও কম আর ওজনে পনের গ্রেণের বেশী নয়।

মাছেরা খুব তাড়াতাড়ি এপাশওপাশ লেজ নাড়িয়া জলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ইহাদের দেহের দুই পাশের পাখনাগুলিও সন্তরণ কার্যে





সামুদ্রিক মাছ

যথেষ্ট সাহায্য করে। লেজের পাখনা কেবল দিক পরিবর্তনের জন্য হালের মত ব্যবহৃত হয়। টানি নামক ম্যাকেরাল মাছ ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে যাইতে পারে। সামন মাছের গতি ঘণ্টায় প্রায় ২৫ মাইল আর পাইক ও ঈল মৎস্যের বেগ ঘণ্টায় ১৫ মাইল অবধি হয়। আজকাল সাবমেরিনের সাহায্যেই মৎস্যের গতিবেগ নির্ণীত হইয়া থাকে।

মীন জাতির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা যতদিন বাঁচে—বাল্য হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে। মৎস্যের বয়স উহার আঁশ ও মাথার মধ্যকার হাড়ের চাকতি হইতে আন্দাজ করা যায়। ইহাদের আঁশ ও মস্তক মধ্যস্থ অস্থি খণ্ড চক্রাকারে রেখাঙ্কিত থাকে। এক একটি রেখা এক এক বছরের গ্রীষ্মকালীন বৃদ্ধির চিহ্ন। হ্যালিবাট, বাস, কার্প প্রভৃতি বিলাতী মাছ ২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হেরিং, ট্রাউট, স্কেট ও পাইক এবং ফুসফুস মাছের আয়ু ১৫ হইতে ২০ বছর। সাগর তীরবর্তী ছোট ছোট মাছের জীবনকাল কয়েক বছরের বেশী নয়।

জলচারী মৎস্যের স্পর্শবোধের সহিত আমাদের অনুভব শক্তির কোন

তুলনা হয় না। রজনীর অন্ধকারে কোন মগ্নশৈলের নিকটস্থ হইলে ধাক্কা লাগিবার পূর্বেই ইহারা উহার সান্নিধ্য টের পাইয়া সাবধান হইয়া যায়। মাছেরা কেমন করিয়া উহার উপস্থিতি বুঝিতে পারে? বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বে প্রসারিত দুইটি সূক্ষ্ম রেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সলিলমধ্যস্থ কোন উপলখণ্ডের সম্মুখীন হইলে জলের চাপের যে তারতম্য ঘটে, পূর্বোক্ত দুইটি সরু রেখার সাহায্যে মৎস্য তাহা বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হয়। মাছের স্বাদবোধ শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সারা শরীরময় বিস্তৃত, ইহাদের আর্দ্র চর্মও বেশ অনুভূতি সম্পন্ন। যদি কোন বিড়াল মৎস্যের, cat fish-এর পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করিয়া এক টুকরা



বিড়াল মৎস্য

মাংস নিঃশব্দে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে ঘুরিয়া গিয়া উহাতে মুখ দেয়। ইহা ছাড়া কার্প ও অন্য অনেক জাতীয় মৎস্য স্বীয় শরীর সংলগ্ন শুঁয়ার সাহায্যে অংশতঃ আস্বাদ গ্রহণ করে।

মাছের গন্ধজ্ঞান আছে, সম্মুখে অবস্থিত নাসারন্ধ্র দুইটি শুধু এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। মাছের চোখে পাতা নাই। বড় বড় মাছ কেবল এক হাত দূরের জিনিষ দর্শন করিতে সমর্থ। অতি-বেগুনী রশ্মি মানব চক্ষুর

অগোচর হইলেও মাছেরা যে এই অদৃশ্য কিরণ স্পষ্টই দেখিতে পায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বে লোকের ধারণা ছিল মাছেরা শুনিতে পায় না, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মৎস্য জাতি কোনক্রমেই বধির নয়। প্রথমে জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় একটি মাছ ছাড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া উহাকে খাবার দেওয়া অভ্যাস করা হয়। ছয়-সাতবার এইরূপ বংশী ধ্বনি করিয়া আহার্য দিবার পর দেখা যায় মৎস্যটি বাঁশীর স্বর শুনিবামাত্র আহারের প্রত্যাশায় নিজেই কাছে চলিয়া আসে। পরীক্ষক পর্দার আড়ালে থাকিয়া বংশীধ্বনি করেন। সুতরাং মাছের তাঁহাকে দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মিনো মাছকে এক রকম সুরে জলাধারের কাছে আসিতে এবং অন্য রকম সুর করিয়া দূরে যাইতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই দুই সুরের ব্যবধান এক অষ্টক হইলে তবেই মাছেরা বুঝিতে পারে।

মৎস্যের যৎসামান্য বোধশক্তি আছে। থর্ণডাইক কাঁচের চৌবাচ্চায় মাছ ছাড়িয়া উহার বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছেন। চৌবাচ্চার পশ্চাৎ দিকে লোভনীয় খাদ্যবস্তু রাখিয়া সম্মুখভাগে মৎস্যকে স্থাপন করা হয়। মাঝখানে পর পর কয়েকটি কাঁচের দেওয়াল থাকে। প্রত্যেক দেওয়ালে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। কিন্তু ছিদ্রগুলি ঠিক এক লাইনে করা হয় না। মৎস্যপ্রবর প্রথমে অবশ্য উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁচের দেওয়ালে ধাক্কা খায়, তাহার পর কিন্তু সে ঠিকভাবে সব কটি রন্ধ্র অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত আহার্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

মৎস্যজাতি প্রীতি প্রদর্শনে একেবারেই অপটু। কেবল অল্প কয়েক রকম পুং-মৎস্যকে ঋতু বিশেষে উজ্জ্বল রামধনু বর্ণ ধারণ করিয়া স্ত্রী-মৎস্যের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিয়া তাহার কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করিতে দেখা যায়। ষ্টিকলব্যাক, রাস. বোফিন প্রভৃতি মৎস্য জলজ গাছের মধ্যে গোলাকার

বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে। স্ত্রী-মৎস্য এককালে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া প্রস্থান করে। অতঃপর পুং-মৎস্য তথায় আগমন করিয়া বহু সংখ্যক বীজ-কোষ বর্ষণ করে। ডিম্বকোষ ও বীজকোষের মিলনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য শিশুর উদ্ভব হয়। ঈল মাছ ডিম পাড়িবার জন্য সাগর অভিমুখে যাত্রা করে, আর এদেশের ইলিশ মাছ সেই উদ্দেশ্যে সাগর হইতে নদী মধ্যে আগমন করে।

এখন কয়েক প্রকার বিশেষত্বব্যঞ্জক মৎস্যের বিবরণ প্রদান করা হইবে। প্রথমে উড়ুক্কু মাছের কথাই ধরা যাক। সচরাচর সমস্ত উড্ডীয়মান মৎস্যই উষ্ণ ও উষ্ণোত্তর মণ্ডলের সাগর জলে বাস করে। ইহাদের প্রত্যেকের পাখনা বেশ বড় ও বলিষ্ঠ হওয়ায় উহার সাহায্যে বাতাসে ভর দিয়া ইহারা সমুদ্রের জলের উপর দিয়া সময় সময় পাঁচ শ' ফুট পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। প্রতিকূল বায়ুতে উড়ুক্কু মাছ জল হইতে প্রায় কুড়ি ফুট অবধি উচ্চে উঠিতে পারে। ইহাদের উড়িবার গতি ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ধাবমান জাহাজ অপেক্ষা অনেক বেশী।

সাধারণ সব প্রাণীর নয়নদ্বয় দেহের দুই দিকে অবস্থিত। কিন্তু কোন কোন চেপ্টা মাছের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। সোল, হ্যালিবাট প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাম দিকস্থ চক্ষু ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ নেত্রের নিকট চলিয়া আসে, তখন উভয় চক্ষুই দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে। সমুদ্রের গভীর জলে অন্ধকারময় স্থানে যে সব মাছ বিচরণ করে, তাহাদের শরীরে জোনাকির মত স্বাভাবিক ও স্নিগ্ধ আলো জ্বলিবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন মাছের দেহে লাল, সাদা, সবুজ বিভিন্ন বর্ণের আলোকবিন্দুর অপরূপ সমাবেশ দেখা যায়।

গভীর সাগর জলে এক রকম কালো রঙের পেটুক মাছ বাস করে। ইহারা অনায়াসে নিজ কলেবর অপেক্ষা কয়েক গুণ বড় ক্যাটল নামক শম্বুক

জাতীয় জীব উদরস্থ করিতে পারে। মালয় দেশে এক রকম তীরন্দাজ মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মুখ দিয়া তীরের মত জলধারা নিক্ষেপ করিয়া পতঙ্গ শিকার করিয়া থাকে। একজাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের মস্তকসংলগ্ন শুঁয়ার অগ্রে বঁড়শি এবং মধ্যে আলোকিত কোরক থাকে। ছোট ছোট মাছ ঐ আলোক বিন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যেই নিকটস্থ হয়, অমনি বঁড়শিতে গাঁথা পড়ে।

এক রকম অদ্ভুত গেছো মাছ আছে। ইহারা প্রয়োজন হইলে জল ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে আঁশ ও পাখনার সাহায্যে মাটির উপর দিয়া চলিতে ও গাছে উঠিতে পারে। চেপ্টা মাছেদের বহুরূপীর মত বর্ণ-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা অতীব বিস্ময়কর। ইহারা যখন জলের মধ্যে বালির উপর সন্তরণ করে তখন ইহাদের গাত্রবর্ণ বেলে রঙের থাকে। আবার যদি ইহাদের ধরিয়া এমন এক জলাধারে ছাড়া হয় যাহার মেঝে ও চারিপাশ সাদা, কালো বা বাদামী বর্ণের ও চৌকা চৌকা, তাহা হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ইহাদের দেহ অনুরূপভাবে চিত্রিত হইয়া যায়।

মাছেদের ভিতরও পরগাছার অভাব নাই। এক শ্রেণীর শোষক মাছ আছে, ইহারা কখনও খাদ্য অন্বেষণের চেষ্টা করে না, আজীবন কোন হাঙরের শরীর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং উহার উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণা ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। এইরূপ অলস প্রকৃতির অপর এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পুরুষ মাছ দেখা যায়, ইহারা চিরকাল আপনা অপেক্ষা অনেক বড় স্ত্রীমৎস্যের শোণিত শোষণ করিয়া জীবনযাপন করে।

মাছের রঙ লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কৃষ্ণাভ, রূপালী নানা রকম হইতে পারে। কাঁচের আধারে সোনালী রঙের লাল মাছকে অপরূপ সুন্দর মনে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জাতীয় মৎস্য চীন বা জাপান হইতে আনীত হইয়াছিল। ইহাদের বর্ণবৈচিত্র্য বংশানুক্রমিক নির্বাচনের

ফলে আবির্ভূত হইয়াছে।

এ জগতে এত প্রকার মাছ আছে যে, বলিয়া শেষ করা শক্ত। গোল মাছ, নল মাছ, বিবন মাছ, কবাত মাছ, হাতুড়ি মাছ, ঘোড়া মাছ ও সজারু মাছ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জীবজগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক প্রাণী বোধ হয় বৈদ্যুতিক মাছ। বিজলীরশ্মি মৎস্য, বৈদ্যুতিক বাইন, মার্জার, মীন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মৎস্যের তড়িৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষভাবে বিবর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত। বৈদ্যুতিক বাইন ও বিজলীরশ্মি মৎস্যের তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র তাহাদের পেশীসমষ্টি, কিন্তু মার্জার মৎস্যের বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র উহার চর্মমধ্যস্থ গণ্ডে নিহিত। ব্রেজিলের নদী ও জলাশয়ে যে জাতীয় বাইন মাছ পাওয়া যায়, তাহাদের বিদ্যুৎসঞ্চার ক্ষমতা সর্বাধিক। ইহাদের বৈদ্যুতিক বল কয়েক শত ভোল্ট পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ সাধারণ গার্হস্থ্য বিজলী সরবরাহ হইতেও এই বিদ্যুৎশক্তি অধিক। ছোট ছোট মাছ ও বেঙ বৈদ্যুতিক বাইনের সংস্পর্শে আসিলে তীব্রভাবে তড়িতাহত হইয়া অবিলম্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। মানুষ ও অন্যান্য বড় জীবজন্তু এই মৎস্যের বিদ্যুৎ সঞ্চারের ফলে অবশ হইয়া পড়ে। শুনা যায়, নিউইয়র্কের জলাধারে এমন এক বড় বৈদ্যুতিক বাইন মাছ ছিল, যাহার বিজলী শক্তির প্রভাবে বাতি জ্বালান এবং ঘণ্টা বাজান সম্ভব হইয়াছিল।

বিজলীরশ্মি মৎস্য, electric ray fish ভূমধ্যসাগর ও গ্রীষ্মাঞ্চলের সমুদ্রজলে বসবাস করে। বড় বড় বিজলীরশ্মি মৎস্যের বৈদ্যুতিক শক্তি বিশ হইতে ত্রিশ ভোল্ট পর্যন্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকে অতর্কিতে তড়িতাহত করিয়া ইহারা ভোজন করে। কোন ইস্পাতের শলাকা তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া উহাতে বিজলীরশ্মি মাছের বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিলে ঐ ইস্পাত চুম্বক হইয়া যায়। বৈদ্যুতিক মৎস্যেরা তাহাদের এই বিজলী-

শক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের মতই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

বায়ুবিহারী জীব

আকাশচারী জীবের মধ্যে পতঙ্গ ও পক্ষী সর্বপ্রধান, ইহাদের উড্ডয়ননীতির সহিত সাধারণতঃ সকলেই পরিচিত। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক রকম উড়ন্ত মাছ, বেঙ, সরীসৃপ ও জন্তুর অস্তিত্ব আছে। এই প্রবন্ধে উহাদের বিষয় আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমে উড়ন্ত মাছের কথা ধরা যাক। ইহারা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—



উড়ন্ত মাছ

উড়ুক্কু গার্ণার্ড ও উড়ুক্কু হেরিং। আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের জলাশয়ে মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার উড়ন্ত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর সমস্ত উড্ডীয়মান মৎস্যই উষ্ণ ও উষ্ণোত্তর মণ্ডলের সাগরজলে বাস করে। ইহাদের প্রত্যেকের পিঠের পাখনা বেশ বড় ও বলিষ্ঠ হওয়ায়, উহার সাহায্যে বাতাসে ভর দিয়া ইহারা সমুদ্রের জলের উপর দিয়া সময় সময় পাঁচ শ ফুট পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। প্রতিকূল বায়ুতে উড়ুক্কু মাছ জল হইতে

প্রায় কুড়ি ফুট পর্যন্ত উচ্চে উঠিতে পারে। অপরাপর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৎস্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহারা শূন্যে উত্থিত হয়। অল্পক্ষণের জন্য আকাশে বিচরণ করিয়া এই জাতীয় সকল মৎস্য পুনরায় জলে পতিত হয়, প্রয়োজন হইলে পুনর্বার উত্থিত হয়—এইভাবে অগ্রসর হয়। ইহাদের উড়িবার গতি ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ধাবমান জাহাজ অপেক্ষা অনেক বেশী। ভূমধ্যসাগরে চলন্ত জাহাজের ডেকের উপর

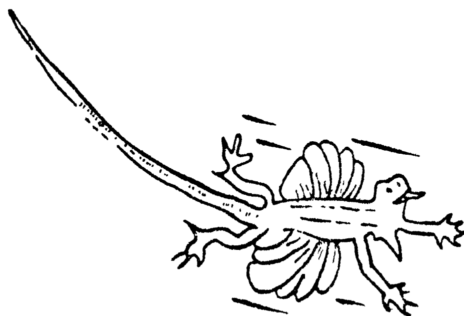


উড়ন্ত বেঙ

কখনও কখনও বহুসংখ্যক উড়ুক্কু মাছ পতিত হয়। কাটল মাছ নামক এক রকম চুনাবরণযুক্ত জলচর প্রাণী আছে, আসলে ইহারা মোটেই মৎস্য নয়, শম্বুকাদি জীববর্গের অন্তর্গত। চার ফুট দীর্ঘ এক জাতীয় কাটল মাছের দুই দিকে দুইটি ডানা থাকে, সেজন্য জল হইতে লম্ফ দিয়া শূন্যে উঠিয়া কিছুক্ষণ বিচরণ করিতে পারে।

বোর্নিও দ্বীপে এক জাতীয় উড়ন্ত বেঙ দেখা যায়। ইহাদের পায়ের আঙুলগুলি পাতলা চামড়ার ঝালর দিয়া জোড়া। আঙুলের বিস্তৃত চর্মের সাহায্যে ইহারা বেশ খানিকটা বাতাসে ভর দিয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে গমন করিতে পারে। মালয়ের জঙ্গলে এক রকম ছোট উড়ো টিকটিকি আছে। ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বে বর্ধিত বক্ষপঞ্জরে পক্ষের মত চর্মাবরণ

থাকে। উড়িবার সময় সমস্ত শরীর বেলুনের মত ফুলাইয়া উভয় পার্শ্বের পক্ষাকার চর্মাচ্ছাদন প্রসারিত করিয়া ইহারা বায়ুতে ভাসিয়া যাইতে পারে। পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় উড়ুক্কু সর্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।



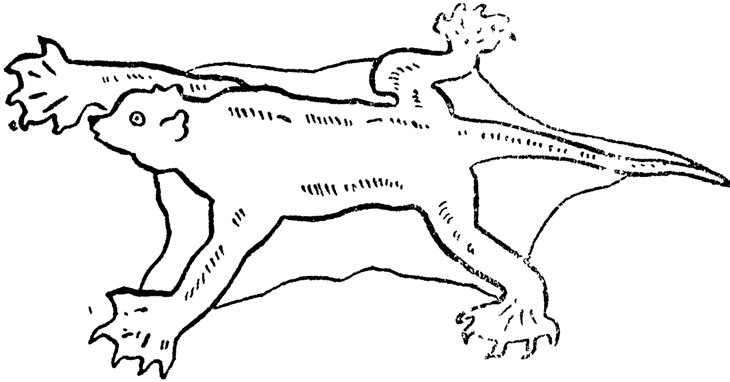
উড়ুক্কু টিকটিকি

এব শ্রেণীর সাপ উড়িবার সময় নতোদর হইয়া নিজের শরীরকে অর্ধখণ্ডিত বাঁশের মত চেপটা করিয়া বাতাসে ভর দিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বেশ বিচরণ করে।

ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উড়ো কাঠ বিড়াল দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের চার পা পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া, সেইজন্য বায়ুতে ভাসিয়া ষাট-সত্তর গজ বেশ যাইতে পারে। শূন্যে নিক্ষেপ করিলে উড়ো কাঠবিড়াল সোজা হইয়া পাতার মত ভূমিতে অবতরণ করে। কখনও কখনও ইহারা নিজেদের বাচ্চাকে পিঠে চড়াইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে হিমালয় অঞ্চলে এই প্রকার উড়ো কাঠবিড়াল বসবাস করে। কাশ্মীরে একজাতীয় বড় উড়ুক্কু কাঠবিড়াল পাওয়া যায়, লম্বায় ইহারা প্রায় এক গজ। সমস্ত উড়ো কাঠবিড়ালই রাত্রিচর, আর সব বিষয়ে সাধারণ কাঠবিড়ালের সহিত

ইহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে।

অস্ট্রেলিয়াতেও কয়েক রকম বায়ুবিহারী দ্বিগর্ভ জন্তু পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে উড়ো অপসম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। লেজ ছাড়া লম্বায় ইহারা প্রায় এক ফুট। সর্বক্ষণ ইহারা গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ফল ফুল ও কুঁড়ি খাইয়া প্রাণধারণ করে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে লিমার নামক উড়ন্ত বানর বাস করে। ইহাদের সামনের দুই হাত ও পিছনের দুই পা বাদুড়ের মত পাতলা পর্দা সংযুক্ত। আকারে ইহারা সাধারণ গৃহপালিত বিড়ালের প্রায় সমান। ইহারা দল বাঁধিয়া বসবাস করে।



উড্ডীয়মান বানর

ফল-মূল ছোট ছোট পাখি ও ডিম এবং কীটপতঙ্গ ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা বেশ পোষ মানে।

বাদুড় ও চামচিকা যে পাখি নয়, পশু, তাহা অনেকেরই জানা আছে। ইহারাও এক রকম উড়ো জন্তু। নানা রকম ফল ও কীটপতঙ্গ আহার

করিয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার-বাদুড় জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যব দ্বীপের বাদুড়ই সর্বাপেক্ষা বড় হয়, ইহাদের ডানার বিস্তার প্রায় পাঁচ ফুট। বাদুড় ও চামচিকার স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালির বৈজ্ঞানিক স্পালাঞ্জানি এ সম্পর্কে বেশ মজার পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি একটি ঘরের ছাদ হইতে সুতা বাঁধিয়া কতকগুলি ঘণ্টা ঝুলাইলেন। তাহার পর ঘর অন্ধকার করিয়া একটি বাদুড় ধরিয়া সেখানে ছাড়িয়া দিলেন। দেখা গেল বাদুড়টি এই সব সুতাবাধা ঘণ্টার সহিত বিশেষ সঙ্ঘর্ষ না বাধাইয় অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিল।

উদ্ভিদের যাদুকর বারব্যাঙ্ক

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। এই দিন গাছের ঐন্দ্রজালিক লুথার বারব্যাঙ্ক আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের অন্তর্গত ল্যাঙ্কাষ্টার সহরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই বারব্যাঙ্কের ফুল ও গাছপালার প্রতি গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তাহার হাতে কোন ফুল গুঁজিয়া দিলে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহা নিজের কচি কচি আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া থাকিতেন। যিনি পরিণত বয়সে বহুপ্রকার উন্নত ধরণের ফুল ফল ও সব্জী সৃষ্টি করিয়া মানব সাধারণের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করেন, তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভ বাল্যে এইভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। একবার বালক বারব্যাঙ্ককে টবে-বসান একটি ছোট গাছ প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি সর্বক্ষণ ঐ গাছটি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। একদিন অসাবধানতাবশতঃ ঐ টবটি তাঁহার

হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। অন্যান্য বালকেরা পোষা জীবজন্তর মৃত্যুতে যেরূপ দুঃখিত হইয়া পড়ে, বারব্যাঙ্ক তাঁহার প্রিয় গাছটির এই দুর্দশায় সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বারব্যাঙ্ক স্থানীয় বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জীবিকার অন্বেষণে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়। এই সময় বেকার অবস্থায় কিছুদিন তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। কয়েকবার ভাগ্যবিপর্যয়ের পর অবশেষে তিনি সুবিধামত চাকুরি জোগাড় করিতে সক্ষম হন। কিছুদিন ঐ কাজ করিবার পর যখন ব্যাঙ্কে তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইল, তখন তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া ঐ টাকায় খানিকটা জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র নার্সারি স্থাপন করেন। কিন্তু এখানে গতানুগতিকের মত কেবল পুবাতন পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া তিনি প্রথম হইতেই নূতন ফল-ফুল উৎপাদনে মন দেন।

এই সময় তিনি একটি বড় রকমের অর্ডার পান। একজন তাঁহাকে ২০০০০ কুল গাছের চারা অত্যল্পকালের মধ্যেই সরবরাহ করিতে অনুরোধ কবেন। বারব্যাঙ্ক একটু ভাবনায় পড়িলেন, কারণ সাধারণ অবস্থায় অতগুলি গাছ উৎপন্ন করিতে প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। কিন্তু গ্রাহকটিকে নয় মাসের মধ্যেই গাছগুলি সরবরাহ করা প্রয়োজন। যাহা হউক বারব্যাঙ্ক দমিয়া যাইবার লোক ছিলেন না। তিনি করিলেন কি, প্রথমে বীজ হইতে বহুসংখ্যক বাদাম গাছ উৎপন্ন করিলেন। তাহার পর বিশ হাজার কুল গাছের কুঁড়ি লইয়া যথা-যোগ্যভাবে ঐ বাদাম গাছগুলির সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলেন। নয় মাস পরে দেখা গেল ২০০০০ কুলের চারা একেবারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। বারব্যাঙ্কের বুদ্ধিকৌশলের কাছে এক্ষেত্রে প্রকৃতিও পরাজয় স্বীকার করিল। এই কালে বারব্যাঙ্ক

ব্যবহারিক উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্পর্কিত যে বই পাইতেন তাহাই পড়িতেন, প্রসিদ্ধ বিবর্তনবাদী চার্লস ডারুইনের রচনা পড়িতে তিনি খুবই ভালবাসিতেন এবং এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের লেখা Origin of Species তাহাকে মুগ্ধ করে।

এইরূপে কিছুকাল সাফল্যের সহিত নার্সারি পরিচালনা করিবার পর বারব্যাঙ্ক স্থির করিলেন, তিনি এখন হইতে তাঁহার সমুদয় উদ্ভাবনী শক্তি কেবল নূতন প্রকার ফল-ফুল, আনাজ উৎপাদন করায় নিয়োজিত করিবেন। তদবধি তিনি অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া উদ্ভিদ-প্রজনন, plant breeding লইয়া পরীক্ষা করেন। তাঁহার বহু বৎসরব্যাপী আপ্রাণ অনুসন্ধানের ফলে শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র পৃথিবী লাভবান হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ সঙ্কর-প্রজনন, cross breeding ও সূক্ষ্ম নির্বাচনের, selection দ্বারা মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ফল ও তরকারির বহু উৎকর্ষ সাধন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারে নূতন রকমের ফলমূল ও শাকসব্জী সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হন।

বারব্যাঙ্কের মূল্যবান গবেষণার জন্য টাফটস কলেজ তাঁহাকে ডি এস-সি উপাধিতে ভূষিত করেন। লাল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন উদ্ভিদ-বিবর্তন বিদ্যার অধ্যাপকরূপেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্যালিফোর্নিয়া বিজ্ঞান-পরিষদের তরফ হইতে তাঁহাকে একটি স্বর্ণ পদক প্রদান করা হয়। এইখানে বলা প্রয়োজন বারব্যাঙ্ক কখনও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার যুগান্তর আনয়নকারী গবেষণার জন্যই তিনি এই সকল সম্মান লাভ করেন। বারব্যাঙ্কের কাজ যাহাতে বিনা বাধায় অগ্রসর হয়, সেজন্য কার্নেগী প্রতিষ্ঠান তাঁহার হস্তে প্রভূত অর্থ প্রদান করেন। অপরাপর প্রবর্তকের ভাগ্যে যাহা ঘটে, বারব্যাঙ্কও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। অনেকে তাঁহার সৃষ্ট অভিনব উদ্ভিদ্‌সমূহকে অস্বাভাবিক

ও অসঙ্গত বলিয়া প্রচার করে। তাহাদের মতে তিনি নাকি ঈশ্বরের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। একজন ধর্মযাজক তাঁহার মতিগতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। এই সকল প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও তাঁহার যশ ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীময় এমন ছড়াইয়া পড়ে যে, তাঁহার কালিফোর্ণিয়াস্থ কৃষি-প্রতিষ্ঠানে জগতের সব দেশ হইতে জনসমাগম হইত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে আমেরিকার এই সর্ব-শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ তত্ত্ববিদের মৃত্যু হয়।

এখন তাঁহার পরিকল্পিত পদ্ধতি ও তাঁহার উদ্ভাবিত ফলমূলাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। সকলেই জানেন, যখন কোন ফুলের পুং-কেশরের পরাগ স্ত্রী-কেশরের মুণ্ডে আসিয়া লাগে, তখনই পুষ্পস্থ বীজাধার ও তন্মধ্যস্থ বীজাণুগুলি পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং উহা হইতেই যথাক্রমে ফল ও বীজের উৎপত্তি হয়। এই ব্যাপারকে আধান বা fertilisation বলা হয়। সাধারণতঃ পরাগ-পাতন কীটপতঙ্গ বা বায়ুর দ্বারা সংঘটিত হয়। বারব্যাঙ্ক কৃত্রিম উপায়ে পরাগ-পাতন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি করিতেন কি, প্রথমে দু'রকম গাছ ভাল করিয়া বাছিয়া লইয়া এক গাছের ফুলের পরাগ লইয়া অন্য গাছের ফুলের স্ত্রীমুণ্ডে লাগাইয়া দিতেন। এই উভয়বিধ ফুলের সংমিশ্রণে উৎপন্ন যে বীজ পাওয়া যাইত, তিনি উহা আবাদ করিয়া ভূমিতে রোপণ করিতেন। ইহা হইতে যখন বহুসংখ্যক সঙ্কর গাছ জন্মাইত, তখন তিনি উহার মধ্য হইতে নিজের পছন্দমত উৎকৃষ্ট গাছগুলি পৃথক করিয়া লইয়া অবশিষ্ট গুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেন। এই নির্বাচিত বৃক্ষের বীজ লইয়া তিনি পুনরায় জমিতে বপন করিতেন এবং উহা হইতে উৎপন্ন উত্তম গাছগুলিকে পুনর্বার আলাদা করিরা ফেলিতেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ নির্বাচনের ফলে অবশেষে ঈপ্সিত লক্ষণযুক্ত গাছের উদ্ভব হইত।

বারব্যাঙ্ক বলেন,—

Plant-breeding is the intelligent application of the forces of the human mind in guiding the inherent life-forces into useful directions by crossing to make perturbations or variations and new combinations of these forces, and by radically changing environments, both of which produce somewhat similar results, thus giving a broader field for selection, which again is simply the persistent application of mental force to guide and fix the perturbed life-forces in the desired channels.

বারব্যাঙ্কের মতে, দুইটি গাছ যদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নজাতীয় হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে সঙ্কর উৎপন্ন করা, আদৌ সম্ভব হয় না—

Where the plants are very different having a different line of descent and consequently different structure, there will be no hybridization at all.

অনেক সময় বারব্যাঙ্ক কোন রকম সংমিশ্রণ না করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে শুধু বারংবার নির্বাচন করিয়াই কোন নিকৃষ্টজাতীয় গাছ হইতে উৎকৃষ্ট ফলফুলসমন্বিত নূতন গাছের সৃষ্টি করিতেন।

এখন বারব্যাঙ্কের সৃষ্ট কয়েক রকম উদ্ভিদ ও ফলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রথম, কাঁটাবিহীন ফণা-মনসা, thornless cactus। এই মনসা-সিজ গাছকে শুষ্ক অনুর্বর স্থান, মরুভূমি অথবা যে-কোন পতিত জমিতেই অবলীলাক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ইহার কাঁটাগুলি তুলিয়া ফেলিতে পারিলে উহা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত হয়। বারব্যাঙ্ক কাঁটাহীন ফণা-মনসা তৈয়ার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া

গেলেন। তিনি সর্বপ্রথমে কয়েকজাতীয় ফণী-মনসার বীজ জোগাড় করিয়া একত্র বপন করিলেন। উহা হইতে প্রথমে যে সকল গাছ ও পরে ফুল জন্মাইল, বারব্যাঙ্ক তাহাদের মধ্যে ভাল রকম কৃত্রিম পরাগ পাতন করিলেন, যাহার ফলে বহু মিশ্র বীজের উৎপত্তি হইল। এই বীজগুলি লইয়া যখন আবার রোপণ করা হইল, তখন বিভিন্ন প্রকারের অনেক সঙ্কর মনসা চারা বহির্গত হইল। ইহার মধ্যে কোন কোন গাছকে পূর্বাপেক্ষাও বেশী কাঁটাবহুল হইতে দেখা গেল। কিন্তু ইহাদের মধ্যেই আবার অল্প কয়েকটি গাছকে কম কাঁটা লইয়া জন্মাইতে দেখা গেল। বারব্যাঙ্ক সযতনে স্বল্প-কণ্টকযুক্ত গাছগুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। উহা হইতে যে বীজ পাওয়া গেল, তাহা আবার রোপা হইল এবং অঙ্কুরোদ্গত চারাগাছগুলির ভিতর পুনর্বার সূক্ষ্ম নির্বাচনের পালা চলিল। এইরূপে বহুবার নির্বাচনের ফলে দশ বৎসর পরে আশানুরূপ কণ্টকবিহীন মনসা গাছের উদ্ভব হইল। বারব্যাঙ্কের উদ্ভাবিত মনসা গাছের কাণ্ড শুধু যে গরু ভেড়া ছাগলেরাই স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পারে তাহা নয়, ইহা নাকি অনায়াসে মানুষেরও আহার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া এই নূতন ফণী-মনসার উজ্জ্বল হলদে রঙের ফলগুলিও খুব সুস্বাদু। কেহ কেহ বলেন, ইহার স্বাদ আনারসের মত, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা অনেকটা তরমুজের মত খাইতে। যাহা হউক বারব্যাঙ্কের আবিষ্কারের ফলে মরুভূমি ও অনুর্বর জায়গা—যাহা এতদিন কোন কাজে আসিত না—তাহাও বহুসংখ্যায় ফণী-মনসা রোপণ করিয়া মানুষের কাজে আনা যাইতে পারে।

এবার বারব্যাঙ্কের সৃজিত কয়েক প্রকার কুলের বিষয় বলিব। কোন নূতন রকম কুল উৎপন্ন করিতে হইলে তিনি ঠিক পূর্বের মত কৃত্রিম পরাগ-পাতনের দ্বারা প্রথমে সঙ্কর সৃষ্টি করিতেন এবং তদনন্তর পছন্দমত গাছ পৃথক করিতেন। সঙ্কর উৎপাদন এবং পৌনঃপুনিক নির্বাচন ইহাই হইল

বারব্যাঙ্ক পদ্ধতির মূলসূত্র, তবে কুল গাছের বেলা তিনি কিন্তু কোন রকম মিশ্রণ না করিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বার বার ভাল গাছগুলি আলাদা করিয়া করিয়া পরিশেষে বাঞ্ছিত বৃক্ষ সৃজন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সব স্থলে তিনি প্রথমে ভাল ভাল কুলের চারা বাছিয়া পুরাতন কুল গাছের ডালে সংলগ্ন করিয়া দিতেন। এইরূপ করার ফলে চারা গাছগুলি খুব দ্রুত বাড়িতে থাকিত। অতঃপর এই সকল গাছে যখন ফল ধরিত, তখন তিনি উত্তম কুলগুলি বাছিয়া লইয়া উহার অভ্যন্তরস্থ আঁটিগুলি আবার মাটিতে পুঁতিতেন। এইভাবে তাঁহার কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইত। বারব্যাঙ্কের উদ্ভাবিত বীজহীন কুল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু। ইহার মধ্যে আঁটির নামগন্ধও নাই। তাঁহার আবিষ্কৃত আর এক রকম সুগন্ধযুক্ত কুল আছে। এই কুল সমস্ত রাত্রি কোন ঘরের ভিতর রাখিয়া দিলে প্রভাতকালে সমস্ত ঘরখানি এক অপূর্ব সুঘ্রাণে ভরিয়া যায়। আমেরিকায় একজাতীয় বুনো কুলগাছ জন্মায়। এই গাছের বিশেষত্ব এই যে, ইহা অনুর্বর বালুকাময় স্থানেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবে ইহার ফল নাকি অত্যন্ত বিস্বাদ। বারব্যাঙ্কের হাতে পড়িয়া এই কুলগাছও তাহার পূর্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে এবং এখন ইহাতে সুস্বাদু কুল ফলে। এতদ্ব্যতীত প্রকাণ্ড আকারের সুমিষ্ট কুল প্রদানকারী গাছও তিনি সৃজন করিয়াছেন।

বারব্যাঙ্কের পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, লিলি গাছের ভিতর সঙ্কর উৎপাদন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু বারব্যাঙ্ক তাঁহাদের এই বিশ্বাস ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তিনি পঞ্চাশ প্রকার লিলি সংগ্রহ করিয়া একত্র রোপণ করিলেন। তাহার পর সময়মত উহাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম উপায়ে আঙ্গুল দিয়া পরাগ-পাতন করাইলেন। ইহার ফলে অসংখ্য সঙ্কর গাছ উৎপন্ন হইল। এই সকল গাছে যখন ফুল ধরিল, তখন তাহা বর্ণে, গন্ধে ও আকারে অপরূপ শোভা ধারণ করিল। কোন কোন গাছ

ছয় ফুট উঁচু হইবার পর উহাতে উজ্জ্বল পীতবর্ণের ফুল ফুটিল। আবার কোন কোন গাছ ছয় ইঞ্চি লম্বা হইতে না হইতে গাঢ় লাল রঙের ফুলে ঢাকিয়া গেল। ইহা ছাড়া অনেক ফুলেরই পাপড়ির আকার ও গঠন সম্পূর্ণ নূতন রকমের হইল। তাঁহার সৃষ্টি লিলিসমূহ এতই সুগন্ধময় হইয়াছিল যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূর হইতে তাঁহার পুষ্পোদ্যানের সুবাস পাওয়া যাইত।

দেখিতে সুন্দর হইলেও ডালিয়া ফুলের গন্ধ বিশেষ সুবিধার নয়, কিন্তু বারব্যাঙ্কের যাদুকাঠির স্পর্শে এক রকম অভিনব ডালিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হইতে ম্যাগনোলিয়া ফুলের সুমিষ্ট ঘ্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটি সৃষ্টি হইল বড় আকারের এমারিলিস ফুল। বহু বৎসরব্যাপী চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বারব্যাঙ্ক দুই-তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এক জাতীয় ক্ষুদ্র এমারিলিস হইতে প্রায় এক ফুট চওড়া প্রকাণ্ড এমারিলিস পুষ্প উৎপন্ন করিতে সফল হন। তিনি প্লাম ও খোবানির সংযোগে এক নূতন মিশ্র ফল তৈয়ারী করিয়াছেন; ইহার নাম প্লামকট। তিনি একপ্রকার অদ্ভুত চেষ্টনাট গাছ উৎপন্ন করিয়াছেন যাহাতে অঙ্কুরোদ্গমের দেড় বৎসরের মধ্যেই ফল ধরে। আলুরও তিনি বহু উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। তাঁহার নাম হইতেই বারব্যাঙ্ক পোটেটোর উৎপত্তি। ইহা ছাড়া মানুষের প্রয়োজনীয় আরও কত উদ্ভিদের যে তিনি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সবিস্তারে বিবৃত করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষ সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশ। এদেশে বারব্যাঙ্কের পন্থা অনুসরণ করিলে প্রচলিত ফলমূল, শাকসব্জী ও বৃক্ষ-লতার কতই না উন্নতি করা সম্ভব, তাহা একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু আমরা কৃষিকার্যকে ছোট কাজ মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে উহা অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলিয়া রাখিয়াছি। যে দেশে রাজর্ষি জনক একদিন স্বহস্তে হল চালনা করিয়াছেন সেদেশে এইরূপ কৃষিবিমুখতা সত্যই দুঃখের বিষয়।

পাখীর কথা

গগনবিহারী জীবজন্তুর মধ্যে পক্ষীই অগ্রগণ্য। বাস্তবিক আকাশচারী প্রাণীরূপে পক্ষীর কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রায় দশ-পনর কোটি বৎসর পূর্বে আদিম সরীসৃপজাতি হইতে ক্রমবিকাশের ফলে বায়ুবিহারী বিহঙ্গমের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জার্মানির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া প্রদেশে চুনাপাথরের স্তরে আর্কিয়প্টেরিক্স নামক আদিম পক্ষীর একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবাশ্ম, fossil আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার মুখে দন্তের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পক্ষ ও পুচ্ছে পালকের চিহ্ন বর্তমান। ইহার ডানায় আবার তিনটি করিয়া নখরযুক্ত অঙ্গুলি রহিয়াছে। আকৃতি অনেক অংশে সরীসৃপ ও পক্ষীর মাঝামাঝি। বর্তমানকালে সমস্ত পক্ষী দন্তহীন হইলেও কচিৎ কদাচিৎ কোন কোন পক্ষীর ভ্রূণে ও মেরুপ্রদেশবাসী কতিপয় পক্ষীর চঞ্চুতে দন্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা হইতে পক্ষীর বিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

আধুনিক পক্ষীর শারীরিক গঠন সর্বাংশে ঊর্ধ্বে উড্ডয়নের উপযোগী। ইহাদের প্রায় সমুদয় অস্থি নলের মত ফাঁপা ও হাল্কা এবং বায়ুকোষপূর্ণ। পাখীর বক্ষের মধ্যবর্তী উরঃফলক নামক অস্থি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বৃহৎ। এই বক্ষাস্থির সহিত বক্ষপেশী শক্তভাবে সংলগ্ন থাকে। বলিষ্ঠ বক্ষপেশীর জোরে দেহের দুই পার্শ্বের ডানা নাড়িয়া পাখীরা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। এজন্য পাখীর শরীরের অর্ধেক ওজন জুড়িয়া আছে শুধু বুকের এই পেশী। পাখীর বস্তি প্রদেশ দৃঢ়ভাবে উহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন। পাখীর ডানা দুইটি হাতের কাজ করে। পক্ষীর হৃৎপিণ্ড চারকুঠুরিবিশিষ্ট ও দেহের অনুপাতে কিছু বড়। উড়িবার কালে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বলিয়া

পাখীর ফুসফুসের সহিত অস্ত্র ও অস্থির যোগাযোগ রহিয়াছে। কোন কোন পাখীর মিনিটে ১২০ বার হৃদ্‌স্পন্দন হয়।

শূন্যে বিচরণকালে কোন পাখী যখন ডানা দুইটি নীচের দিকে করে, তখন সমস্ত শরীরটা উপরে উঠিয়া যায় আর পক্ষদ্বয় উপর দিকে তুলিলে সারা দেহ সামান্য নীচে নামিয়া আসে, ক্রমাগত এইভাবে ডানা নাড়িয়া ইহারা বাতাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। ঊর্দ্ধাকাশে পাখীরা উভয় পক্ষ বিস্তৃত ও স্থির করিয়া কিছুক্ষণ বায়ুস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। পক্ষীর পুচ্ছ গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

পাখীর সর্বশরীর কোমল পালক দিয়া ঢাকা। ইহাদের ডানা ও লেজের পালকগুলি বড় বড় আর অন্য সমস্ত পালক ছোট ছোট। বৎসরে একবার ইহারা পালক বদলাইয়া থাকে। সর্বাঙ্গে পালকের আবরণ থাকায় পাখীর দেহতাপ শীতল বাতাসের মধ্যেও সমভাবে রক্ষিত হয়। পাখীর রক্তের উত্তাপ আমাদের দেহতাপ অপেক্ষা অধিক। সাধারণ সমস্ত পাখীর উত্তাপ ১০০ হইতে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি হয়। চাতকের শরীরতাপ ১১০ ডিগ্রী আর মুরগীর দেহতাপ ১০৩ ডিগ্রী হয়।

শস্যকণা ভোজনকারী পক্ষীর পাকস্থলীর এক অংশে পাথরের টুকরা সঞ্চিত থাকে। ভুক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ এই সব প্রস্তরখণ্ডের সজ্ঘর্ষে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। বস্তুত দন্তের ক্রিয়া এই উপায়ে নিষ্পন্ন হয়। পাখীর ঠোঁট শৃঙ্গময় পদার্থ দিয়া গঠিত। ইহাদের চঞ্চুমূলে নাসারন্ধ্র দুইটি অবস্থিত আর মস্তকের দুই পার্শ্বে পালকে ঢাকা কর্ণরন্ধ্র বর্তমান। মস্তিষ্কের যে যে অংশ শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে, cerebellum, পক্ষীর সেই ভাগ বেশ বর্ধিত ও বিকাশ প্রাপ্ত। সমস্ত পক্ষীর মূত্র পুরীষের সহিত নির্গত হয়। উহার জন্য কোন পৃথক পথ নাই। পাখীর পায়ে চারিটি করিয়া আঙ্গুল থাকে।

বসন্ত ও গরমকাল পাখীদের নীড় নির্মাণের সময়, এইক্ষণে স্ত্রীপক্ষীরা ডিম পাড়ে। খুব সম্ভব ক্রমবর্ধমান দিবালোক ও উত্তাপ পক্ষীদের উত্তেজিত করে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষী পালা করিয়া ডিমে তাপ দেয়। ডিম ফুটিয়া যথাসময় ছানা বাহির হয়। ডিমের বহিরাবরণ চূণের মত বস্তুর দ্বারা গঠিত। খোলার ভিতর ভ্রূণ ও উহার খাদ্যস্বরূপ হলদে রঙের কুসুম থাকে। বাচ্চার নিঃশ্বাসের জন্য বায়ুপথ আছে। পাখীর ডিম সাদা, রঙীন, ছিটযুক্ত, নানারকম হয়। কাক ও শালিখের ডিম নীল বর্ণের, টুনটুনির রক্তাভ, গিনি ফাউলের কমলা রঙের, বকের বাদামী বর্ণের, বটের ও গোদাচিলের সবুজ রঙের হয়। আকারে অস্ট্রিচের ডিম সব থেকে বড়— প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, রঙ হাল্‌কা হলদে। আমেরিকার হামিং বার্ডের ডিম মটরের মত ছোট।

পক্ষীশাবক যতদিন ছোট থাকে, ততদিন পিতামাতার নিকট আহার পায়। কিন্তু স্ত্রী-কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া সন্তান পালনের সকল দায়িত্ব এড়ায়। সলমন দ্বীপপুঞ্জের ব্রাশ টার্কী পক্ষিণী বালুকাময় লতাগুল্মের মধ্যে ডিম পাড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। তাহার পর পচনশীল উদ্ভিদসঞ্জাত উত্তাপের ফলে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়।

এই পৃথিবীতে আটাশ হাজার রকম পাখী রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অস্ট্রিচ, রিয়া, এমু, কিউই ও ক্যাসোয়ারী পক্ষীর দৌড়াইবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু উড়িবার ক্ষমতা মোটেই নাই, আর পেঙ্গুইন পক্ষী উত্তম সন্তরক কিন্তু উড্ডয়নশক্তিরহিত। আকারে আফ্রিকার অস্ট্রিচ পক্ষী বৃহত্তম। ইহাদের উচ্চতা মাথা পর্যন্ত আট ফুট হয় আর ওজন প্রায় আড়াই মণ। অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম পক্ষী হইল আমেরিকাবাসী নয়নরঞ্জক হামিং বার্ড, লম্বায় দুই ইঞ্চি পরিমিত এবং ওজনে ত্রিশ রতি মাত্র। বড় বড় উড়ো পাখীর মধ্যে এলবাট্রস ও কণ্ডরের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই এলবাট্রস পক্ষী পৃথিবীর দক্ষিণ

সমুদ্রের উপকূলে পাওয়া যায়। দেখিতে বৃহৎ হংসের মত, পায়ের পাতা পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া। ইহাদের শরীর চার ফুট দীর্ঘ, কিন্তু উভয় পক্ষ বিস্তার করিলে আন্দাজ বার ফুট হয়, ওজন প্রায় আধ মণ। প্রবল ঝড় কিম্বা বিশাল তরঙ্গ কিছুই ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার কণ্ডর নামক শকুনপক্ষী প্রায় সমান বড়। এই জাতীয় শকুন আকাশে চার মাইল উর্দ্ধে অক্লেশে উড়িতে পারে।

কোন কোন পক্ষীর বর্ণবৈচিত্র্য অতি সুন্দর দেখা যায়। সৌন্দর্যময়



ফেঝাণ্ট ও ময়ুর

পাখীর নাম করিতে গেলে ময়ুর, মাছরাঙা, ফেঝাণ্ট, নীলকণ্ঠ, নন্দন পক্ষী, হুপো ও হামিং বার্ডের কথা সর্বপ্রথম মনে আসে। বাস্তবিক এই সকল

পক্ষীর রঙীন পালক অপরূপ সুন্দর। পুরুষ পক্ষী সাধারণতঃ স্ত্রীপক্ষী অপেক্ষা অধিক সুশ্রী হয়। জলচারী পাখীর মধ্যে এদেশের পানকৌড়ি ও দূর প্রাচ্যের করমোরাণ্ট পক্ষী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উভয় পক্ষীর পদদ্বয় হাঁসের মত পাতলা চর্মযুক্ত এবং উভয়েই জলের মধ্যে ডুবিয়া মৎস্য শিকার করিতে সুনিপুণ। চীন দেশে শিক্ষিত করমোরাণ্টের সাহায্যে মাছ ধরা হয়। পালিত পক্ষীর গলায় সূতা বাঁধা থাকায় ধৃত মৎস্য গিলিয়া ফেলিবার কোন উপায় থাকে না।

এখানে কতিপয় পক্ষীর গতির মাপ দেওয়া হইল। ঈগল পাখী



ঈগল

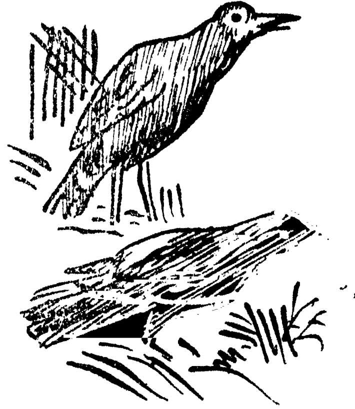
ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে উড়িতে পারে, হংসবাজ ইহা অপেক্ষাও দ্রুতগামী। দৌড়ের পায়রা ঘণ্টায় ৬০ মাইল যাইতে পারে। বুনো

হাঁসের আকাশগতি ঘণ্টায় ৪৫ মাইল, কিন্তু চড়ুই পাখীর বেগ ঘণ্টায় ২০—২৫ মাইলের বেশী নয়। বিভিন্ন পক্ষীর জীবনকাল এইরূপ—ঈগল-পাখী ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং বন্দী অবস্থায় কোন কোন টিয়াপাখীর আয়ু ৮০ বছরের কম নয়, কিন্তু সাধারণত ২০—৫০ বছরের মধ্যে। কেনারি পাখী ১৫ বছর, মুরগী ১৫—২০ বছর, ঘুঘু ২০ বছর, হাঁস ২৫—৫০ বছর, কাক ২৫ বছর এবং অস্ট্রীচ ও শকুন ৫০ বছর বাঁচে। চাতকাদি ছোট পাখীদের পরমায়ু আট-নয় বৎসর মাত্র।

সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পাখীরা নীড় রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা প্রদর্শন করে। বাবুই পক্ষী সরু সরু ঘাস বা খড় বুনিয়া লাউ-এর মত লম্বা বাসা নির্মাণ করে। উহার মুখ নীচের দিকে থাকায় বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট হয় না। কখনও কখনও গাছের ডাল হইতে এইরূপ ত্রিশ-চল্লিশটি বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। ছোট ছোট টুনটুনি পাখী আবার কোন গাছের দুইটি পাতা সরু তন্তু দিয়া সুকৌশলে শেলাই করিয়া পেয়ালার মত বাসা নির্মাণ করে এবং উহার মধ্যে নরম ঘাস, শেওলা, পশম বা পালক স্থাপন করে। চাতক পাখী মুখের লালা দিয়া পালক জুড়িয়া অথবা মাটি লেপিয়া বেশ বাসা প্রস্তুত করে। মাছরাঙা নদীর ধারে গর্তের ভিতর বাসা করে। তবে মনে রাখিতে হইবে পাখীর নীড় নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক বৃত্তির, instinct-এর ক্রিয়া, ইহার জন্য শিক্ষা বা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নাই। কোন পক্ষীশাবককে নিতান্ত শিশু অবস্থায় পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পরিবেশে পালন করিলেও বড় হইয়া সে ঠিক ঐরূপ বাসা প্রস্তুত করিতে পারে।

কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, আমেরিকার ব্যাঙ্গকারী বিহঙ্গ এবং ইউরোপের ষ্টার্লিং ও সেজ ওয়ার্বলার প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষীর নানাপ্রকার শব্দ নকল করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারিলে এই

সকল পাখী বিভিন্ন বাক্য ও ধ্বনি অদ্ভুত রকম অনুকরণ করে। কোন কোন পক্ষীপালক বুলফিঞ্চ নামক গায়ক পাখীদের মধ্যে বাছিয়া এক একটিকে এক এক রকম বাঁশীর সুর শিখাইয়া থাকেন। তদনন্তর সমস্ত শিক্ষিত পক্ষীকে একত্রিত করিয়া গান গাহিতে উৎসাহিত করা হয়, তখন সমবেত পক্ষীসঙ্গীত অতীব সুমধুর মনে হয়। অনেক গায়ক পক্ষীদের গান জন্মগত ও বংশানুক্রমিক। এই সকল পাখীর ছানাকে যদি জন্ম হইতে আলাদা করিয়া অন্য পাখীর সুর শুনান হয়, তাহা হইলেও তাহারা বড় হইয়া ঠিক স্বজাতিসুলভ গান আরম্ভ করে। কিন্তু অপরাপর পক্ষী স্বজন-সঙ্গীত



ষ্টারলিং

না শুনিলে কিছুতেই গোষ্ঠী-গীতি গাহিতে পারে না। ইহাদের সঙ্গীত শিক্ষা অনেকটা মানুষের ভাষা শিক্ষার মত। একজন জার্মান পক্ষীতত্ত্ববিদ কতকগুলি কেনারি পক্ষীশাবককে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের অনবরত নাইটিঙ্গেল পাখীর স্বর শুনাইতে লাগিলেন। এই সব কেনারি যখন বড়

হইল, তখন তাহারা নিজেদের ডাক ভুলিয়া অনেকটা নাইটিঙ্গেল পক্ষীর মত গান করিতে আরম্ভ করিল।

পাখীদের মধ্যে কোন কোন জাতি শীতের অগ্রে কিম্বা গ্রীষ্মের পূর্বে দলে দলে দেশান্তরে গমন করে। আমাদের দেশে যেমন বন্যহংস শরৎশেষে হিমপ্রধান উত্তর অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া সারা শীত অবস্থান করে, কিন্তু গ্রীষ্মের সূচনায় আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। অন্যদিকে বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কোকিল এদেশে বসবাস করে, কিন্তু শীতের অনেক আগেই আবার উষ্ণপ্রধান দক্ষিণদেশে প্রত্যাবর্তন করে। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে শীতকালে উত্তর অঞ্চলের পক্ষী সকল দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসে, আর গরম কালে দক্ষিণ দেশের পক্ষী উত্তর অংশে গমন করে। অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিলে পাখীরা সহজলভ্য খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য এবং নীড় নির্মাণ ও সন্তান পালনের নূতন স্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরে গমন করে। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তাহারা শত সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া যায়।

পাখীর পায়ে নাম-ঠিকানা লেখা এলুমিনিয়াম বা প্লাষ্টিকের আঙটি পরাইয়া উহার দেশ ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। চাতকপক্ষী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ৬০০০ মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে এবং সেখানে সারা শীত অতিবাহিত করিয়া বসন্ত সমাগমে বাসা বাধিবার জন্য পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় তাহারা পূর্ব বৎসর যে বাড়ীতে বাসা করিয়াছিল, পর বৎসর ফিরিয়া গিয়া ঠিক সেই স্থানেই নীড় রচনা করে। টার্ন নামক উত্তর মেরুবাসী জলচারী পক্ষীর দূর গমন আরও বিস্ময়কর। ইহারা জুলাই মাসে লাব্রাডর ত্যাগ করিয়া ৮০০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে। দূরদেশে গমনকালে পক্ষী কর্তৃক এক দেশের

উদ্ভিদ বীজ সহজেই অন্য দেশে নীত হয়। এক এক সময় কোন কঠিন বৃক্ষ-বীজ পক্ষীর উদরস্থ হইলেও পাকস্থলীর রসে জীর্ণ না হইয়া অবিকৃত অবস্থায় পুরীষের সহিত বহির্গত হয় এবং উহা হইতে চারাগাছ জন্মায়।

মোরগের বর্ণশোভা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু মুরগী কি তাহার সঙ্গীর রঙীন পালকের সৌন্দর্য আমাদের মতই দেখিতে পায়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি অন্ধকার ঘরে এমনভাবে একটি বাতি ও ত্রিকোণ কাচ, prism রাখা হয়, যাহাতে ঐ বাতির আলো তিনকোণা কাচের মধ্য দিয়া বাহির হইবার সময় রামধনুর মত সপ্ত-বর্ণে বিভক্ত হইয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়ে। এখন ঐ বর্ণালীর, spectrum সারির উপর শস্যকণা ছড়াইয়া দিয় একটি মুরগী আনিয়া ঐ ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুরগী ঘরে আসিয়াই ঐ সব শস্যকণা ঠুকরাইয়া খাইতে আরম্ভ করে। উহার আহার কার্য সমাধা হইলে, উহাকে ঘরের বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া মেঝের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সবুজ, হলদে এবং লাল সারির প্রায় সকল শস্যকণাই মুরগীর উদরস্থ হইয়াছে। নীল সারির মাত্র অল্প কয়েকটি দানা ভক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু বেগুনী বর্ণস্থ দানাগুলি যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মুরগীর নীলবর্ণ জ্ঞান তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু বেগুনী বর্ণ একেবারেই উহার দর্শনেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত।

ঈগল, চিল, শ্যেন, শকুন প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীব দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ, বহুদূর হইতে ইহারা শিকারের অস্তিত্ব জানিতে পারে। পাখীদের মধ্যে নিউজিলাণ্ডের কিউই পক্ষীর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্তপ্রখর, ইহাদের নাসারন্ধ্র চঞ্চুর অগ্রভাগে অবস্থিত। পেঁচার আঘ্রাণবোধও বেশ ভাল। আর টিয়াপাখীর আস্বাদ-জ্ঞান বিলক্ষণ উন্নত। হাঁস ও কাদাখোঁচার স্পর্শানুভূতি বিশেষ তীব্র। পাখীরা কেমন করিয়া বহুদূর হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া

আসে, তাহাও আর একটি অজ্ঞাত রহস্য।

কয়েক বৎসর পূর্বে জার্মানির ব্রেমেন নামক স্থানে পরীক্ষার জন্য সাতটি চাতক পক্ষী ধরা হয়। চিনিবার সুবিধার জন্য তাহাদের কয়েকটি সাদা



শকুন

পালকে লাল রঙ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর চাতক গুলিকে এরোপ্লেনে করিয়া ব্রেমেন হইতে ৪০০ মাইল দূরে ইংলণ্ডের ক্রয়ডন নামক স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাতটির মধ্যে পাঁচটি চাতকই

ব্রেমেনে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। দৌড়ের পায়রা যে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কানাডায় এক জাতীয় জলচর পক্ষী, plover বাস করে। গ্রীষ্মাবসানে ইহারা কানাডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় যায়। সমুদ্রের উপর দিয়া ২৫০০ মাইল অবিশ্রাম উড়িয়া তবে ইহারা গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছায়। জলচারীদের এই কার্য যে অসাধারণ সহনশীলতার পরিচয় শুধু তাহাই নয়, অকূল পাথারে ইহারা কিরূপে দিক নির্ণয় করে তাহাও ভাবিবার বিষয়।

পক্ষীজাতি প্রধানত সহজাত জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলেও কোন কোন কার্যে ইহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা পাইলে পায়রা দুই একটি ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে। পাখীর পরিমাণ জ্ঞানের অল্পস্বল্প লক্ষণ পাওয়া যায়। বাসা হইতে চারিটি ডিমের মধ্যে দুইটি ডিম অপসারিত হইলে পক্ষী নীড় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু চারিটি হইতে একটি মাত্র ডিম সরাইয়া লইলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। মুরগীকে এক সারি শস্যকণার মধ্যে কেবল একটি দানা অন্তর একটি দানা গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রথমে একটি শস্যকণা অন্তর একটি শস্যকণা মাটিতে আঠা দ্বারা সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করা হয়। মুরগী তথায় আসিয়া শীঘ্রই অসংলগ্ন প্রতি দ্বিতীয় শস্যের দানা ভক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। তদনন্তর শস্যসারির একটিও দানা আর ভূমিসংলগ্ন না রাখিয়া মুরগীকে আহার করিতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু উহার অভ্যাস এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সে পূর্বের মত একটি দানা অন্তর অন্তর শস্যকণা উদরস্থ করিতে থাকে।

পাখীরা পূর্বরাগপালাকে কিরূপ উচ্চ কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে, পূর্বে "জীবজন্তুর প্রণয়কলা" অধ্যায়ে তাহা আলোচনা করিয়াছি।

অধিকাংশ ছোট পক্ষী প্রতি বৎসর নূতন করিয়া সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন

করে। কিন্তু অন্য অনেক পক্ষী যেমন বক, টিয়া, ঈগল, দাঁড়কাক আজীবন স্ত্রী-পুরুষ একত্র থাকে। আফ্রিকার প্রেমিকপক্ষী এবং এদেশের চক্রবাক চক্রবাকীর দাম্পত্য প্রণয় চিরপ্রসিদ্ধ।

ভারতের বিষধর সর্প

বিচিত্র গতিভঙ্গী, অদ্ভুত আকার, সুদৃশ্য বর্ণচ্ছটা ও সাংঘাতিক তীব্র বিষের জন্য বিষধর সর্প প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশেরই জনসাধারণের মনে ভয় ও বিস্ময়-সঞ্জাত বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দের মধ্যে সর্পের পূজা-পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশেই ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রকার প্রতীকরূপে সর্পদেহের প্রাধান্য বর্ত্তমান। আধুনিক ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে সর্প পুরুষত্বের প্রতীক। এই অদ্ভুত জাতীয় সরীসৃপ-সংক্রান্ত বহু রহস্যই দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবিষ্কৃত ও মানব জাতির অজ্ঞাত ছিল; এ জন্য সর্প সম্বন্ধে নানাবিধ কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়া দেশে দেশে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। সর্পতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকগণের রচিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে সর্প সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল।

সাধারণ বর্ণনা

মেরুপ্রদেশ ও নিউজিল্যাণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেরই জলে,

স্থলে, ভূগর্ভে, বৃক্ষে, পর্ব্বতে বা গিরিকন্দরে প্রায় ১৭০০ বিভিন্ন জাতীয় সর্পের বাস।

সর্প মেরুদণ্ডধারী সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের দেহের রক্ত শীতল ; অর্থাৎ ইহাদের দেহ আবহাওয়ার প্রভাবে উত্তপ্ত বা শীতল হইয়া থাকে। সাধারণ পশু-পক্ষীর ন্যায় ইহাদের শরীরের তাপ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহাদের শরীর—মস্তক, দেহাংশ (ধড়) ও লেজ—এই তিন অংশে বিভক্ত হইতে পারে। সর্পের পশ্চাদ্দেশের নিম্নভাগই উহার লাঙ্গুল।

সর্পদেহ বহুসংখ্যক শল্কে বা আঁইসে আবৃত। এই সকল শল্কের সংখ্যা ও অবস্থান লক্ষ্য করিলেই বিষধর সর্প নির্ভুল ভাবে চিনিতে পারা যায় ; পরে আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সর্প দুই-তিন মাস অন্তর নির্ম্মোক (খোলস) বর্জ্জন করে। ইহাদের পরিত্যক্ত খোলস অনেকেই দেখিয়াছেন। খোলস ত্যাগের সময় ইহারা দুর্ব্বল, অসহায়, এবং অন্ধবৎ হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

সর্পের চোখের পাতা নেই ; উহা স্বচ্ছ চর্ম্মে আবৃত। চোয়ালের গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য সর্প তাহার মুখবিবর ইচ্ছামত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারে। ইহাদের দীর্ঘ দ্বিধাবিভক্ত লকলকে জিহ্বা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

ভেক, ইঁদুর, এবং নানা প্রকার পোকা-মাকড় সর্পের খাদ্য। ইহারা এই সকল প্রাণী দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করায় মানব জাতির কথঞ্চিৎ উপকার করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প আহার করিয়া জীবনধারণ করে। সর্পের আস্বাদবোধ আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ; সম্ভবতঃ তাহা নাই। আহার্য্য ও পানীয় ব্যতীত ইহারা যে বহু দিন জীবনধারণে সমর্থ, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ক্রুদ্ধ গোখুরা ও চন্দ্রবোড়ার 'ফোঁস-ফোঁস' গর্জন মানবের পক্ষে ভীতিপ্রদ। ইহারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু গ্রহণ করিয়া, পরে নাসিকার

সাহায্যে তাহা সজোরে ত্যাগ করে, এই জন্যই তাহাদের ফোঁস-ফোঁস ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে সর্প শ্বাস না লইয়া জলমধ্যে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে।

সর্প সম্পূর্ণ মসৃণ স্থান দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু খসখসে ভূমির উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে পারে। ইহাদের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় তিন মাইল। দৈবাৎ জলে পড়িলে সকল জাতীয় সর্পই সাঁতার দিতে সুদক্ষ।

সর্পী চার মাস গর্ভধারণ করে, এবং বৎসরে ২০ হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। সূর্য্যের উত্তাপ পাইলে প্রায় তিন মাস পরে ডিম্ব ফাটিয়া শাবক বাহির হয়। চারি বৎসর বয়সে সর্প যৌবন-প্রাপ্ত হয়। কোন কোন জাতীয় সর্পকে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

লতাগুল্মাদিপূর্ণ স্থান, জঙ্গল, অন্ধকারাবৃত গর্ত্ত, পুরাতন প্রাচীরের ফাটল, পরিত্যক্ত বা পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝের তলস্থ বিবর, এবং, অন্যান্য নিভৃত স্থানে সর্পের বাস। সাধারণত, তাড়া করিলে ইহারা পলায়নের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পলায়নের সুযোগ না পাইলে, বা ইহাদের দেহে কি লেজে পা পড়িলে ইহারা দংশন না করিয়া ছাড়ে না। কথায় বলে বিষধর সর্প 'তেড়ে, ফুড়ে ও প'ড়ে' অর্থাৎ তাড়াইয়া গিয়া, বা মাটী ফুড়িয়া গর্ত্ত হইতে উঠিয়া, অথবা কোন উচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িয়া দংশন করিলে, সেই দংশন সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

কাণ বা কাণের ফুটা না থাকিলেও সর্পের শ্রবণশক্তি আছে। প্রসিদ্ধ সর্পতত্ত্ববিদ্ কর্ণেল ওয়াল বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, বায়ুবাহিত শব্দ সাপ শুনিতে পায় না। ভূমির উপর যষ্টির আঘাতে বা মৃত্তিকায় পদক্ষেপে যে শব্দ হয়, কেবল তাহাই ইহাদের শ্রবণগোচর হয়।

ঐ বিশেষজ্ঞ আরও বলেন যে, সাপুড়ের বংশীধ্বনির পরিবর্ত্তে তাহার বাঁশী, হাত বা জানুর আন্দোলনই কেবল গোখুরা সর্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

এবং সেই আন্দোলনের সহিত তাল রাখিয়া ইহারা ইতস্ততঃ ফণা সঞ্চালন করে। সর্পজাতির প্রকৃতি ও গতিবিধি উত্তমরূপে জানা থাকায়, সাপুড়েরা সুকৌশলে বিষধর সাপ ধরিয়া দক্ষতার সহিত খেলাইতে পারে; অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, এবং প্রধানতঃ ক্ষিপ্রতার সহিত হস্তের পরিচালন-কৌশলে সর্প তাহাদিগকে দংশন করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন— সাপ যখন ফণা বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথায় পিছন দিক শক্ত করিয়া ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাপকে সম্পূর্ণ মৃতের মত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর অধিকাংশ সাপই বিষহীন। ভারতবর্ষ ৩৩০ জাতীয় সর্পের আবাসভূমি; কিন্তু ইহার এক-পঞ্চমাংশই কেবল বিষধর। সুতরাং শতকরা ৮০টি সর্পই বিষধর নহে মনে করিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

বিষধর সর্প

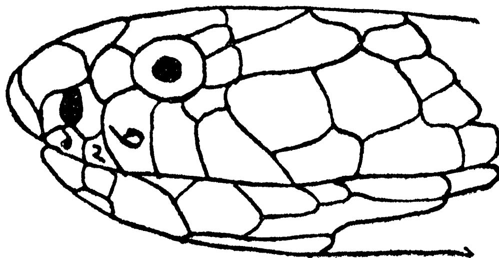
গোখুরা cobra, প্রবাল সাপ coral snake, করাইত krait, বোড়া viper, এবং সামুদ্রিক সর্পকে sea-snake-কে লইয়া এ দেশের বিষধর সাপের গোষ্ঠী। নিম্ন প্রকাশিত আকার-প্রকার ও লক্ষণ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্‌গুলি বিষধর ও কোন্‌গুলি বিষহীন সর্প।

সকল প্রকার গোখুরা সর্পের একটি সাধারণ চিহ্ন লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের ওষ্ঠপ্রান্তের তৃতীয় শল্কটি নাসাশল্ক ও চক্ষুকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ, গোখুরা সর্পের দেহ ২·৬ হইতে ৪·৬ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহাদের ফণার উপর গোক্ষুর ক্ষুরের মত দুইটি চক্রাকৃতি চিহ্ন থাকায়

ইহারা গো-ক্ষুর বা গোখুরা নামে অভিহিত। বাদামী, কালো, বা ধূসর রঙের গোখুরা সাপ ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজগোখুরা বা শঙ্খচূড় king cobra সর্প ১০ হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; গোখুরাজাতীয় সর্পের মধ্যে ইহারাই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা



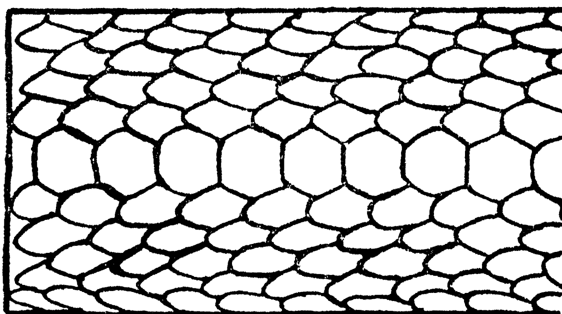
গোখুরার মাথা

বৃহৎ। ইহাদের রঙ পীতাভ, সবুজ বা কালো, এবং ফণার উপর গোক্ষুর-চিহ্ন বর্ত্তমান। বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশের বনেজঙ্গলে রাজগোখুরা সাপ বাস করে।

বাঙ্গালাদেশে এক জাতীয় কালো গোখুরাই কেউটে সাপ, monocellate বা black cobra নামে অভিহিত; কিন্তু পার্থক্য এই যে, ইহাদের ফণার উপর একটি চক্রাকৃতি চিহ্ন থাকে, কখন কখন কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি ও ক্রূর।

গোখুরার মত প্রবাল সাপেরও ওষ্ঠপ্রান্তস্থ তৃতীয় শল্কটি নাসা-শল্ক ও চক্ষুকে স্পর্শ করে। ইহাদের দেহের নিম্নাংশ ও উদর প্রবালের মত রক্তাভ বলিয়া ইহারা প্রবাল সাপ নামে পরিচিত। ইহাদের দেহ ১ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ। প্রবাল সাপ ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, এবং প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই ইহাদিগের বাস।

করাইত জাতীয় সকল সাপেব পিঠের মধ্যসারির শল্কগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ষড়্‌ভুজাকৃতি। ইহারা ১০টি উপজাতিতে বিভক্ত, তাহাদের



করাইতের পিঠ

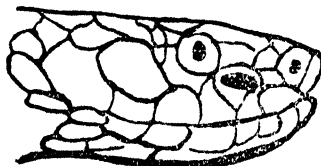
মধ্যে সাধারণ করাইত, common krait ও রঞ্জিত করাইত, banded krait সচরাচর দেখা যায়।

সাধারণ করাইতের রঙ নীলাভ কালো, কেবল মধ্যে মধ্যে সাদা ডোরা থাকে। ইহাদের দেহ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ। ভারতের সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

রঞ্জিত করাইতের বর্ণ-বৈচিত্র্য অতি সুন্দর। ইহাদের সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া পব-পর একটি কালো ও একটি হলদে ডোরা থাকে। দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। দক্ষিণভারত, বিহার, বাঙ্গালা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে এই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়াজাতীয় সকল সাপের মাথা ত্রিভুজাকার, ঘাড় সরু এবং লেজ ছোট। অধিকাংশ বোড়ার মাথা ছোট ছোট শল্কে আবৃত। বোড়া সর্পীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহারা ডিম না পাড়িয়া একেবারে জীবিত শাবক

প্রসব করে। কোন কোন বোড়ার মাথায় চোখ ও নাকের মধ্যস্থলে একটি ফুটা থাকায় উহাদিগকে ছিদ্রযুক্ত বোড়া, pit viper বলা হয়। অপর



সছিদ্র বোড়ার মাথা

শ্রেণীর মাথায় ঐরূপ কোন ছিদ্র নাই বলিয়া উহারা ছিদ্রহীন বোড়া, pitless viper নামে অভিহিত।

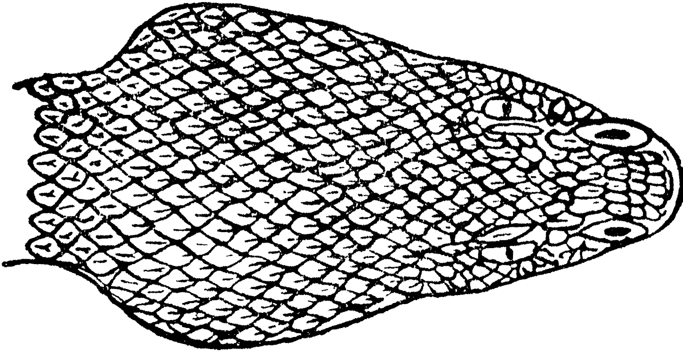
ছিদ্রহীন বোড়া ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, কিন্তু তন্মধ্যে চন্দ্রবোড়া, Russell's viper ও ফুর্শা, sawscaled viper প্রায়ই দেখা যায় বলিয়া সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রবোড়ার রঙ বাদামী, সবুজাভ কিম্বা ধূসর, ; ইহাদের পিঠে কালো বুটির তিনটি সারি আছে, এবং মাথায় ইংরেজি 'v'-এর মত চিহ্ন দেখা যায় এই সাপ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে চন্দ্রবোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বাদামী, ধূসর অথবা সবুজ রঙের ফুর্শা দেখা যায়। ইহাদের মাথায় পাখীর পদচিহ্নের মত দাগ থাকে, এবং পিঠের দুই পাশ দিয়া দুইটি সাদা রেখা লেজ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; ইহা ব্যতীত মাঝখান দিয়া বরফির মত সাদা দাগের আরও একটি সারি গিয়াছে। তাড়া দিলে ফুর্শা ৪-এর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, এবং শল্কে শল্কে ঘর্ষণ করিয়া করাতের মত শব্দ করে। এই সাপ পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে। ইহাদিগকে সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, এবং রত্নগিরি

জেলাতে প্রায়ই দেখা যায়। বিষধর হইলেও ফুর্শার দেহ ১৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয় না।

এই শ্রেণীর অন্যান্য সর্পের মত ছিদ্রযুক্ত বোড়ারও ত্রিভুজাকার মাথা সরু ঘাড়, ছোট লেজ এবং মোটাসোটা শরীর; কিন্তু বলা হইয়াছে যে,



চন্দ্রবোড়ার মাথা

ইহাদের নাক ও চোখের মাঝখানে একটি ছোট ছিদ্র আছে, তাহা অন্য কোন সাপের মাথায় দেখা যায় না। ইহারা ১১টি উপজাতিতে বিভক্ত, এবং সাধারণতঃ এই জাতীয় অধিকাংশ সাপের মস্তক ছোট-ছোট শল্কে আবৃত, কেবল চারি জাতির মাথায় বড়-বড় শল্ক দেখা যায়। সছিদ্র বোড়া বাদামী, সবুজ, কালো ও ধূসর রঙের হইয়া থাকে। ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ফুট হইতে চার ফুট। হিমালয়, পশ্চিম ঘাট, আসাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে সছিদ্র বোড়া বাস করে।

সামুদ্রিক সর্পের লেজ দাঁড়ের মত চেপ্টা হওয়ায় তাহারা অনায়াসে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটিতে পারে। ভারত-মহাসাগরে এবং সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানে প্রায় ২৯ প্রকার সামুদ্রিক সর্প এ-পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

এই সকল জলজ সাপের পিঠে সুস্পষ্ট সবুজ কিম্বা নীল রঙের ডোরা থাকে, ইহাদের দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৫ ফুট।

বিষদাঁত ও বিষ

বিষাক্ত সাপের উপরের চোয়ালে দুই পাশে দুইটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দাঁত আছে, উহাই বিষদাঁত। সর্পের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র এই বিষদাঁত। উহা ইঞ্জেকশন দিবার সূচের মত ফাঁপা হয়, কিম্বা উহাতে সরু নালি কাটা থাকে, এজন্য সহজেই বিষ গড়াইয়া আসে। কার্য্যকরী



বিষদাঁত ও বিষগ্রন্থি

বিষদাঁতের পশ্চাতে আরও কয়েকটি দাঁত সঞ্চিত থাকে, কোন কারণে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে এই অতিরিক্ত দাঁত প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে বিষদাঁতে পরিণত হয়। এই জন্য সাপুড়েরা কিছু দিন অন্তর তাহাদের সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া থাকে। বিষধর সর্পের চক্ষুর পশ্চাতে একটি করিয়া বিষগ্রন্থি অবস্থিত, এবং উহা হইতে একটি সরু নলী আসিয়া বিষদাঁতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দংশন করিবার সময় উক্ত বিষগ্রন্থি হইতে বিষ বাহির হইয়া ঐ নলী ও বিষদাঁতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে প্রবেশ করে।

এই বিষ পাচক রসের মত সর্পের আহার্য্য বস্তু পরিপাকে সহায়তা

করে। সদ্য-সংগৃহীত সর্প-বিষ দেখিতে অনেকটা সরিষার তৈলের মত ; শুষ্ক করিলে গঁদের মত হইয়া যায়, কিন্তু উহার তীব্রতা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট, গোল্ড ক্লোরাইড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি ঔষধের সংস্পর্শে আসিলে বিষের অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

বিষ-ক্রিয়া

সাপের বিষ ভক্ষণ করিলে কোনরূপ ক্ষতি না হইবারই সম্ভাবনা ; কারণ পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার তীব্রতার হ্রাস হয়। কিন্তু কোনক্রমে ঐ বিষ রক্তস্রোতের সহিত দেহে সঞ্চালিত হইলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে দষ্ট-স্থানে সাধারণত বিষদাঁতের দুইটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ক্ষতস্থানে অনেকগুলি ফুটা থাকিলে বুঝিতে হইবে, উহা নির্বিষ সাপের দংশন।

সাধারণ গোখুরায় দংশন করিলে প্রায় দেড় রতি পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু ইহার এক-দশমাংশ বিষ মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক। দংশনের প্রায় ২০ মিনিট পরে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথমে দষ্ট-স্থানে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, ও ফুলিয়া উঠে ; কিন্তু ক্রমশঃ ঐ স্থান অসাড় হইয়া যায়। ধীরে ধীরে হাত, পা, সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যাওয়ায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অবসন্ন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। গলা ও মুখের মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হওয়ায় আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না, এবং বিবমিষার জন্য প্রায়ই বমন হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, অবশেষে উহা থামিয়া যাওয়ায় প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে।

প্রবাল সাপের মুখ খুব ছোট বলিয়া উহারা মানুষের আঙুলে ছাড়া আর কোথাও দংশন করিতে পারে না। সে জন্য প্রবাল সাপের দংশনে প্রায়ই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না।

সাধারণ করাইতের বিষ গোখুরা-বিষ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক তীব্র; কিন্তু রঞ্জিত করাইতের বিষ ইহা অপেক্ষাও পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। করাইতের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে গোখুরা-দংশনের মত উল্লিখিত পক্ষাঘাতের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়; ইহা ভিন্ন দষ্ট ব্যক্তির উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

চন্দ্রবোড়া বা ফুর্শা দংশন করিলে, ক্ষতস্থানে প্রথমে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। দষ্ট-স্থানে, চর্ম্মের নীচে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি হইতে অনবরত রক্তপাত হইতে থাকে; ক্ষতস্থান ক্রমশঃ পচিয়া উঠিয়া বিষাইয়া যায়। যদি দংশনের সহিত বেশী পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু হয়।

সচ্ছিদ্র বোড়ার দংশন কদাচিৎ সাংঘাতিক হয়; কেবল দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে ও উহাতে কিঞ্চিৎ যাতনা হয়। কিন্তু কিছু দিন চিকিৎসা করিলে ঐ ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে।

সমস্ত সামুদ্রিক সর্পই বিষধর; বিষগ্রন্থি ও বিষদাঁত ছোট ও অপূর্ণ হওয়ায় ইহাদের দংশনে সাধারণতঃ প্রাণহানি হয় না। যদি কোন রকমে যথেষ্ট মাত্রা বিষ শরীবে প্রবেশ করে, তবে গোখুরার মত বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

আজকাল চিকিৎসাকার্য্যে সর্পবিষের অল্প-স্বল্প ব্যবহার দেখা যায়। সর্পাঘাতের প্রামাণ্য প্রতিষেধক ঔষধ এন্টিভেনিন বিষ হইতেই প্রকারান্তরে প্রস্তুত হয়। দুরারোগ্য কর্কটরোগে, cancer-এ গোখুরার বিষ সামান্য মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল স্থলে অল্প পরিমাণ

চন্দ্রবোড়ার বিষ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ছাড়া মৃগী এবং কোন কোন স্নায়ুরোগের, choreaর চিকিৎসায় সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

বিষধর সর্প দংশন করিলে ১০ মিনিটের মধ্যেই বিষ হৃৎপিণ্ডের প্রতি-স্পন্দনে রক্তের সহিত মিশিয়া, সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সুতরাং পা বা হাত দংশিত হইলে অবিলম্বে ক্ষতস্থানের কিছু উপরে কাপড়ের পাড়, দড়ি কিম্বা রুমাল দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে ঐ স্থানে রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না। কিন্তু ঐ বন্ধন, দংশন অনুযায়ী হাঁটুর উপর উরুতে কিম্বা কনুই-এর উপরে বাহুতে দেওয়া উচিত, কারণ ঐ দুই জায়গায় একটি করিয়া হাড় থাকায় যে কোন বন্ধন খুব কার্য্যকরী হয়। বন্ধনী দৃঢ় করিবার আরও উপায় আছে। প্রথমে কাপড়ের পাড় বা দড়ি ঢিলাভাবে বাঁধিয়া আধা গাঁট দিবেন, পরে উহার উপরে একটি মজবুত কাঠি রাখিয়া পুরা গাঁট বাঁধিবেন। এইবার কাঠিটি হাত দিয়া ক্রমাগত ঘুরাইলে ঐ দড়ি পাকাইয়া গিয়া বন্ধনী অধিকতর দৃঢ় হইবে। পচন নিবারণের জন্য আধ ঘণ্টা অন্তর আধ মিনিটের জন্য বন্ধনী একবার ঢিলা করিয়াই আবার শক্ত করিয়া দিবেন। এই সময় রোগীর শরীর গরম রাখিবার জন্য তাহাকে ঈষদুষ্ণ চা বা দুধ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

উল্লিখিত প্রণালীতে বন্ধন করিবার পর ছুরি দিয়া ক্ষতস্থান লম্বালম্বি ভাবে চিরিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে রক্তস্রাবের সহিত বিষের কিয়দংশ বাহির হইয়া যাইবে। ইহার পর পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট, potassiumpermanganate জলে গুলিয়া দষ্ট-স্থানে ধৌত করিলে অবশিষ্ট বিষ বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও যে অল্প

পরিমাণ বিষ ইতিপূর্ব্বেই শরীরে সঞ্চালিত হইয়াছে, তাহার ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঔষধ এন্টিভেনিনের anti-venene ইঞ্জেকসন দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য পূর্বোক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার পর শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এন্টিভেনিন প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ। প্রথমে একটি ঘোড়াকে সামান্য পরিমাণ সর্পবিষ ইঞ্জেকশান দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে বিষের মাত্রা ক্রমশঃ বিলক্ষণ বাড়ান হয়, কিন্তু পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার ফলে ঘোড়ার রক্তে এমন এক বিষ বিধ্বংসী বস্তু উৎপন্ন হয় যে, তখন আর সাপের বিষ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অতঃপর ঐ ঘোড়াব রক্ত লইয়া উহার রসভাগ, serum পৃথক কবিয়া কাচের আধাবে রাখা হয়।

সর্প-ভয় নিবারণ

ভারতবর্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, সে জন্য মানুষের পরম শত্রু অহিকুল ধ্বংস করিয়া উহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার সকল উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই হিংস্র সরীসৃপ যাহাতে বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া কোনক্রমে আশ্রয়লাভ করিতে না পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। বাড়ীর উঠানে কিম্বা হাতায় ঘন ঘাস বা আগাছার জঙ্গল হইলে তাহা কাটিয়া নির্ম্মূল করা প্রয়োজন, এবং সর্পের বাসযোগ্য কোন গর্ত্ত থাকিলে মাটি দিয়া তাহা বুজাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাড়ীর চারি দিকে কাঁকরের একটা সরু রাস্তা করিতে পারিলে বাসস্থান অনেকটা সুরক্ষিত হয়; কারণ ধারাল কাঁকরের টুক্‌রার উপর দিয়া চলিতে সর্পের বিশেষ অসুবিধা হয়।

কার্বলিক এসিডের (Carbolic acid) মৃদু গন্ধও সাপের অসহ্য। এই

ঔষধ জলে গুলিয়া প্রয়োজনমত ইতস্ততঃ ছড়াইলে, সেই সঙ্গে আর সাপ নিকটে আসিতে পারে না।

অহি-নকুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রতিযোগিতায় নকুলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করে; এজন্য সর্পবহুল স্থানে বেজি পুষিলে নাগ-বংশের সংখ্যা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সর্পের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, সে জন্য এই সময় রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে একটি ছড়ি ও আলো লওয়া উচিত। চলিবার সময় লাঠি দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে আঘাত করিয়া শব্দ করিলে ঐ শব্দে ভয় পাইয়া সাপ পলাইয়া যায়।

প্রয়োজন হইলে যাহাতে সত্বর প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, সে জন্য সর্পসঙ্কুল স্থানে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট থাকা উচিত, ইহা সকল ঔষধের দোকানেই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. The Poisonous Terrestrial Snakes of Our British Indian Dominions, by Col. F. Wall, I. M. S.

2. The Snakes of India, by Lt. Col. K. G. Gharpurey. I. M. S.

3. Hand Book of Snake-bite, by P. Banerjee.

4. The Poisonous Snakes of India—Wall Chant, by Lt. Col. R. Knowles I. M. S.

5. Tropical Medicine, by Rogers & Megaw.

চার্লস ডারউইন

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। এইদিন বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বিবর্তনবাদী চার্লস ডারউইন ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রুসবারি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান লণ্ডন হইতে ১৫৩ মাইল দূরে। ডারউইনের পিতা রবার্ট ডারউইন এবং পিতামহ এরাসমাস ডারউইন উভয়ই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত মৃৎশিল্পী জোসিয়া ওয়েজউডের কন্যা। নয় বৎসর বয়সের সময় ডারউইন মাতৃহারা হন, তখন হইতে তাঁহার ভগিনীদের যত্ন ও পরিচর্যায় তিনি বড় হইতে থাকেন। বাল্যকালে ডারউইনের নানা রকম দ্রব্য সংগ্রহের শখ ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি বিভিন্ন প্রকার ঝিনুক, মুদ্রা, সিল ও খনিজ প্রস্তর জড় করিতেন। নানা জাতীয় পাখির ডিম জোগাড় করাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোন বাসা হইতে একটির বেশী ডিম লওয়া তিনি অন্যায় মনে করিতেন। ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কোন পুকুরের ধারে কিংবা নদীর তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারিতেন। কুকুরের সঙ্গে খেলা করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন এবং যে-কোন কুকুরকে বশীভূত করিবার তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

১৮১৮ সনে বালক ডারউইনকে শ্রুসবারিস্থিত ডাক্তার বাটলারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এইখানে তাঁহাকে ষোল বছর অবধি থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে প্রধানত প্রাচীন ভাষা, ভূগোল ও ইতিহাস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পড়ান হইত না, সেজন্য এই পরিবেশ তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। স্কুলের ছাত্র হিসাবে ডারউইন অসাধারণ ভাল

অথবা অস্বাভাবিক খারাপ, কোনটাই ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষকদের মতে তিনি নিতান্ত সাধারণ ছেলে ছিলেন। স্কুল-জীবনের শেষের দিকে ডারউইন বন্দুক ছুড়িতে ও পাখি শিকার করিতে অভ্যস্ত হন। এইরূপ অত্যধিক বন্দুক-বিলাস দেখিয়া তাঁহার পিতা একবার ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, বন্দুক ছোঁড়া, ইন্দুর ধরা এবং কুকুর ছাড়া যখন আর কোন বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ নাই, তখন বড় হইয়া তিনি নিশ্চয় নিজের এবং বংশের অগৌরব আনিবেন। বন্দুক ছুঁড়িয়া লক্ষ্যভেদ করিতে তিনি সত্যই এত নিপুণ হন যে পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মোমবাতির শিখার উপর দূর হইতে গুলি করিয়া তিনি অনায়াসে অগ্নিনির্বাপণ করিতে পারিতেন।

কৈশোরকালে ডারউইন শেক্সপিয়র, বায়রন ও স্কটের বই পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইতেন। হোয়াইটের লেখা সেলবোর্নের প্রাকৃতিক ইতিহাস তাঁহাকে মুগ্ধ করে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি পাখিদের অভ্যাস ও রীতি সম্পর্কে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। একজন গৃহশিক্ষক তাঁহাকে জ্যামিতি পড়াইয়া যাইতেন, উহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ এক আত্মীয়ের নিকট ব্যারোমিটারের পরিমাপ সূক্ষ্মভাবে ভার্নিয়ার মতে নির্ণয় করিতে শিখিয়া তিনি খুব খুশী হন। এই সময় তাঁহার এক ভাই বাড়ির বাগানে একটি ঘরের মধ্যে যন্ত্রপাতিসমেত ক্ষুদ্র এক রসায়নাগার স্থাপন করেন। এখানে উভয় ভ্রাতা মিলিয়া নানা প্রকার গ্যাস ও যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতেন এবং সময় পাইলে রাসায়নিক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। যদিও স্কুল-জীবনে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ইহাই ডারউইনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কিন্তু সে যুগে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। তাঁহাদের রাসায়নিক পরীক্ষার কথা কোনক্রমে সারা স্কুলে ছড়াইয়া পড়ে এবং তখন হইতে ডারউইনের ডাক-নাম হয় 'গ্যাস'। এমন কি প্রাচীনপন্থী হেডমাস্টার মহাশয় ডাক্তার বাটলার এই ভাবে সময়

নষ্ট করিবার জন্য ডারউইনকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ১৮২৫ সনে অক্টোবর মাসে ডারউইনকে ডাক্তারী পড়িবার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়।

এডিনবরায় অবস্থানকালে তাঁহাকে প্রাণীবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন, ভেষজতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিতে হইত। গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশে ডারউইন সঙ্গীসাথীর সহিত পদব্রজে দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন। অধিকাংশ দিন তাঁহারা ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেন। কিন্তু নানা কারণে ডারউইনের ডাক্তারী পড়া মোটেই ভাল লাগিত না। বিশেষ করিয়া ব্যবচ্ছেদ কার্য এবং ক্লোরোফর্ম-পূর্ব যুগের অস্ত্রোপচার তাঁহার মনকে



ডারউইন

রীতিমত পীড়া দিত। তাহার উপর তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, ভবিষ্যতে পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন, তখন হইতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সকল উৎসাহ এককালে হ্রাস পাইল। সুতরাং দুই বৎসর পরে যখন তাঁহার পিতা জানিতে পারিলেন যে, ডারউইন চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক, তখন জোর করিয়া তাঁহাকে ধর্মযাজকের শিক্ষা লইবার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ডারউইন ১৮২৮ হইতে ১৮৩১ সন পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন ভাষা, দর্শনশাস্ত্র ও গণিত তাঁহার পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত ছিল। তিনি যথাসময়ে দশম স্থান অধিকার করিয়া বি এ পাশ করেন। এই সময় সময় পাইলেই তিনি আগেকার মত ঘোড়ায় চড়িতে ও শিকার করিতে যাইতেন। কেম্ব্রিজে থাকার সময় ডারউইন কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং অবসরকালে ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিভাষণ শুনিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। এই সময় তিনি জন হার্শেল রচিত পদার্থবিদ্যার বই এবং হামবোল্ডের লেখা ভূগোল পড়িয়া খুবই প্রীত হন। ছাত্র জীবনে যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত ভালবাসিলেও ডারউইনের সুরজ্ঞান কখনও খুব প্রবল ছিল না। তবে তাঁহার চিত্রশিল্পের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি ভাল ছবি কিনিয়া রাখেন এবং সুন্দর চিত্র পরিদর্শনের জন্য প্রায়ই শিল্পশালায় গমন করিতেন।

কেম্ব্রিজ-বাসের সময় ডারউইন পতঙ্গতত্ত্বের প্রতি বিলক্ষণ আকৃষ্ট হন। বিশেষ করিয়া গুবরে পোকা সংগ্রহে তাঁহার উৎসাহ অপরিসীম ছিল। একদিন কোন পুরানো গাছের ছাল ছিঁড়িয়া তিনি দুইটি দুর্লভ গুবরে পোকা দেখিতে পান। দুই হাতে দুইটি পোকা ধরিবার পর নূতন প্রকার তৃতীয় এক পতঙ্গ তাঁহার নয়নগোচর হয়। তখন তাড়াতাড়িতে তিনি

ডান হাতের পোকাটি যেই মুখের মধ্যে পুরিলেন, অমনি উহা একরকম তীব্র কটু রস নির্গত করায় তাঁহার জিহ্বা যেন জলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি নিষ্ঠীবনের সহিত উহা বাহির করিয়া দিলেন, কিন্তু ইহার ফলে উহাও গেল এবং নূতন পোকাটিও অন্তর্হিত হইল। অধ্যবসায়ের ফলে তিনি একবার একটি অতি দুষ্প্রাপ্য গুবরে পোকা জোগাড় করিতে সমর্থ হন। যখন স্টিফেন্স প্রণীত ব্রিটিশ কীটপতঙ্গের চিত্রাবলীতে ইহার বিষয় ডারউইন কর্তৃক সংগৃহীত এই বলিয়া প্রকাশিত হয়, তখন তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১৮৩১ সনের মাঝামাঝি ডারউইন খবর পান যে, কাপ্টেন ফিজরয় 'বিগল' নামক জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইবেন এবং যদি কোন অল্পবয়সী অবৈতনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি নিজের কেবিনের একাংশ তাহার জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ডারউইন তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত ইহাতে সম্মত হইলেও প্রথমে তাঁহার পিতার উহাতে অমত হয়। পরে অবশ্য তাঁহার এক মাতুলের প্রভাবে পিতার সম্মতিলাভ হয়। ঐ বৎসর সাতাশে ডিসেম্বর ডারউইন 'বিগল' নামক জাহাজে চড়িয়া পৃথিবী পর্যটনের জন্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন। প্রথমবার আত্মীয়স্বজনকে অনেক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার খুব মন কেমন করে। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বৎসর এই জাহাজ ভ্রমণ তিনি যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লায়েল প্রণীত ভূবিদ্যার গ্রন্থ ছিল। সেজন্য যে-সব দেশে তিনি পদার্পণ করেন, সেখানকার স্তরবিন্যাস বিচার করিবার সুবিধা হয়। অবসরকালে তিনি মিল্টনের Pardise Lost পাঠ করিতেন। দেশ ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্নপ্রকার খনিজ প্রস্তর, প্রাণী ও জীবাশ্ম, fossil আহরণ করেন এবং উহাদের সকল বৃত্তান্ত সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সংগ্রহের

জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পাখি তিনি নিজেই শিকার করিতেন। একদিন চব্বিশবার বন্দুক ছুঁড়িয়া তিনি তেইশটি কাদাখোঁচা মারেন। ক্রান্তিবৃত্তের অন্তর্গত অঞ্চলে অনুরূপ উদ্ভিদসম্পদ তাঁহার মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্তী দ্বীপের অরণ্যমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গসমূহ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। বিশেষ করিয়া পাটাগোনিয়ার বহুবিস্তৃত মরুভূমি তাঁহার মনকে এক মহানভাবে পূর্ণ করিয়া দেয়। কোন এক অন্ধকার রাত্রে সাগরের জল জীবাণুর জ্যোতিতে আলোকিত দেখিয়া তিনি পরম বিস্মিত হন। ডারউইনের লেখা এই কালের ভ্রমণকাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক।

পাঁচ বৎসর পরে ১৮৩৬ সনে ২রা অক্টোবর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি প্রায় পাঁচ বছর লণ্ডনে অবস্থিতি করেন। এই সময় ডারউইন কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। ঐতিহাসিক টমাস বাক্‌লে ও জর্জ গ্রেট, ভূবিজ্ঞানী হামবোল্ড ও লায়েল, সাহিত্যিক মেকলে ও কার্লাইল পদার্থবিদ জন হার্শেল প্রমুখ কয়েকজন মনীষীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ জোসেফ হুকার তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই সময় হইতে তিনি বই লেখা আরম্ভ করেন। ১৮৩৯ সনে প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে ডারউইন এমা ওয়েজ্‌উডকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের হইয়াছিল। তিনি প্রেমপ্রবণ স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী হইয়াছিলেন।

১৮৪২ সনে ডারউইন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া কেণ্ট, Kent প্রদেশের অন্তবর্তী ডাউন নামক পল্লীতে বাড়ি কিনিয়া স্থায়ী বাস আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বৎসর এইস্থানেই অতিবাহিত হয়। ১৮৭৭ সনে একদিন উইলিয়াম গ্লাডস্টোন ও লর্ড এভেবারি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিতে এইখানে আসিয়াছিলেন। ডারউইন প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি বিলক্ষণ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। এক সময় 'বিগল' জাহাজ হইতে সমুদ্র তীরে অবতরণ করিয়া কিছুদূর যাইবার পর তাঁহার সঙ্গীদের বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জলের সন্ধানে অনেক দূর অবধি গিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি গলা পর্য্যন্ত উঁচু অনায়াসে লাফাইতে পারিতেন। ঢিল ছুঁড়িয়া পাখি ও খরগোশ মারা তাঁহার কাছে খুব সহজ ছিল। কিন্তু নানাকারণে ইহার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়, তিনি প্রায়ই স্নায়বিক দৌর্বল্য, কম্পন, অনিদ্রা ও বিবমিষার কষ্ট পাইতেন। সেইজন্য শহরের জনকোলাহলপূর্ণ আবেষ্টনী অপেক্ষা ডাউনের মুক্ত ও শান্ত পরিবেশ তাঁহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। এই স্থানে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি তাঁহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভূবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি প্রায় পনরখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

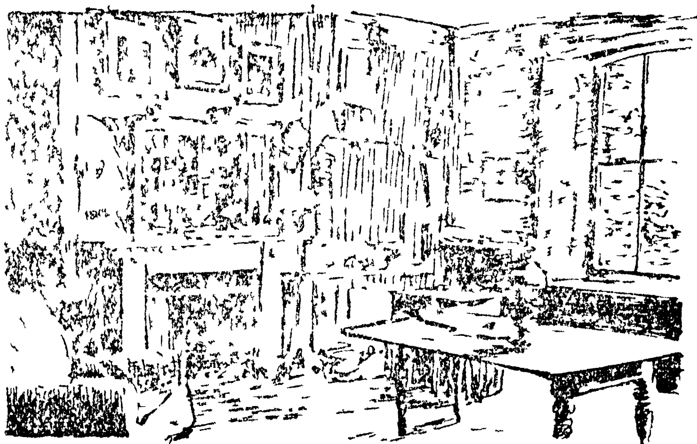
১৮৩৭ সন হইতেই তিনি একমনে বিবর্তনবাদ, evolution সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবজন্তুর পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় সকল তথ্য ও প্রমাণ সযত্নে সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিনি যে কেবল অধ্যাপকবৃন্দের মতামত লইতেন তাহাই নয়, বহুদর্শী পশুপালক ও উদ্যান-রক্ষকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত্নের সহিত অনুধাবন করিতেন। টমাস ম্যালথাস প্রণীত জনসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ উপকৃত ও প্রভাবিত হন। ডারউইনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব প্রখর ছিল। তাঁহার যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি এবং অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনীশক্তি বিশেষ উন্নত ছিল। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য একাগ্রমনে তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে পারিতেন। বিঘোষিত যে সমস্ত তথ্য তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যাইত, তিনি সেই সকল তত্ত্বের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেন।

ডারউইন প্রথম হইতেই উপলব্ধি করেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জীবজন্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্ট হয় না। উহারা এক বা একাধিক আদিম জীবের ক্রমপরিবর্তনের ফলেই এতরকম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আদিম জলচর কীটের ক্রমোন্নতির পর মৎস্যের উৎপত্তি হইয়াছে। মৎস্যের ক্রমবিকাশের ফলে উভচর ভেকের উদ্ভব হইয়াছে, ভেক হইতে চতুষ্পদ জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে এবং পশু উন্নত হইয়া বনমানুষ হইয়াছে এবং সর্বশেষে বনমানুষ হইতে সভ্য মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই সমস্ত জীবজন্তুর স্বাভাবিক বা শিলীভূত দেহাবশেষ ভূপৃষ্ঠে ঠিক পর পর স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে কখনও কখনও জীবজন্তুর যৎসামান্য দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এইসব পরিবর্তন অনেক সময় বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জীবজগতে বিলক্ষণ সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং সেজন্য জীবনসংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কঠিন। যে সকল জীব অল্পমাত্রায় পরিবর্তন হইয়া সুবিধাজনক গুণের অধিকারী হয় তাহারা ভালভাবে সংরক্ষিত হয়, আর অন্য সব প্রাণী ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন বলে।

ডারউইনের প্রায় কুড়ি বছর অবিরাম পরিশ্রমের ফলে তাহার বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পেসিজ' ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়া যায়। প্রথমদিনেই ১২৫০ কপি বই বিক্রয় হয়। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নামক আর একজন বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়ে ক্রমবিকাশের কারণ আবিষ্কার করেন। ডারউইন একথা তাঁহার গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ডারউইনের পূর্বে লামার্ক নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ডারউইনের মত এত বিশদভাবে ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইতিপূর্বে আর কেহই আলোচনা করেন নাই। অধ্যাপক টমাস হাক্সলী ডারউইনের শিষ্যদের

মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি বিবর্তন বাদ প্রচারের জন্য অনেক সংগ্রাম করেন। ১৮৭১ সনে প্রকাশিত 'ডিসেণ্ট অব ম্যান' ডারউইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ১৮৭২ সনে মুদ্রিত 'এক্সপ্রেশান অব ইমোশানস' নামক গ্রন্থে ডারউইন ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দেন।

ডারউইনের আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, পুস্তক পাঠ ও রচনা সমস্ত কাজই এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইত। তাঁহার দিনচর্যা এইরূপ ছিল:—প্রভাতকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তাহার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পৌনে



ডারউইনের বাস-কক্ষ

আটটার সময় প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর সকাল আটটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত একমনে কাজ করিতেন, অতঃপর উপবেশনকক্ষে আসিয়া সেদিনকার ডাক দেখিতেন এবং সাড়ে দশটা অবধি চিঠিপত্র শুনিতেন।

ইহার পর আবার তিনি দুপুর বারটা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকিতেন। করণীয় কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ মুক্ত বায়ুতে পদচারণা করিয়া আসিতেন। তাহার পর মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। তাঁহার মিষ্টদ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। মদ্যপান তিনি সামান্যই করিতেন। কিন্তু নস্য লওয়া ও ধুমপানের অভ্যাস তাঁহার বেশ ছিল। আহারের পর তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেন, খবরের কাগজ শেষ হইলে চিঠি লিখিতে বসিতেন এবং পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেন। তিনি প্রত্যেকের পত্রের উত্তর দিতেন। অপরাহ্ন তিনটার সময় চিঠিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হইলে তিনি অল্পক্ষণের জন্য শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। বেলা চারিটা বাজিলে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। উহার পর সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আবার তাঁহার কার্যকাল ছিল। সন্ধ্যাবেলায় বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি ধুমপান করিতেন এবং তখন কোন নভেল পড়া হইলে শুনিতেন। জর্জ ইলিয়ট, মিস অস্টিন ও মিসেস গ্যাস্কেলের লেখা উপন্যাস তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। রাত্রি সাড়ে সাতটার মধ্যেই তিনি নৈশভোজন সমাপন করিতেন। তাহার পর ব্যাকগামন খেলিতেন। অতঃপর অল্পকাল বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি নিজেই পড়িয়া দেখিতেন। সায়ংকালে প্রায়ই তিনি পিয়ানোর বাজনা শুনিতে ভালবাসিতেন। রাত্রি দশটা হইলে তিনি শয়ন করিতে যাইতেন।

ডারউইন খুব সতর্কভাবে সমস্ত হিসাব রক্ষা করিতেন, এজন্য তিনি স্থানীয় দুইটি ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকবছর কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যও করিয়াছিলেন; ১৮৮২ সনের ১৯শে এপ্রিল ডারউইনের কর্মময় জীবন সমাপ্ত হয়। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ ওয়েষ্ট মিনিস্টার গির্জা-প্রাঙ্গণে সমাবিষ্ট হয়।

—শেষ—